পল্লবী সেনগুপ্ত

আলো আঁধারের গন্ধ

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

আলো আঁধারের গন্ধ

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

আলো আঁধারের গন্ধ

পল্লবী সেনগুপ্ত

লা ল মা টি

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

AALO ADHANRER GANDHA

by

Pallabi Sengupta

প্রথম প্রকাশ

বইমেলা ২০১৯

প্রকাশক

নিমাই গরাই

লালমাটি প্রকাশন

৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৭৩

ফোন: ২২৫৭ ৩৩০০ / ৯৮৩১০২৩৩২২

প্রচ্ছদ

কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল

অলংকরণ

অরিত্রি নাথ

অক্ষরবিন্যাস

লালমাটি

১২এ গৌর লাহা স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক

বসু মুদ্রণ

১৯/এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

উৎসর্গ

যাদের ভালোবাসা ও প্রশ্রয় বারবার
উৎসাহিত করেছে আমার লেখনীকে
এই বই তাদের জন্য—
'খোলা জানালা'-এর
সকল বন্ধুদের

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

লেখক কথন

মানুষের জীবনের আনাচে কানাচেই মিশে থাকে আলো অন্ধকারের দোলাচল। তাই আমার এই গল্প সংকলন 'আলো আঁধারের গন্ধ'-তে উঠে এসেছে মানব জীবনের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত নানা রকম সাদা আর কালো দিক।

এই বইতে দুই মলাটের মধ্যে সাজাতে চেষ্টা করেছি ভিন্ন স্বাদের গল্প। তাই পাঠকরা যেমন এতে পাবেন একদিকে 'সেদিন দুপুর', 'আজ বৈশাখী আসুক' বা 'বাসন্তী স্পর্শ'-এর মতো নিটোল প্রেমের গল্প; তেমনি অপরদিকে পাবেন 'লৌকিকের মাঝে', 'অস্তিত্বের অন্ধকারে' বা 'অর্ধাঙ্গিনী'-এর মতো প্রাপ্তমনস্ক ভয়ের গল্প।

'হিয়ার প্রেমিক', 'চামড়ার মুখোশ'-এর মতো সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘরানার থ্রিলার এর পাশাপাশি এই বইতে রয়েছে 'প্রার্থী', 'নিভৃত যতনে'-এর মতো মানব মনের সূক্ষ্ম অনুভূতির চুল চেরা বিশ্লেষণের গল্প। আবার এরই পাশে জায়গা করে নিয়েছে 'শিল্পী', 'মায়ার বাধন'-এর মতো সমসাময়িক সামাজিক সমস্যার প্রতিচ্ছবির কাহিনি।

আমি ভীষণ ভাবে কৃতজ্ঞ লালমাটির প্রকাশক শ্রী নিমাই গরাই মহাশয়ের কাছে যিনি আমায় সুযোগ করে দিয়েছেন দুই মলাটের ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের একুশটি বড়ো গল্পের সংকলনটি প্রকাশ করার। এছাড়াও উল্লেখ্য আমার পাঠক বন্ধুরা, যাদের দেওয়া ভালোবাসার ভিত্তিতেই আমি এই সংকলন প্রকাশের কথা ভাবতে পেরেছি।

এছাড়াও একজন মানুষের কথা না বললেই নয়, তিনি হলেন আমার অগ্রজ প্রতিম শ্রদ্ধেয় সুমঙ্গলদা যিনি সর্বদা অভিভাবকের মত ধরিয়ে দিয়েছেন আমার লেখার নানা ঠিক ভুল।

পরিশেষে উল্লেখ্য সেই মানুষদের কথা, যারা না থাকলে আমি এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতেই পারতাম না। তারা হলেন আমার বাবা, মা, সহোদরা এবং জীবনসঙ্গী। এদের সাহচর্য ও উৎসাহ না থাকলে বহু আগেই স্তব্ধ হয়ে যেত হয়তো আমার কলম।

আমি আশা রাখি, আমার সকল শুভানুধ্যায়ীদের শুভকামনায় এবং পাঠক বন্ধুদের ভালোবাসায় 'আলো আঁধারের গন্ধ' নিশ্চয় অনেক ভালোবাসা জিতে নেবে। সবার মতামতের অপেক্ষায় রইলাম।

নমস্কারান্তে
পল্লবী সেনগুপ্ত

www.banglabookspdf.com

বাংলা পিডিএফ ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন

https://banglabookspdf.com

ফেসবুক Page

facebook.com/boierpathshala.official

ফেসবুক Group

facebook.com/groups/boierpathshala1

This pdf is collected from INTERNET.

বইটি ভালো লাগলে হার্ডকপি কিনতে ভুলবেন না।

কাগুজে বইয়ের বিকল্প নেই।

সূচি

অস্তিত্বের অন্ধকারে

নিভৃত যতনে

লৌকিকের মাঝে

আজ বৈশাখী আসুক...

চামড়ার মুখোশ

দমকা হাওয়া

হিয়ার প্রেম

মলিন মর্ম মুছায়ে

বন্ধ দরজার ওপারে

শিল্পী

বৃষ্টির রূপকথা

অর্ধাঙ্গিনী

মায়ার বাঁধন

রাজপুত্র আসার পরে...

সে এসেছিল

আমি শুধু চেয়েছি তোমায়

সেদিন দুপুরে...

তুমি আসবে বলে...

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

বাসন্তী স্পর্শ

ধূসর অনুভূতিরা

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

অস্তিত্বের অন্ধকারে

একটা মৃত্যু আর কিছু প্রশ্ন

সাদা চাদরে মুড়ে রয়েছে মৃতদেহটা। মিসেস বসাক যে হঠাৎ এভাবে চলে যাবেন কেউ ভাবেনি। খুব সুস্থ সবল ছিলেন বলেই তো মনে হত ওনাকে। পুরো পাড়া উপচে পড়ছে যেন। মিস্টার বসাক বসে আছেন পাথরের মূর্তির মতো। পাশে শুয়েও বুঝতে পারলেন না কখন ঘুমের মধ্যে নিঃশব্দে চলে গেল সাতাশ বছরের সাথী।

উথাল পাথাল করছে মিস্টার বসাকের ভিতরটা। অনেক প্রশ্ন... সেগুলোর উত্তর মিলছে না যে।

ডাক্তাররা বলেছেন গভীর রাতে ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। ডেথ সার্টিফিকেটেও তাই লেখা আছে। কিন্তু ওর তো হার্টের অসুখ ছিল না।

আর তাই যদি হবে তাহলে কী মানে ওই চিরকুটটার? যেটা ওর বালিশের নীচে রাখা ছিল। ওরই হাতের লেখা, স্বামীকে লেখা শেষ চিরকুট।

'তুমি ওদের দেখো। সামলে রেখো আমার সংসার। আমায় যেতে হবে এবার। নইলে যে সব শেষ হয়ে যাবে এখানে। এবার যে আমার প্রায়শ্চিত্ত করার পালা।'

কীসের প্রায়শ্চিত্ত? কোন পাপবোধে ভুগত ও? ছাবিবশ বছর আগের সেই ব্যাপারটা কি? মারা যাবার আগে কেন লিখল এমন চিরকুট? ও কি বুঝতে পারছিল যে সময় আসন্ন নাকি অন্য কিছু?

অনেক রহস্য... অনেক প্রশ্ন...

না, মিস্টার বসাক বুঝতে পারছেন না সবটা। জীবনে প্রথমবার ওর মনে হচ্ছে সত্যি বোধ হয় যুক্তি দিয়ে সব সময় বোঝা যায় না সবটুকু।

banglabookspdf.com

১

—'নীহার, দাঁড়াতে বলেছি কিন্তু আমি তোকে। শোন, শুনে যা বলছি'... চিৎকার করল এবার রিভু। কিন্তু নীহারের যেন কোন হেলদোলই নেই। গটগট করে হেঁটে চলেছে হাতিবাগানের ফুটপাথ দিয়ে।

এবার হনহন পা চালাল রিভু। প্রায় ছুটে গিয়ে ধরে ফেলল নীহারকে।

—'কী ব্যাপার? তোকে থামতে বলছি না?' খপ করে নীহারের হাত ধরে ফেলে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল রিভু।

—'কী হবে কী থেমে? তোকে তো সাফ বললাম যে আমি আর তোর সাথে কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না। তোর মতো নীচ মনের আর সন্দেহ প্রবণ অসুস্থ মানসিকতার ছেলের সাথে আমি

www.banglabookspdf.com

কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না। আমি ঋষিকে ভালোবাসি।' ঝাঁঝাল স্বরে নিজের কথা শেষ করেই আবার এগিয়ে গেল নীহার। আর সাথে সাথেই মাথায় যেন ছলাৎ করে রক্ত উঠে গেল রিভুর।

হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েই ও মাঝ রাস্তায় ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিল নীহারের গালে।

—'ঋষিই' একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল এবার নীহার। উফ! কি তীব্র শিরশিরানি সেই চিৎকারে। পলকেই মাথার মধ্যে কেমন ঝিমঝিম করে উঠল রিভুর।

মুহূর্তের মাঝেই দপ দপ করতে শুরু করল রাস্তার সব কটা আলো। আর হঠাৎই কেমন যেন বেবাক ফাঁকা হয়ে গেল মহানগরীর রাস্তা। আর ঠিক সেই মূহূর্তেই শিষ দিতে দিতে উল্টো দিকের রাস্তা থেকে হঠাৎ সামনে প্রতীয়মান হয়ে উঠল একটা ছায়া মূর্তি।

রিভু ঠিক বুঝতে পারল না ও ঠিক দেখছে কিনা। কিন্তু মাত্র কয়েক মুহূর্তই লাগল ওর সবটা বুঝতে। ছায়া মূর্তিটা স্পষ্ট ভাবে এবার এগিয়ে এল। সারা শরীর তার কালো পোশাকে ঢাকা। মুখেরও বেশির ভাগটাই ঢেকে রয়েছে চওড়া কালো হ্যাট এ। কিন্তু মুখ ভালো না দেখতে পেলেও রিভু জানে কে আছে ওই কালো টুপির আড়ালে। ওই মুখ যে ওর ভীষণ চেনা। সেই কোনকাল থেকেই তো রিভু দেখে আসছে ওই মুখ। ঠিক নিজের আয়নার ওপারে। হ্যাঁ রিভু জানে ঋষি আর কেউ নয়। সে রিভুরই ক্লোন। সে নিমেষে বাড়িয়ে দিল রিভুর দিকে নিজের রোমশ কালো হাত।

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

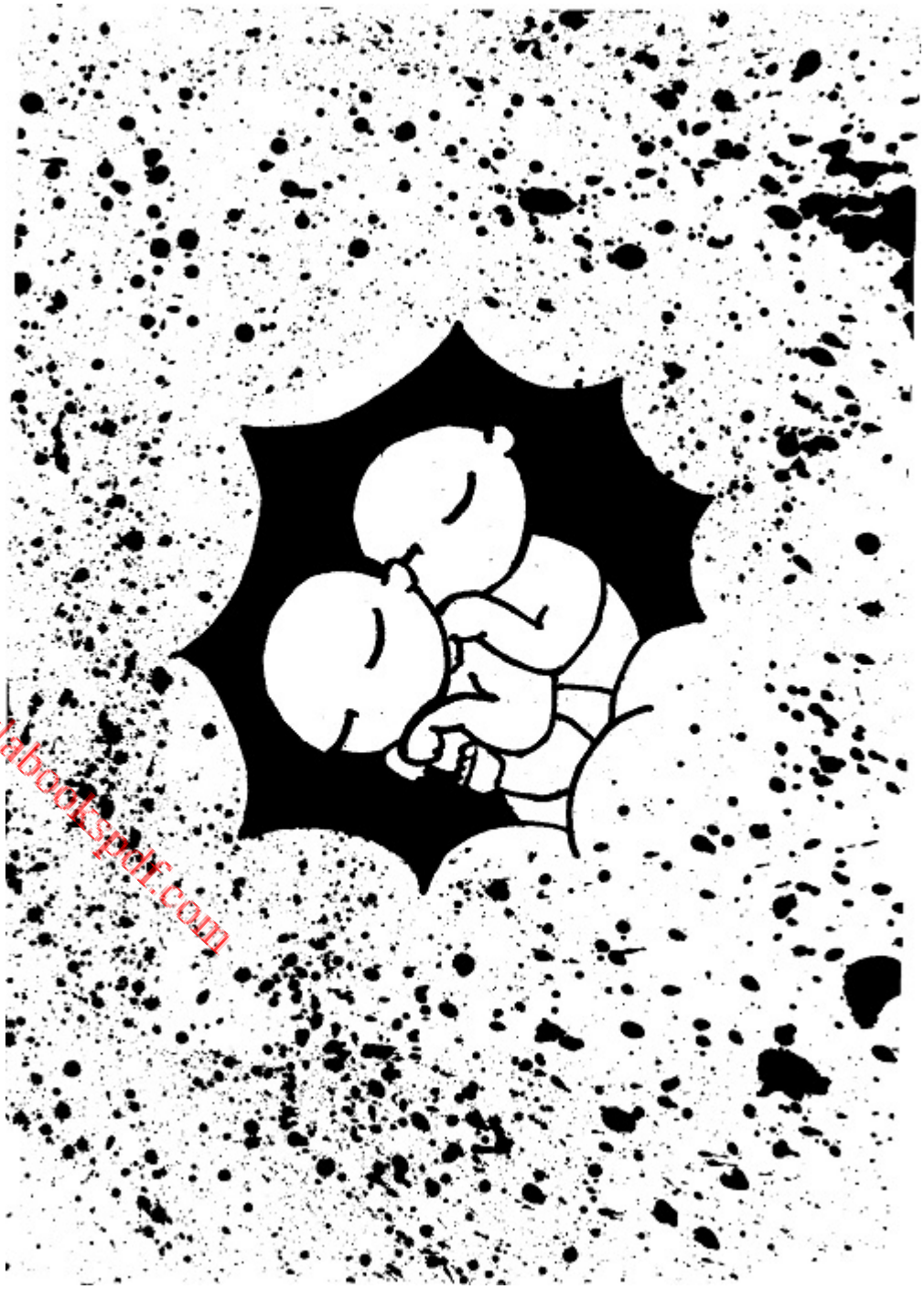

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

সেই বিকট হাত দিয়েই এবার সে চেপে ধরল রিভুর গলা। দম বন্ধ হয়ে আসছে রিভুর।

—'আআআ... আর্তনাদ ছিটকে এল রিভুর গলা চিরে। ছটফট করছে ও মরণযন্ত্রণায়। কিন্তু মাত্র কয়েক মুহূর্ত। তারপরই থেমে গেল সব ছটফটানি। মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল রিভুর প্রাণহীন দেহটা।

আবার শিষ দিতে শুরু করল সেই মূর্তি। নীহার এসে এবার জড়িয়ে ধরল লোকটার হাত। নিজের কালো পোশাক আর হ্যাট সে ছুঁড়ে ফেলল রিভুর মৃতদেহের পাশে। নির্মম ভাবে খুলে নিল রিভুর মৃতদেহের পোশাক।

রিভুর পোশাক গায়ে চড়িয়ে নিমেষেই সে হয়ে উঠল রিভু। আবার স্বাভাবিক ভাবে জ্বলে উঠল মহানগরীর আলো। আবার কলরবে মুখরিত হল ব্যস্ত রাস্তাটা।

রিভুর পোশাক পরে আততায়ী এবার একেবারে স্বয়ং রিভু। সেই চোখ, সেই মুখ, সেই হাঁটা চলা। বিন্দু মাত্রও পার্থক্য নেই। নীহারের হাত ধরে কলকাতার রাস্তায় হেঁটে চলেছে সে গুনগুন করে হিন্দি গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে।

ধড়মড় করে জেগে উঠে বিছানায় উঠে বসল রিভু। উফফফ! আবার সেই বীভৎস স্বপ্নটা। আজ সকাল থেকেই জ্বর এসেছে ওর। তাই অফিস যায়নি। খাওয়া দাওয়া সেরে তাই শুয়ে পড়েছিল একটু। আর ঘুম চোখে আসতেই আবার সেই বীভৎস স্বপ্ন।

বিছানায় কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল পাথরের মতো বসে থাকল ও। ঘরটা অন্ধকার ঘুটঘুট করছে, তার মানে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

আলো জ্বালাবার জন্য সুইচ টিপল রিভু। না, আলো জ্বলল না। আবার আতঙ্কের দলা কাবু করছে রিভুকে। কেন আলো জ্বলছে না? তার মানে কি পাওয়ার কাট?

অস্থির লাগছে রিভুর। ঘামে ভিজে যাচ্ছে টি-শার্ট। কেমন একটা ঝিমঝিমে ভাব নিয়ে প্রায় টলতে টলতে ঘরের লাগোয়া ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল। একটা ভুতুড়ে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে চারিদিক। লোডশেডিং কাবু করেছে গোটা পাড়াটাকে।

উদ্ভ্রান্তের মতো চোখ ঘোরাচ্ছিল রিভু এদিক ওদিক। হঠাৎ কেমন যেন চলকে উঠল রক্তটা।

অন্ধকারের মধ্যে কোণার ল্যাম্প পোস্টে হেলান দিয়ে কে দাঁড়িয়ে আছে ওটা? তার জ্বলন্ত দৃষ্টিটা তো রিভুর দিকেই। হাতের সিগারের লাল আগুনটা যেন এক নরকের আত্মার চাহনি।

হ্যাঁ সেই তো ওটা... হুবুবু একটা রিভু। তার মানে ঋষি।

সারা শরীরে একটা অন্যরকম জোর কোথা থেকে যেন হঠাৎ টের পাচ্ছে রিভু।

পাগলের মতো দুদ্দাড় করে ক্ষিপ্র গতিতে দৌড় লাগাল ও রাস্তার দিকে।

—'রিভু দাদা, রিভু দাদা... কী হল? কোথায় চললেন এভাবে?' নাধু দা মানে বাড়ির কাজের লোকটার সবটুকু প্রতিরোধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে পাগলের গতিতে ছুটতে ছুটতে রিভু নেমে এল রাস্তায়।

আজ ও মেরেই ফেলবে ঋষিকে। তার পর যা হয় হবে। অফিস যাবার পথে, পাব-এ যাবার পথে, বাড়ির ব্যালকনির বাইরের সব জায়গায় পাগলের মতো ফলো করে চলেছে এই লোকটা রিভুকে তা

www.banglabookspdf.com

প্রায় মাস তিনেক হল। চেহারাটা তো হুবহু রিভুর মতো। কিন্তু কে এ? কোথা থেকে এল? কেন এ ক্রমাগত শাসিয়ে চলেছে রিভুকে এভাবে? মুখে শুধু একটাই কথা—

—'তোর জন্য সব হারিয়েছি আমি। আর এবার আমার কেড়ে নেবার পালা। তোর সব থেকে প্রিয় জিনিসটা কেড়ে নেব।'

কোথা থেকে এসেছে, কেনই বা এভাবে শাসাচ্ছে রিভুকে সে বিষয়ে কিচ্ছু জানে না রিভু। শুধু জানে ওর নাম ঋষি। তবে রিভু বুঝতে পারছে কাকে কেড়ে নেবার কথা বলছে ও। ও নীহারের কথা বলছে। আচ্ছা এ কি তবে নীহারের কোনো প্রেমিক? কিন্তু তবে রিভুর মতো দেখতে কেন হুবহু? উফফ! কী হচ্ছে কী এগুলো?

অন্ধকার রাস্তায় এসেই ক্ষিপ্র গতিতে ঋষির শার্টের কলার খামচে ধরল রিভু।

—'শালা, কী চাস তুই? কেন? কেন এভাবে নরক করে তুলেছিস আমার জীবনটাকে? কি সমস্যা তোর?'

এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে একটা সজোরে ধাক্কা মারল সে রিভুকে। টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে গিয়ে পড়ল রিভু আর অমনি একটা ক্রুর নোংরা হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

কি বীভৎস সেই হাসি। যেন কোনো নরকের জন্তুর ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে রিভুরই নিজের মুখ আর সেই মুখই ব্যঙ্গ করছে রিভুকে।

আস্তে আস্তে সেই মূর্তিটা এগিয়ে আসছে রিভুর দিকে নিজের সাঁড়াশির মতো হাত দুটো বাড়িয়ে। রিভু বুঝতে পারছে ওর মৃত্যু আসন্ন। ওই হাত দুটো এবার নিঙরে নেবে ওর প্রাণ বায়ু।

—'না... না... প্লিজ...' ভয়ে আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেলল ও।

আর ঠিক তখনই ও বুঝতে পারল ঝলমল করে জ্বলে উঠল চারিদিকে আলো।

মনে সাহস এনে ঝপ করে চোখ মেলল রিভু।

নাঃ। সে আর কোথাও নেই। রিভু পড়ে রয়েছে বাড়ির থেকে অল্প দূরের ফাঁকা মাঠটায়।

এখানে কী করে এল ও? ও তো বাড়ির জাস্ট বাইরেটায় দাঁড়িয়েই ঋষির সাথে...

প্যান্টের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে কোনো রকমে উঠে দাঁড়াল রিভু। জোরে হাঁটা লাগাল বাড়ির দিকে।

* * *

—'কি হয়েছিল রিভু দাদা? অমন হন হন করে কোথায় বেরোলেন গিয়ে?' একরাশ প্রশ্ন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নাধু দা।

কোনো উত্তর না দিয়ে সোজা নিজের ঘরে ঢুকে গেল রিভু। নিজের মোবাইল হাতে নিয়ে ঝটপট ডায়াল করল নীহারের নম্বর। ফোন বাজল না। অন্য কলে ব্যস্ত নীহার? একি? ব্যস্ত কেন? এই সময়ে কার সাথে কথা বলছে ও? এখন তো ওর অফিসে থাকার কথা। আজকাল কেন প্রায়ই ব্যস্ত থাকে ওর ফোন? তার মানে কি রিভুর ধারণাই ঠিক? সত্যি কি ঋষির সাথে এখন একটা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে নীহার? আর হয়তো নেহাত কাকতালীয় ভাবেই ঋষির চেহারাটা রিভুর মতো।

www.banglabookspdf.com

খাটের উপর ফোনটা ছুঁড়ে ফেলল রিভু। আর ঠিক তখনই ঝংকার তুলে বেজে উঠল ওর ফোন। স্ক্রিনে নীহারেরই নম্বর।

—'হ্যালো।' তেঁতো স্বরে বলল রিভু।

—'ফোন করছিলি কেন?' বিরস গলা নীহারের।

—'কেন তোর খুব অসুবিধা হল বুঝি? প্রেমালাপের বিঘ্ন ঘটল তাই তো?'

—'রিভু আমি তোর কোনো নোংরা কথা শুনব না তোকে সাফ জানিয়ে দিয়েছি আগেই। আর তোকে তো বলেইছি যদি ভদ্র কথা বলতে পারিস, তবেই কথা বলবি। নইলে ফোন করবি না আমায়।'

—'সেই তো। এখন আমি তো অভদ্র। আর ভদ্র কে? তোর নতুন প্রেমিক ঋষিই শুধু ভদ্র তাই তো? যে তোর প্রেমে পাগল হয়ে সর্বক্ষণ শাসিয়ে চলেছে আমায়। তবে শুনে রাখ নীহার শেষমেশ তোকে ফিরতে আমার কাছেই হবে। কেউ জানুক বা না জানুক আমি জানি যে ওই ঋষি কোনো সাধারণ মানুষ নয়। এ একটা সাক্ষাৎ অপদেবতা।'

—'কে ঋষি? কিসের ঋষি? কোনো ঋষিকে আমি চিনি না লক্ষ বার তোকে বলেছি। কিন্তু তুই কেন মানছিস না জানিস তো? কারণ তুই একজন অসুস্থ মানসিকতার মানুষ। তুই পাগল হয়ে যাচ্ছিস সন্দেহ করে করে। কিংবা তুই শয়তান। খুব বড়ো শয়তান। যাই হোক তোর সাথে কোনো সম্পর্ক আমি রাখছি না আর রাখবও না। আর একদম ফোন করবি না আমায়।' ফোন কেটে দিল নীহার।

কিন্তু রিভুর ভ্রূক্ষেপ নেই। ও চিৎকার করেই যাচ্ছে পাগলের মতো।

—'নীহার... নীহার আই উইল কিল ইউ। আই উইল কিল বোথ অফ ইউ। আমি কাউকে ছাড়ব না। কাউকে না।' দানোয় পাওয়া শক্তির মতো করছে রিভু। ঠিক যেন একটা চরম বদ্ধ পাগল।

banglabookspdf.com

২

ভেজা চোখে দেওয়ালে টাঙানো পুরোনো পোস্টারটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল রঞ্জা। ছবিটা পুরোনো হলেও এখনও একইরকম জীবন্ত। যেন মনে হচ্ছে এক্ষনি কথা বলে বা খিলখিল করে হেসে উঠবে ছবিতে ডাগর চোখে হামা দেওয়া পুঁচকে দুটো।

যেদিন প্রথম নিজের শরীরে অন্য আর একটা প্রাণের অস্তিত্ব জানতে পেরেছিল রঞ্জা সেদিনই মা বলেছিলেন ওকে দেওয়ালে ছোটো সুন্দর বাচচার ছবি এনে লাগিয়ে রাখতে। কচি সুন্দর মুখ ক্রমাগত দেখতে থাকলে নাকি পেটের মধ্যে বাড়তে থাকা ছোট্ট প্রাণটাও ঠিক ওইরকমই রূপ পায়।

এটা শোনার পর থেকেই হন্যে হয়ে খুঁজেছিল রঞ্জা নিজের পছন্দমতো ছোটো শিশুর ছবি। জয় কত ধরনের ছবিই না এনে দিয়েছিল ওকে। কিন্তু ওর পছন্দ হয়নি কোনোটাই। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেষমেষ ও খুঁজে পেয়েছিল এই ছবিটা। দেখেই দারুণ পছন্দ হয়েছিল। সাথে সাথে কিনে নিয়েছিল ও।

কিন্তু মুশকিল ছিল একটাই। ও খুঁজছিল একটা বাচচার ছবি। কিন্তু এই পোস্টারটায় হুবহু এক দেখতে দুটো বাচচা। একই দেখতে, একই রকম হাসির আর অবিকল একই পোশাক পরা ফুটফুটে

www.banglabookspdf.com

দুই নবজাতক। কি যে পছন্দ হয়েছিল রঞ্জার ছবিটা।

—'দেখিস তোর যমজ বাচচা হবে, এত্ত সারাদিন জোড়া খোকাদের ছবি দেখার ফল টের পাবি তখন। দুই কোলে তখন বসবে তোমার দুই জগাই মাধাই'... অনেকেই কথাটা বলেছিল রঞ্জাকে ঐ ছবিটা কিনে আনার পর। আর রঞ্জারও সে সব শুনে শুনে মনে হত সত্যি বোধ হয় ওর শরীরে একটা নয়, একসাথে বেড়ে উঠছে দুটো প্রাণ।

কিন্তু না। যমজ সন্তান হয়নি ওর। একটাই ছেলে এসেছিল ওর কোল জুড়ে। রঞ্জার সাত রাজার ধন এক মানিক রিভু।

কিন্তু ভগবান কেন এমন করছেন আজ ওর সাথে? রিভুই যে ওর সব কিছু। ছেলের মুখে এক চিলতে হাসি বেশি দেখার জন্য রঞ্জা যে সব সময় এক গলা জলে দাঁড়াতেও রাজি। তাহলে কোথায় হল ওর ভুলটা? কেন এভাবে ওরই চোখের সামনে শেষ হয়ে যাচ্ছে ওর ছেলেটা?

কী হয়ে গেল হঠাৎ, কোথা থেকে? ছোটো একটা অ্যাক্সিডেন্টই তো হয়েছিল। তাতেই কি মাথায় চোট পেয়ে শেষ পর্যন্ত এমন হয়ে গেল ছেলেটা? তাই কি? নাকি অন্য কিছু? রঞ্জার সেই পুরোনো পাপ এর জন্য দায়ী নয় তো? ভাবনাটা মনে আসতেই অজান্তেই কেঁপে উঠল রঞ্জা। আবার চোখ চলে গেল দেওয়ালে ঠাঙান পোস্টারটার দিকে। বুকের মধ্যে কেমন একটা আতঙ্ক যেন পাক দিচ্ছে এবার। নাঃ, আর ওই পোস্টারটার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না রঞ্জা। নিজের মুখ দু-হাতে ঢেকে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল শিশুর মতো। সে তো কাঁদবেই। ও যে মা! কোনো মা কি পারে নিজের ছেলের এমন জীবন্ত লাশ হয়ে বেঁচে থাকা দেখতে? হ্যাঁ ছেলেটা এখন জীবন্ত লাশই হয়ে গেছে যেন। সব সময় ভয় আর আতঙ্কে ছটফট করে। যেন প্রতি মুহূর্তেই ওকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে কোনো অতৃপ্ত হাতছানি। চাকরিটাও চলে গেছে ছেলেটার। প্রেমিকাও ছেড়ে চলে গেছে ওকে। সব সময় এখন নিজেকে ও বন্ধ করে রাখে একটা বদ্ধ ঘরে। কি ভীষণ ভয় যেন ওর। সবসময় যেন ও পালাতে চাইছে এক বীভৎস ছায়ার থেকে।

—'রঞ্জা, রঞ্জা কেন এমন করছ তুমি? প্লিজ নিজেকে সামলাও।' জয় এসে শান্ত করার চেষ্টা করছে ওকে।

—'না জয় না। আমার জন্যেই হয়েছে সব। আমি ঠিকমতো খেয়াল রাখতে পারিনি ওর। আমি ভেবেছি আমি ভালো মা। কিন্তু আসলে আমি চূড়ান্ত ব্যর্থ। আমি বোধ হয় নিজের স্কুল আর ছাত্র ছাত্রী নিয়ে এত ব্যস্ত থেকেছি যে বুঝতেই পারিনি কোথায় ফাঁক তৈরি হচ্ছে ছেলে মানুষ করায়? বুঝতেই পারিনি কতটা মানসকি ভাবে একা হয়ে যাচ্ছে আমার ছেলেটা।'

—'না রঞ্জা না। তুমি কি করবে? কেন নিজেকে দোষি বানাচ্ছ? তুমি তো সব রকম চেষ্টা করেছ ছেলেকে ভালো রাখতে।'

—'না জয়। আমি সব কিছুর জন্য দায়ী। আমার পাপেই... আমার পাপ। আমার পাপ সবটার জন্য দায়ী। আমার পাপের ফসলই আজ কালো ছায়া হয়ে এসে আমার ছেলেকে... তুমি দেখ জয় ওই ছবিটার দিকে তাহলেই বুঝতে পারবে আমি ভুল বলছি না। সত্যি আমারই পাপের ফল ভুগছে আজ

www.banglabookspdf.com

রিভু। তুমি দেখতে পাচ্ছ জয়? তুমি দেখতে পাচ্ছ? ভালো করে দেখ জয়, ওই ছবির একটা বাচচার মুখ কেমন হিংস্র হয়ে উঠেছে... তুমি দেখতে পাচ্ছ যে দ্বিতীয়টা কেমন আগুন ঝরা চোখ নিয়ে তাকাচ্ছে প্রথমটার দিকে...'

—'আবার? আবার ওই কথা? এসব কি বলছ তুমি বারবার বলতো? তুমি না একজন শিক্ষিত মহিলা! তুমি এমন অশিক্ষিতের মতো কথা বল কী করে? রিভুর যা হয়েছে তা আমাদের চরম দুর্ভাগ্য, কিন্তু এতে কোনো অলৌকিক কিছু নেই তোমায় তো বলেছি বল। রিভুর যেটা হয়েছে সেটার নাম 'Syndrome of Subjective Delusion'। এমন ক্ষেত্রে রিভুর মতোই হয়। যার এমন হয় তার মনে হতে তাকে যে, হুবহু তারই মতো দেখতে অপর কারোর অস্তিত্ব আছে এই পৃথিবীতে, তারই চোখের সামনে। আর সেই একই দেখতে মানুষটা বা তার সেই ক্লোন সম্পূর্ণ নিজের মতো করে বাঁচে, এমনটাই মনে করে syndrome of subjective delusion এর কবলে পড়া মানুষরা। রিভু ভাবছে ঋষি নামে এমন কেউ আছে যে একদম ওরই মতো আর সে অন্য একটা আলাদ সত্ত্বা। রিভু ভাবছে এই কাল্পনিক ঋষি বুঝি ক্ষতি করবে ওর। এটা খুব জটিল মানসিক অবস্থা বা ব্যাধি বলতে পার। কিন্তু বিশ্বাস কর আমরা সব চেষ্টা করছি। ও ঠিক ভালো হয়ে যাবে।'

—'না না না না। কেন হতে যাবে এই সব কঠিন মানসিক অসুখ ওর? বল কোনো কারণ আছে? কোনো সাধারণ ঘরে এসব হয়? আমি জানি এসব হয়েছে ওর আমারই পাপের জন্য। ওই পাপই ফিরে এসে আজ... এসব মিথ্য বলে তুমি আমায় ভুলিয়ো না। আমি সব বুঝি।' আরও জোরে কাঁদছে এবার রঞ্জা।

—'মিথ্যা নয় রঞ্জা। সব সত্যি। ১৯৭৮ সালে প্রথম একজন গ্রীক বৈজ্ঞানিক এই জটিল মানসিক অবস্থার ব্যাখ্যা করেন আর তার পর...'

—'না না না।' ডুকরে কাঁদছে রঞ্জা। কোনো যুক্তি আর বুদ্ধি কাজ করছে না ওর। কোনো বিজ্ঞান যেন আর মানতে পারছে না ও।

বুকের ভেতরটা দুমরে মুচড়ে খান খান হয়ে যাচ্ছে জয়েরও। এসব কি দুর্যোগ নেমে এল ওর সংসারেই! ও যে আর পারছে না নিজেকে সামলে রাখতে। ওর মনও যে ভেঙে পড়ছে। কিন্তু না। ওকে তো শক্ত হতেই হবে। ভালো করতেই হবে রিভুকে। রিভুর মন থেকে উৎখাত করতেই হবে এই কাল্পনিক ঋষির অস্তিত্বকে।

৩

একটা পরিত্যক্ত আত্মার মতো একলা অন্ধকার ঘরে বসে ছিল রিভু। আজকাল শুধু নিজের মৃত্যু ছাড়া আর কিছু ভাবে না ও। সত্যি রিভু আর বাঁচতে চায় না। এই অর্থহীন, আতঙ্কচেরা জীবনটার সত্যি এবার শেষ হওয়া দরকার।

হাজারবার, লক্ষবার রিভু সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে নিজের কথা। নিজের সত্যিটা। কিন্তু না কেউ বিশ্বাস করেনি। সবাই মনে করে রিভু পাগল। সত্যি নাকি বাস্তবে ঋষি বলে কারোর অস্তিত্ব নেই। সবটাই নাকি রিভুর কল্পনা।

www.banglabookspdf.com

কিন্তু না, রিভু কী করেই বা বোঝাবে? কী করে বোঝাবে যে ঋষি কোনো কাল্পনিক সত্তা নয়। ঋষি বাস্তব। ভীষণ ভাবে বাস্তব। ঋষি একটা রক্ত মাংসের জলজ্যান্ত মানুষ যে সব সময় চায় রিভুকে মেরে ফেলতে। হ্যাঁ এটা হতে পারে যে ঋষি কোনো নারকীয় ছায়ারই প্রতিফলন, কিন্তু ঋষি চরম ভাবে বাস্তব।

না রিভু সত্যি জানে না কে এই ঋষি? ঠিক কি চায় এ? কেন এত রাগ রিভুর ওপরই ওর? ও কি সত্যি নীহারের প্রেমিক নাকি এ আসলে রিভুরই অস্তিত্বের আড়ালে লুকিয়ে থাকা কোনো কালো সত্ত্বা যে হঠাৎ করে বাইরে বেরিয়ে এসে আজ ভয় দেখাচ্ছে রিভুকেই?

নাঃ কোনো উত্তর নেই। ঋষিকে নিয়ে যত ভাবে ততই যেন পাগল পাগল লাগে রিভুর। মনে হয় এতদিনের সব যুক্তি, বুদ্ধি, বিশ্বাস, অবিশ্বাস সবটা একেবারে গুলিয়ে যাচ্ছে।

একলা ঘরে বসে বসে রিভুর বড্ড কান্না পাচ্ছে। নীহারও ভুল বুঝল ওকে। ওকে ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু না না। আসলে মোটেই নীহার ভুল বোঝেনি রিভুকে। ওকে ভুল বোঝানো হয়েছে। ঋষিই ভুল বুঝিয়েছে নীহারকে। আসলে নীহারের সাথে তো এখন ঋষিরই সম্পর্ক। কেউ জানুক বা না জানুক, কেউ মানুক বা না মানুক রিভু সবটা জানে। ঠিক বুঝতে পারে ও। ঋষি তো ওকে বলেইছে যে ওর সব থেকে প্রিয় জিনিসটা কেড়ে নেবে ও। আর নীহারের থেকে বেশি প্রিয় আর কিই বা আছে ওর জীবনে? না, এখন আর এ ঘরের বাইরে বেরোয়ই না রিভু। ও জানে তো ঋষি ওৎ পেতে আছে আশেপাশেই। একবার ওকে দেখতে পেলেই ওর টুঁটি টিপে ছিঁড়ে নেবে ওর কণ্ঠনালী।

হাত বাড়িয়ে মোবাইলটা টেনে নিল রিভু। না, আজকাল আর এই ফোনে কোনো ফোন আসে না। কোনো ম্যাসেজ ঢোকে না হোয়াটসঅ্যাপে, ফেসবুক অ্যাকাউন্টটাও পড়ে আছে প্রায় পরিত্যক্ত হয়ে।

অনেকদিন পর মোবাইল থেকে গান শুনতে ইচ্ছে করছে রিভুর। গান চালাল ও। ওর অনেক স্মৃতিবিজড়িত গান। আতিফ আসলামের গলায় 'দুরি সাহি যায় না।' খুব পছন্দের গান এটা নীহারের। কয়েক কলি শুনতেই চোখ জলে ভরে উঠল। না, এসব সুর, তাল, ছন্দ আর ওর জন্য নয়। গান বন্ধ করে দিল ও। আইকনে আঙুল ছুঁয়ে এবার চালাল অন্য জিনিস। গা শিরশিরে ভূতের গল্প। হ্যাঁ সানডে সাসপেন্সে শোনান কয়েকটা পুরোনো ভূতের গল্প মোবাইলে ডাউনলোড করে রেখেছিল ও।

'কে হাসে' বলে একটা বীভৎস গল্প হয়ে চলেছে রিভুর দুই কান জুড়ে। রোম খাড়া করা গল্পের মাঝে বীভৎস হাসি ছলকে ছলকে উঠছে আর রিভু যেন ভীষণ উপভোগ করছে আজ এই ভয়ের নারকীয় অনুভূতিটা।

—'আআআ'... বাঁচাও আমায়... আআ' হঠাৎ গল্পের তাল কেটে গেল। গল্পের মাঝেই হঠাৎ একটা বীভৎস নারী কণ্ঠের চিৎকার। প্রথমটায় ভীষণ হতচকিত হয়ে গেল রিভু। আরে! কি হচ্ছে এটা? আগেও তো এই গল্পটা কয়েকবার শুনেছে ও। না এমন কোনো চিৎকার তো গল্পের মাঝে ছিল না। তবে?

কয়েক মুহূর্ত নিল রিভু যেন সবটা বুঝতে নিজের ঘোর কাটিয়ে। আর ঘোর কাটতেই দপ দপ করে উঠল ওর মাথার শিরা। বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। আরে! এই মেয়েটার গলা যে ওর রন্ধ্রে

www.banglabookspdf.com

রন্ধ্রে চেনা। এ তো নীহারের গলা! কিন্তু প্রি লোডেড এই গল্পের মাঝে নীহারের চিৎকার এল কী করে?

হা হা হা হা হা হা হা... একটা বীভৎস কদর্য অট্টহাসি এবার আছড়ে পড়ল রিভুর দুই কানে ইয়ারপ্লাগের মধ্যে দিয়েই।

না এটা গল্পের অন্তর্গত হাসি নয় বুঝতে পারছে রিভু। কারণ যে হাসছে তার গলা খুব চেনা ওর। এটা রিভুর নিজেরই গলা।

—'রিভু... রিভু... নীহার যে শেষ রিভু। ও যে এই জগতের মায়া কাটিয়ে ফেলবে আজকেই। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই আমি যে ওকে মেরে ফেলব রিভু...' হা হা হা।

—'ইউ সোয়াইন' বেশ কয়েকটা কাঁচা ইংরাজি গালাগাল দিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে যাচ্ছিল রিভু। কিন্তু পারল না। নিভে যাওয়া, কালো হয়ে থাকা ফোন স্ক্রিন জ্বলে উঠেছে হঠাৎ। আর তাতে ফুটে উঠেছে একটা বীভৎস দৃশ্য। ঠিক যেন কোনো হরর ফিলমের ভিডিয়ো ক্লিপিং চলছে।

নীহারের অফিসের সামনের রাস্তার মাঝে অচেতন পড়ে রয়েছে নীহার। সারা শরীর ওর ভেসে যাচ্ছে রক্তে। আর ওর সামনেই বসে রয়েছে রিভু। না না রিভু নয়, ঋষি। নীহারের মৃতদেহ থেকে খুবলে খুবলে মাংস খাচ্ছে ঋষি। নিজের লকলকে জিহ্বা দিয়ে চাটছে নীহারের শরীর থেকে চুইয়ে পড়া টাটকা তাজা রক্ত।

উফফফফ! ওয়াক ওয়াক... পর পর দু-বার বমি উঠল রিভুর। কিন্তু পলকেই যেন নিজের সব টুকু সংযম বুদ্ধি হারিয়ে ফেলল ও। না ঠিক ভুলের ভাবনা আর কাজ করছে না ওর। এখন শুধু একটাই লক্ষ্য। নীহারের কাছে এক্ষুনি যেতে হবে ওকে যেভাবেই হোক। এখন সবে ছয়টা। তার মানে নীহারের অফিস থেকে বেরোতে আরও এক ঘণ্টা বাকি। তার আগে যেভাবেই হোক ওকে পৌঁছে বাঁচাতেই হবে নীহারকে। পাগলের মতো ক্ষিপ্র গতিতে গাড়ির চাবি হাতে নিয়ে দৌড়ে বেরোবার জন্য পা বাড়াল রিভু।

—'রিভু, রিভু এমন পাগলের মতো কোথায় যাচ্ছিস?' মায়ের ডাকে সাড়া দেবার সময় এখন নেই ওর। শুধু কোনোমতে বলল—

—'ঋষি আজ ওর ফাইনাল চালটা দিয়ে দিয়েছে মা। আমার নীহারকে মারবে বলে বেরিয়ে পড়েছে ও। কিন্তু আমি এটা কিছুতেই হতে দেব না। আমি নীহারকে বাঁচাবোই। আর যদি বাঁচাতে না পারি তাহলে হয়তো আমিও আর কোনোদিন ফিরব না।' বলেই দুদ্দাড় করে দৌড়ে বেরিয়ে গেল ছেলেটা।

—'রিভু, রিভু এসব কী বলছিস তুই? ঋষি বলে যে কেউ নেইই আসলে'... না রঞ্জার কোনো কথা পৌঁছাল না তার ছেলের কানে। ততক্ষণে হাই স্পিডে গাড়ি স্টার্ট করে দিয়েছে রিভু। ছেলেকে থামাতে গিয়ে শাড়িতে পা বেঁধে চৌকাঠে হুমড়ি খেয়ে পড়ল রঞ্জা। বাড়িতে আজ জয় নেই। চাকরটাও একটু বেরিয়েছে। না, আজ আর কেউ বাঁচাতে পারবে না ছেলেটাকে। সাক্ষাৎ মৃত্যুর ডাকে সাড়া দিতেই যেন আজ পা বাড়িয়েছে ছেলেটা।

www.banglabookspdf.com

৪

—'মিস্টার বসাক, মিসেস বসাকের অবস্থাটা মোটেই ভালো নয়। সবে পাঁচ মাস আগে ওনার সিজারিয়ান ডেলিভারি হয়েছে, এর মধ্যে হুট করে আবার প্রেগন্যান্সি... অনেক জটিলতা হতে পারে। এমনকী লাইফ রিস্কও'...

ডাক্তারের চেম্বার থেকে কালো মুখে বেরোল জয়। উদ্বিগ্ন রঞ্জা এগিয়ে গেল স্বামীর দিকে। ও দরজার বাইরে থেকে সবটাই শুনেছে।

—'জয়, আমি সবটা শুনেছি। আর তাই আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি এবোরশান করাব। এই বাচচাটা আমি রাখব না। এটা একটা অবাঞ্ছিত প্রেগন্যান্সি। আমি চাই না এই বাচচাটা শুধু শুধু রাখতে গিয়ে আমাদের জীবনে অহেতুক কোনো জটিলতা তৈরি হোক। আমার এখন মূল লক্ষ্য আমার ছেলে রিভু আর তাকে সবচেয়ে সুন্দরভাবে বড়ো করে তোলা। তাই আমি চাই না সেই ব্যাপারে কোনো মুশকিল তৈরি হোক।'

—'হ্যাঁ রঞ্জা তুমি ঠিক বলছ। আমিও তাই চাই। যে ব্যাপারটার জন্য তোমার রিস্ক আছে বা রিভুকে বড়ো করে তোলার ব্যাপারে সমস্যা হতে পারে সেই ব্যাপারটা আমি চাই না।'

হ্যাঁ ছাবিবশ বছর আগে জয় আর রঞ্জা এভাবেই নিজেদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে শেষ করেছিল একটা প্রাণ। কিন্তু তাকে শেষ করার পর থেকেই মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত চাপ তৈরি হয়েছিল রঞ্জার। প্রায় ঘুমালেই একটা স্বপ্ন আসত চোখে। হুবহু রিভুর মতো দেখতেই একটা বাচচা। আর সে বারবার এগিয়ে আসছে রঞ্জার দিকে, আর রঞ্জা নিজে কুচি কুচি করে কেটে ফেলছে তাকে। প্রতিবারই এই স্বপ্নটা দেখার পর ঘুম ভেঙে যেত রঞ্জার আর তারপরই ওকে চেপে বসত একটা মারাত্মক কালো ভয়।

সেই সময়ে নানা ধরণের আতঙ্ক ভর করত ওকে। দেওয়ালে টাঙান ওই যমজ বাচচার পোস্টারটার দিকেও কেন যেন তাকাতে পারত না ও। মনে হত ওই পোস্টারের একটা বাচচা যদি রিভু হয় তাহলে আর একটা যেন ওদের অনাগত সন্তান যাকে মেরে ফেলেছে রঞ্জা। আর তখন বারবার মনে হত ছবির দ্বিতীয় বাচচাটা যেন আগুন ধরা চোখে দেখছে ওকে। ও যেন বলছে—

—'কেন? কেন মেরে ফেললে আমায়? কী দোষ ছিল আমার?' সেই সময় অনেকবার ওই ছবিটা খুলে দেবে ভেবেছে রঞ্জা। কিন্তু কেন যেন পারেনি। যতবারই খুলতে গেছে, ততবারই কী যেন একটা অদৃশ্য শক্তি অবশ করে দিয়েছে ওর হাত।

বেশ অনেকদিন ধরে রঞ্জার মনের এই উথাল পাতাল আর টানাপোড়েন চলেছিল। তারপর ঝড় স্তিমিত হয়েছিল কালের প্রভাবে।

কিন্তু ইদানীং আবার ফিরে এসেছে রঞ্জার মনের সেই কালো ভয়। যবে থেকে রিভুর এই সব মানসিক সমস্যা শুরু হয়েছে তবে থেকেই যেন রঞ্জাও দেখতে পাচ্ছে এ ছবির দ্বিতীয় শিশুটার চোখে প্রতিশোধের এক অদ্ভুত আগুন।

হঠাৎ পাগলের মতো ছবিটার সামনে ছুটে গেল রঞ্জা। মাথা ঠুকছে ছবিটার সামনে—

www.banglabookspdf.com

—'বল, বল কী চাই তুই? কেন আমার রিভুকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছিস? কীসের এত রাগ তোর? আমার ছেলেটা এক্ষুনি পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল। আমি জানি এলোপাথাড়ি গাড়ি চালাবে ও। হয়তো আজই একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে ও শেষ হয়ে যাবে। এটাই চাস তুই তাই না?' পাগলের মতো প্রলাপ করছে রঞ্জা।

—'প্লিজ বাবা। প্লিজ ওকে ছেড়ে দে। আমি তো তোর অপরাধী। তুই আমায় টেনে নে। আজই টেনে নে। তুই আমায় শাস্তি দে। কিন্তু ওর ক্ষতি করিস না প্লিজ।' এবার বাচচা মেয়ের মতো ঝরঝর কাঁদছে রঞ্জা। ওর কান্নার শব্দ মিশে যাচ্ছে বাতাসের প্রতিটা অনু পরমাণুতে একটা শূন্য হাহাকারের মতো।

বছর তিনেক পর

মায়ের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে রিভু। চোখ দিয়ে জল পড়ছে টপ টপ। আজ রিভু আর নীহারের বিয়ে। মা থাকলে আজ কতই না খুশি হত।

বছর তিনেক আগে একটা কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে মারা যান রিভুর মা মিসেস রঞ্জা বসাক। আর রিভুর মনে হয় হয়তো ওর জন্যই মা এভাবে অকালে...

আসলে সেই সময় রিভুর কিছু মানসিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল একটা ছোটো অ্যাক্সিডেন্টের পর। রিভু তখন নানা রকম অবাস্তব জিনিস হ্যালুসিনেট করত। কেমন যেন একটা কল্পনার জগতে চলে গেছিল ও। ওর মনে হত ওরই মতো হুবহু দেখতে কেউ যেন ভয় দেখিয়ে বেড়াচ্ছে ওকে। আর সে যেন নীহারকে কেড়ে নিতে চায় ওর কাছ থেকে। দিনের পর দিন পাগলের মতো অবাস্তব সন্দেহের তীক্ষ্ণ ফলায় তখন ও বিদ্ধ করেছে নীহারকেও। কষ্ট দিত ওকে, অপমান করত ওকে বিচ্ছিরি ভাবে। আজ সে সব ভাবলেই অবাক লাগে রিভুর।

এমনই একদিন বিকালে ও হ্যালুসিনেট করেছিল যে নীহারকে যেন খুন করে দিয়েছে ওর সেই ক্লোন। এটা দেখে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ও সেদিন ছুটেছিল নীহারের অফিসের দিকে। না আসলে নীহারের কিছু হয়নি সেদিন। ছোটো একটা চোট লেগেছিল শুধু অফিসের বাথরুমে পড়ে গিয়ে, সেটা নীহারের অফিসে পৌঁছে জেনেছিল রিভু।

যাই হোক নীহারের কিছু না হলেও সেদিন রাতেই মাতৃহারা হয়েছিল রিভু। আসলে মানসিক ভাবে অসুস্থ ছেলের হঠাৎ ওভাবে পড়িমরি করে বেরিয়ে যাওয়া, তার প্রলাপ এসব দেখে বোধ হয় বেশি টেনশন হয়ে গেছিল সেদিন মায়ের। আর তাই সেই রাতেই হয়তো হার্ট অ্যাটাক...

কিন্তু মা চলে যাবার পর পরেই আস্তে আস্তে সুস্থ হতে শুরু করে রিভু। আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে ও। চাকরি ফিরে পায়। নীহারও আবার ফিরে আসে ওর জীবনে।

—'এবার বেরিয়ে পর বাবা... নীহারের দাদা এসেছেন বর নিতে।' বাবার ডাকে যেন হুঁশ ফিরল রিভুর।

—'তুমি যাবে না বাবা?' প্রশ্ন করল রিভু।

—'হুম আসছি একটু পরে...।'

www.banglabookspdf.com

বর নিয়ে ওরা চলে যেতেই দৌড়ে শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল জয়।

—'রঞ্জা... রঞ্জা আজ আবার সে হিংস্র চোখে তাকাচ্ছে জান... জানি না আজ আবার কি অমঙ্গল ঘটতে চলেছে...'

হ্যাঁ রঞ্জা চলে যাবার পর থেকে জয়ও এই তিনবছরে বুঝেছে যে পোস্টারের ওই দ্বিতীয় বাচচার ছবিটা নেহাত প্রাণহীন কোনো জড় বস্তু নয়। জয়ও এখন বুঝতে পারে ও ছবির রং বদলায় মাঝে মাঝে, চোখের দৃষ্টিও যেন বদলায় ওই ছবির হাসিমুখের নবজাতকের।

—'কি চাস বল? আবার কি চাস তুই? না না। তুই প্লিজ আমাদের রিভুর কোনো ক্ষতি করিস না। ওকে ভালো থাকতে দে। তোর মায়ের মতো না হয় আমাকে তুই...' ওই পোস্টারের সামনে দাঁড়িয়েই পাগলের মতো বলে চলেছেন জয় বসাক।

কিন্তু না আর বলতে পারছে না জয়। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। অসহ্য ব্যথা করছে বুকের বাম দিকটা। উফফ! যেন ভেঙে পরছে পাঁজর। মুখ থেকে গেঁজলা বেরোচ্ছে এবার জয়ের। চোখের সামনে নেমে আসছে অন্ধকার।

—'দাদা, দাদা... কিরে যাবি না? এই দাদা কি করছিস ভিতরে।' জয় শুনতে পাচ্ছে বাইরে থেকে ওকে ডাকছে ওর বোন রিমি।

না জয়ের আর বিয়েতে যাওয়া হবে না। ও যে অন্য গন্তব্যের দিকে এগোচ্ছে। আস্তে আস্তে চোখ বুজে আসছে জয়ের। আজ ফিরবে ও রঞ্জার কাছে। আজ বাব মা দুজনকেই নিজের কাছে নিয়ে যাচ্ছে ওদের সেই সন্তান যাকে একদিন বিনা দোষে সরিয়ে দিয়েছিল ওরা। রঞ্জা আর তাকে নিয়ে ভালো থাকার চেষ্টা করবে আবার জয়। না, রিভুর কোনো ক্ষতি আর তাকে করতে দেবে না ওরা। হ্যাঁ রঞ্জাকে গিয়ে আজ বলবে জয়—

—'তোমার রিভু আজ সংসারী হল রঞ্জা। তুমি যেমন নিজের জীবন দিয়ে একদিন বাঁচিয়েছিলে রিভুকে, তেমনই আজ আমিও নিজের জীবন দিয়ে তাকে ছেড়ে এলাম সুখী গৃহকোণের সুরেলা পথে। ভালো থাক রিভু। শুধু এটুকুই চাওয়া আর তার জন্যই যে সব কিছু...'

—

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

নিভৃত যতনে

স্যানডির কথা

ওদের পাঠানো দামি শপিং মল এর কেতা দুরস্ত জামা কাপড় পরে আর দামি সুগন্ধি গায়ে ছিটিয়ে আয়নার সামনে গুটি গুটি পায়ে গিয়ে দাঁড়াল স্যানডি। নিজেকে দেখে নিজেই চমকে উঠল যেন। এ কে? একে কি আদৌ চেনে ও? এ তো পুরো অচেনা একটা মানুষ যেন। ওকে তো ঠিক বাংলা সিরিয়ালের হিরোদের মতো লাগছে। আসলে দেখতে শুনতে তো ও বরাবরই বেশ ভালো, তার ওপরে গত কয়েক মাসের ঘষা মাজা, আর আদপ কায়দা শেখার চক্করে পরে ও যেন বদলে গিয়েছে পুরোপুরি। আর আজ দামি পোশাকের সংযুক্তিতে ব্যাপারটা যেন পুরো অন্য একটা মাত্রা পেয়েছে। অবশ্য ওর রূপ, আদপ কায়দা আর কেতাই যে ওকে এই নতুন চাকরিতে টিকে থাকতে আর সাফল্য পেতে সাহায্য করবে সেটা তো হাড়ে হাড়ে জানে স্যানডি, কিন্তু তবুও...। কিন্তু এই ভাবটা আজ ঝেড়ে ফেলতেই হবে ওকে সেটা ভেবেই আবার মন শক্ত করল স্যানডি। ডিউক দা বলেছে যে ওর এই সব কিন্তু কিন্তু ভাব ওর পেশাদার চালকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে আর যেটা ওদের পেশায় কোনোভাবেই চলবে না, তাইতে এটা আবার ওর প্রথম কাজ। তাই নিজের মন শক্ত করে কাজের দিকে মনে দিতে চেষ্টা করল ছেলেটা। সাফল্য যে ওকে পেতেই হবে। ওর কাজ, ওর রোজগার এ সবের ওপর যে আজ নির্ভর করছে অনেক কিছুই। ওর আগামী দিনের চাবিকাঠি যে আজ শুধু ওরই হাতে।

নিজের নতুন ফোনটা টেনে নিল স্যানডি। নতুন শেখা কৌশল খাটিয়ে বুক করে নিল শহরে ছুটে বেড়ান নামজাদা ভাড়ার ক্যাব গুলোর একটা। ক্লায়েন্টের সব ডিটেলস তো আছেই ওর কাছে। এর পর শুধু গিয়ে পৌঁছানো দরকার ঠিক সময়ের মধ্যে। আর তো বেশি বাকি নেই ওর পরীক্ষার। ক্যাব বুক হয়ে গেল। নির্দিষ্ট যান্ত্রিক বার্তা জানিয়ে দিল আসছে ওর বাহন। বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ টা ক্রমেই বেড়ে চলেছে ওর। চোখের কোণটা কেমন যেন ভিজে ভিজে ঠেকছে। আজকের কাজে সফল হওয়াটা খুব দরকার সেটা জানে স্যানডি, তবুও কেন যেন মনের একটা চোরা কোণা থেকে যেন কেউ অনবরত বলে চলেছে— 'না না। তুই আজ সফল হোস না। তুই আজ সফল হলে হয়তো সব কিছু অনেক বদলে যাবে। তুই বদলে যাবি আর সবটা জানলে সেও কি আর...' উফফ! কী হচ্ছে এটা? নিজেকেই নিজে আবার শাসন করল স্যানডি। না, আজ ওকে সফল হতেই হবে, আর সেটা না হতে পারলে ও যে হারিয়ে ফেলবে সব কিছু। না, এই সফলতা ওর দরকার। সব দ্বিধা কাটাতেই হবে এবার। নিজের জন্য, তার জন্য, সবকিছুর জন্য।

www.banglabookspdf.com

ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল স্যানডি। মনের ভেতরটা দুমরে মুচরে যাচ্ছে। কিন্তু না তবুও ওকে এগোতেই হবে ওর লক্ষ্যের দিকে, এগোতেই হবে ক্লায়েন্টের ঠিকানার দিকে।

১

—'তুই তাহলে সত্যি নিকে করছিস শাহিন?'

—'হ্যাঁ। করবই তো। আমার পথ ছাড়... পথ ছাড় বলছি...'

—'তুই তোর আল্লার নামে কসম খেয়ে বলতো দিকি তুই কোনোদিন ভালোবাসার নজরে দেখিসনি আমায়...'

—'না না না। না দেকিনি। দেকলে কি সেটা আগে তোমায় বলতুমনি নাকি? আমি তোমায় ভালো কথা বলছি রুপেশ দাদা, তুমি এসব পাগলামো ছাড় দেকিনি বাপু। তুমি হলে গিয়ে হিঁদুর ঘরের পোলা আর আমি মোছলমানি। এসব হয় নে কো।'

—'এত আমি বুঝিনে রে। আমি তোকে বড়ো ভালোবাসি। আর আমি জানি তোর মনেও আমার জন্য অনেক মায়া আছে, সে তুই যতই আমার দিয়ে দূরে দূরে পালাস নে কেন আমি তোর মন পড়তে পারি। মায়া যদি তোর নাই থাকত তাহলে সেবার আমার কলেরা হল বলে তুই পিরের থানে মাথা ঠুকলি কেন? তুই কি ভাবিস আমি খবর রাখি নে? আর কেনই বা আমি অন্য মেয়েছেলের সাথে দুটো বেশি কথা কইলে তোর দু-চোখে মেঘ ঘনায় বল তো দেখি? কি ভাবিস তুই? আমি কিছু জানিনে? সব আমার নজরে আছে বুঝলি?'

—'এত কথা জানি নে। তুমি আমার কেউ নও আমিও কেউ নই তোমার। এই হল হক কথা। এখন আমায় যেতে দাও তো দিকি। কে কোথা দিয়ে দেখি ফেলবে যে তুমি আমার পথ আটকে এত কতা কইচ, আর ওমনি একখানা সববনাশ হোক আর কি। তুমি জাননে আমার বাপ খুড়ো কেমন ধারার?'

—'ঠিক আচে যা তুই। তবে একখানা কথা মাথায় রাকিস, যেদিন তুই নিকে করবি সেদিনই আমি আমার পরান দেব। গলায় দড়ি দেব নইলে বিষ খাব। খাবই খাব এই আমি বলে দিলুম। আমি বেঁচে থাকতি তোকে অন্য কারো কাছে যেতি দিতি পারব নে... কিছুতে পারব নে।'

উফফ! এবার কী করবে শাহিন। এই রুপেশ দাদা ছেলেটা যে বড্ড গোঁয়ার। আজ দুপুরে বলা ওর কথাগুলো যে কিছুতেই ভুলতে পারছে না শাহিন। একটা ছোটো গাঁয়ের খুব সাধারণ মুসলমান পরিবারের মেয়ে শাহিন। ওদের বাড়িতে বাপ আর খুড়োর কথাই শেষ কথা। আর সেই জন্যই শুধু ওর আববু চাইল নে বলেই তো ক্লাস সেভেনের পর আর পড়া হল না শাহিন এর। এই ছোটো গ্রামটায় মুসলমানদেরই বাস মূলত। তবে হিন্দুও আছে দু-এক ঘর। এই রুপেশ দাদা তেমনই এক হিন্দুর ঘরের ছেলে। এই গাঁয়েরই স্কুলের বারো কেলাসে পড়ে। সবাই বলে এই এলাকায় রুপেশ এর মতো ছেলে আর হয় নে কো। কি সুন্দর দেখতি, পড়াশুনায় মাথাও আছে। এই তো এবার বারো কেলাস পাশ দিয়ে কলেজেও যাবে বোধ হয়। কিন্তু রুপেশ এর কপালটা বড়ো খারাপ। সেই কোন ছেলেবেলায় বাপ মা-কে হারিয়েছে, আর এখন মানুষ হচ্ছে মামা মামির সংসারে। ওর মামিটা বড্ড

www.banglabookspdf.com

পাজি। বড়ো খাটায় ছেলেটাকে, আর মামাটাও হয়েছে তেমনই বউ ভেদা আর মেনিমুখো। এই দুখী ছেলেটার কেন কে জানে সেই কোন কাল থেকেই মনে ধরে গেছে শাহিন কে। বারবার, বারবার শাহিন এর কাছে ছুটে ছুটে আসে ও। শাহিন যত দূরে পালাতে চায় ওর থেকে তত যেন ওকে বাঁধতে চায় ছেলেটা। কি পাগল ছেলে রে! একবারও বোঝে না কেন শাহিন পালাতে চায় ওর থেকে? আরে শাহিনের যে বড্ড মায়া পড়ে গেছে ওর জন্য। অমন রাজপুত্তুর পানা যার রূপ, যার অমন মিষ্টি ব্যবহার তার মায়ায় না পড়ে কি আর উপায় আছে। কিন্তু শাহিন কে যে সে সব মনের কথা মনেই চেপে রাখতে হবে। এসব কথা যদি ভুল করেও আববু জানতে পারে তাহলে যে সববনাশ। ওই জেদি, খুনে আর একরোখা লোকটা যে কি করতে পারে আর কি না পারে তা যে হাড়ে হাড়ে জানে শাহিন। আর ও কি পারে কোনোভাবেই ওই প্রাণের মানুষটার একটুও ক্ষেতি হতে দিতে। সেই জন্যই তো বারবার ওর থেকে দূরে থেকেছে শাহিন। কিন্তু এবার? এবার কি হবে? পাগল ছেলেটা যদি সত্যি কিছু করে বসে? ও যে সব পারে করতে শাহিনের জন্য সেটা তো জানে ও। সেই যে সেবারে হাত কেটে শাহিনের নাম লিখেছিল! উফফ! কি করবে এবার শাহিন? আর তা ছাড়া শাহিন নিজেও যে এক দণ্ড শান্তি পাচ্ছে নে। ও নিজেই বা কি করে রুপেশ ছাড়া আর কাউকে মেনে নেবে নিজের জীবনে? ও যে নিজের মন প্রাণ সব কিছু রুপেশকে দিয়ে বসে আছে। না, কিছু একটা এসপার ওসপার করতেই হবে এবার। নইলে যে কেউ বাঁচবে না। না শাহিন, না রুপেশ না আববুর পছন্দ করা ওই ছেলেটা। না, আর ভয় পেলে চলবে না। এবার সব ভয়কে হারিয়ে দিয়ে জিততে হবে, জিততেই হবে। শাহিনরা হেরে গিয়ে আববুরা বারবার জিততে পারে নে, ভালোবাসা বারবার হারতে পারে নে। এবার শুধু মেয়েছেলে বলে শাহিন আর কলের পুতুল বনবে নে কিছুতেই।

২

ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে রুপেশ বুঝতে পারল ওর মাথাটা টলছে, পা দুটো কাঁপছে থর থর, চোখের সামনে যেন চাপ চাপ অন্ধকার নেমে আসছে ওর। দু-এক পা এগিয়ে সামনের একটা পাকা বাড়ির বাঁধানো রোয়াকে ধপ করে বসে পড়ল ও। এটা কী শুনল ও? ডাক্তারবাবু কী বললেন এটা? শাহিন এর শরীরে বাসা বেঁধেছে এমন এক মারণ রোগ? কবে? কীভাবে? ক্যান্সারের মতো একটা সাংঘাতিক অসুখ কীভাবে ধরল শাহিনকে? ডাক্তারবাবু যা বললেন তা যে ভয়ানক। সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নাকি দেখা গেছে যে শাহিনকে ধরেছে ক্যান্সার। ডাক্তারবাবু বললেন, এখন নাকি শাহিনকে ভালো করতে গেলে অনেক দামি চিকিৎসার প্রয়োজন। অনেক দামি দামি ওষুধ, অপারেশন, কেমোথেরাপি না কি যেন সব বলে সেগুলো নাকি লাগবে। অনেক অনেক টাকা নাকি লাগবে তাতে। কিন্তু রুপেশ কোথায় পাবে অত টাকা? কী করবে এবার ও? তাহলে কি শাহিন তিল তিল করে শেষ হয়ে যাবে ওরই চোখের সামনে? ও শুধু দেখবে বোবা দর্শকের মতো। কিন্তু শাহিনকে ছাড়া ও বাঁচবে কী করে? ওই যে ওর জীবনের সবটুকু। না, শাহিনকে কোনোভাবেই মরতে দেবে না রুপেশ। যে ভাবেই হোক মেয়েটাকে বাঁচাবে ও। ও তো বরাবরই শাহিন এর জন্য সব করতে পারে। আজ ও কি তাহলে পারবে না নাকি? কিন্তু ঠিক কি করতে হবে এবার ওকে

www.banglabookspdf.com

সেটাই বুঝতে পারছে না রুপেশ। নিজেদের ভালোবাসাকে বাঁচানোর জন্য ওদের এত কষ্ট আর চেষ্টা কি তাহলে সব মিথ্যা হয়ে যাবে এবার? যেদিন সত্যি ওদের ভালোবাসা শেষ হতে বসেছিল, যেদিন সত্যি শাহিন এর বাড়ি থেকে ওর নিকা পাকা হয়ে গেছিল সেদিন ও তো ভগবান বাঁচিয়েই দিয়েছিলেন ওদের। আজও রুপেশের মনে পড়ে সেই দিনটা। খুব মন খারাপ করে, ভাঙা প্রাণ নিয়ে পুকুরের ধারে নির্জন দুপুরবেলায় বসেছিল সেদিন রুপেশ।

—'রুপেশ দাদা তোমার সাথে দুটো কথা ছিল গো।' আচমকা শাহিনের গলার স্বরে চমকে উঠেছিল ও। একি! শাহিন নিজে থেকে ওকে ডাকছে! যে মেয়ে সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে, যে সব সময় পালাতে চায় ওর থেকে সে আজ নিজে থেকে এসেছে ওর কাছে!

—'কী ব্যাপার তুই?'

শাহিন ভয়ে ভয়ে একবার দেখে নিয়েছিল চারপাশটা। তারপর পাতলা স্বরে বলেছিল

—'রুপেশ দাদা আমায় নিয়ে পালায়ে যাবে গো? আমার আববু যে জোর করে নিকে দিয়ে দিচেচ আমার। আমার থেকে অনেক বড়ো এই মরদ। আরও দুটি বিবি আছে তার। আমি এখানে নিকে করবনি গো। আমি যে তোমারে মন দিয়ে বসে আছি। আগে তোমায় কোনোদিন বলি নাই ভয়ে। যদি আববু জানতি পেরে তোমার কোনো ক্ষেতি করে সেই ভয়ে।

শাহিনের সেই ছলছলে চোখ আর কান্নাভেজা কথাগুলো যেন সেদিন হাতুড়ি ঠুকেছিল রুপেশের বুকে। শাহিন তারপর হঠাৎ সেদিন জড়িয়ে ধরেছিল রুপেশের হাত দুটো।

—'রুপেশ দাদা দু-একদিনের মদ্দি না পালালি যে সববনেশ আর আটকানো যাবেনি। তুমি কিছু একটা করো।' রুপেশ সেই মুহূর্তেই বুঝতে পেরে গেছিল সেদিন, খুব চটজলদি ওকে কিছু একটা করতেই হবে নিজের ভালোবাসাকে বাঁচাতে হলে। ভগবানের দয়ায় কীভাবে যেন ওর মাথায় খেলে গেছিল বাবলাদা'র কথাটা। বাবলাদা রুপেশের পিসির ছেলে। যখন রুপেশের বাপ মা বেঁচে ছিল তখন মাঝে মাঝেই বাবলাদা আসত ওদের বাড়ি। খুব ভালোবাসত রুপেশকে। ছেলেটা চালচুলোহীন হলেও মনটা বড্ড ভালো। এমনকী মামার বাসায় এসে থাকার পরও মাঝে মাঝে খোঁজ খবর নিত সে রুপেশের। ওর কাছে ফোন নম্বরও ছিল বাবলাদা'র। তারপর সেই বাবলাদা'র সাহায্য নিয়েই রুপেশ পালিয়ে এসেছিল শাহিনকে নিয়ে ওদের সেই গ্রাম ছেড়ে বহু দূরের এই হিন্দু গ্রামে। মন্দিরে বিয়ে করে নতুন সংসার করেছে ওরা। যদিও ও কাউকে বলেনি যে শাহিন অন্য জাতের। কিন্তু কি বা আসে যায় এই সব জাতে পাতে ভালোবাসার কি জাত হয় নাকি? সবাব রক্তই তো একইরকম লাল। কিন্তু তবুও শাহিনের নাম ও বদলে করেছে সোনা। হ্যাঁ ওর সোনা বউই তো। রুপেশ এখন এখানকার একটা ছোটো কারখানায় কাজ করে। আর শাহিন বাড়ি বসে মেয়েদের ব্লাউজ সেলাইয়ের কাজ করে। খুব সুন্দর করে সাজিয়েছে শাহিন ওদের ছোট্ট বাসাটা। ওদের সংসারে অভাব আছে ঠিকই, কিন্তু ভালোবাসা আর শান্তির কোনো কমতি নাই। এভাবেই ওরা পার করেছে দু-দুটো বছর। পুরোনো কেউ জানতেই পারেনি আর ওদের নতুন ঠিকানা। শাহিনটা একদম পাগলি। কোনো কিছুই যেন লাগে না ওর। রুপেশ মাঝে মাঝে রাতের বেলায় আদর করতে করতে বলে— 'হ্যাঁরে বউ,

www.banglabookspdf.com

তোকে তো আমি কোনো যত্নই করতে পারি না। দুধটা ফলটা খাওয়াতে পারি না, সুন্দর শাড়ি স্নো পাউডারও কিনে দিতে পারি না। তোর দুঃখু হয় না?'

পাগলিটা তখন রুপেশের বুকে মাথা রেখে বলে— 'দূর! তুমি তো নিজেরেই দিয়েচ আমায়। আর কি চাইব আমি? তুমি শুধু বল তুমি আমারেই এভাবে ভালোবাসবা সারা জীবন। আমারে কথা দাও আমি ছাড়া আর কোনো মেয়েছেলের দিকে দেখবা না, আমারে ছুঁয়ে বল আমি ছাড়া আর কোনো মেয়েমানুষকে ছুঁয়ে দেখবা না।'

রুপেশ ওকে বারবার বোঝায়— 'দূর পাগলি। তুই ছাড়া আর কে আছে আমার বল দিকি? তোকে ছাড়া আর কারে দেখব আমি? তুই যে আমার সব, তুই যে আমার জগত।' কিন্তু তবুও যেন বুঝতে চায় না অবুঝ মেয়েটা। বারবার বলে 'আমার মাথার দিব্যি বল তুমি শুধু আমার।' কিন্তু রুপেশ তো সত্যি শাহিন ছাড়া আর কোনো দিকে কোনোদিন তাকানোর কথা ভাবতেই পারে না। মিথ্যা দিব্যি তো করেনি ও। তবে কেন আজ মরতে বসল মেয়েটা? কি করবে এবার রুপেশ? কিচ্ছু বুঝতে পারছে না। কিন্তু কিছু যে একটা করতেই হবে। হঠাৎ রুপেশের মাথায় একটা ঝিলিক দিল। বটুকদা। হ্যাঁ বটুকদা-কে একবার ফোন করলে কেমন হয়। নম্বরটা তো আছেই। বটুকটা ওদের কারখানায় অল্প কদিন কাজ করেছিল। তারপর কাজ ছেড়ে শহরে চলে যায় কি না কি একটা বড়ো চাকরি পেয়েছে। সেই বটুকদাই দিন কয়েক আগে ফোন করেছিল রুপেশকে। চাকরি করতে যেতে বলছিল শহরে। বটুকদা-র কোম্পানিতেই লোক নেবে বোধ হয়। মায়না নাকি বেশ ভালো। রুপেশের মতো ফর্সা সুন্দর দেখতে ছেলে নাকি ওখানে গেলেই পেয়ে যাবে কাজ। কয়েক মুহূর্ত ভেবে বটুকদা-কে ফোনটা করেই ফেলল রুপেশ।

—'হ্যালো' কয়েকবার ফোন বাজার পর শোনা গেল বটুকদা-র গলা।

—'বটুকদা, রূপেশ বলছি। চিনতে পারছ?' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল রূপেশ।

—'কে?... অ রুপেশ। মানে কারখানার সেই হিরো কাটিং রুপেশ? তা এখানে কি মনে করে?'

—'বটুকদা আমার খুব বিপদ গো। অনেক টাকার দরকার। আমার বউটার ক্যান্সার হয়েছে যে। আমায় বাঁচাও বটুকদা। বাঁচাও।'

—'আরে দাঁড়া। অত হাউ মাউ করলে চলে নাকি?' শোন কাজ তোর হতে পারে। কিন্তু তাতে অনেক শর্ত আছে বুঝলি। প্রথম শর্ত হল তোকে শহরে আসতে হবে। আর আপাতত কিছুদিন তোকে শহরেই থাকতে হবে, অন্তত যতদিন না তোর ট্রেনিং শেষ হয়। তারপর আসল কাজ শুরু হলে যদি ভালো কাজ করে বসদের খুশি করতে পারিস তবে বাড়ি যাবার অনুমতি মিলতে পারে দু-একদিনের জন্য। কিন্তু আপাতত বাড়ি, বউ সব ভুলে যেতে হবে গুরু। আর হ্যাঁ ভুলেও বউকে নিজের সাথে নিয়ে আসার কথা ভেবো না কিন্তু। তাহলে জানবে নিজেরও বিপদ আর বউয়েরও।'

—'কিন্তু টাকা? আমার বউয়ের চিকিৎসা?'

—'ওগুলো সবই হবে। টাকা দেওয়া হবে তোমায়। চিকিৎসাও শুরু করতে পারবে ঠিকই। শুধু আপাতত তোমার বউয়ের সামনে যাবার অনুমতি মিলবে না। বুঝলে গুরু?'

www.banglabookspdf.com

না, একদমই ভালো বুঝতে পারছে না রুপেশ। কিন্তু শুধু এটুকু বুঝতে পারছে শাহিনকে ভালো করার একটা আবছা আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছে ও। দেখতে পাচ্ছে টাকা জোগাড়ের একটা উপায়। তাই সবটা না বুঝলেও কথাগুলো মেনে নিল রুপেশ।

—'তাই হবে। যা তুমি বলছ তাই হবে বটুকদা।'

—'বেশ। তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আয় শহরে ট্রেন ধরে। ঠিকানা পত্র সব তোকে এস এম এস করে দিচ্ছি।

কট করে কেটে গেল লাইন। দু-এক মুহূর্ত হতভম্বের মতো বসে থেকে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল রুপেশ। এবার সবটা গুছিয়ে নিতে হবে। হাতে আর সময় যে বেশি নেই। সব থেকে আগে শাহিনকে বোঝাতে হবে। ওকে বোঝাতেই হবে যে রুপেশকে যেতে হবে দূরে। হ্যাঁ শাহিন এর জন্য, শাহিনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই আজ ওকে যেতেই হবে শাহিনকে ছেড়ে। আর যে কোনো উপায় নেই।

৩

হুহু করে শহরের সীমানা ছাড়িয়ে ছুটে চলেছে ক্যাবটা। আর স্যানডির মনের হুহু ভাবটাও বেড়েই চলেছে ক্রমশ। আজ তাহলে সত্যি সত্যি ও রুপেশ থেকে স্যানডি হয়ে যাবে। বারবার ওর আজ মনে পড়ছে শাহিনের কথা। কী করছে পাগলিটা? এখানে আসার পর কয়েকবার ফোনে কথা হয়েছে মেয়েটার সাথে। কথা হলেই বারবার কান্নাকাটি করে। আর তখনই আরও বেশি দূর্বল হয়ে পড়ে রুপেশ। কিন্তু দুর্বল হলে যে ওর চলবে না। এখানে আসার আগেও কী ভীষণ কান্নাকাটি করেছিল শাহিন। রুপেশেরও যে বুকটা ফেটে যাচ্ছিল সে কথা যদি বুঝত মেয়েটা! তবে ও চিকিৎসা শুরু হয়ে গেছে রুপেশের পাঠানো টাকায়। জগা জ্যাঠা আর জ্যেঠির থেকে সব খবর তো পাচ্ছে রুপেশ। সত্যি এই মানুষ দুটো না থাকলে কী যে হত! ওরা রুপেশদের বস্তিতেই থাকে। সন্তান নেই, তাই শুরু থেকেই শাহিনকে বড্ড ভালোবাসত ওরা। ওদের হাতে শাহিন এর ভার ছেড়েই তো এখানে এসেছে রুপেশ।

banglabookspdf.com

প্রথম যেদিন এখানে বটুকদা-র কাছে এল রুপেশ সেদিনটা খুব মনে পড়ছে আজ। শুরুতেই বটুকদা বলেছিল বটুক নাকি বটুক নেই এখন। ও নাকি এখন ডিউক। আর তেমনি রুপেশও নাকি কাজে ঢুকলে আর রুপেশ থাকবে না। হয়ে যাবে স্যানডি বা সানি বা রনি এমন কিছু। আরও বলেছিল বটুকদা—

—'শোন এ কাজে ঢোকা সোজা। কিন্তু বেরোন সোজা না। এ কাজের ব্যাপারে কোথাও কোনো কথা বলবি না, বা পালাবার চেষ্টা করবি না। কোনো চালাকি কিন্তু বসরা বরদাস্ত করবে না এই আমি বলে দিলাম। যদি কোনো চালাকি করিস তাহলে কিন্তু মারা পড়ে যাবি বললাম। তুই চিনিস না আমাদের এই বসদের। এদের অনেক জোরদার ক্ষমতা। এদের সাথে লেগে তোর আমার মতো চুনো পুঁটি পুরো থেঁৎলে যাবে। তবে হ্যাঁ মন দিয়ে কাজ কর পয়সার মুখ দেখতে পাবি তোকে গ্যারান্টি দিচ্ছি। কিরে বুঝলি?'

www.banglabookspdf.com

না। রুপেশ কিছুই বুঝতে পারছিল না। একটা অজানা আতঙ্ক শুধু গ্রাস করছিল ওকে। ঠিক কি কাজ করতে হবে ওকে? এ কোথায় এসে পড়ল ও? রুপেশের ফাঁকা চাহনি দেখে বোধ হয় কিছু আন্দাজ করেছিল বটুক। তাই বলে উঠেছিল— 'এই তো সবে এসেছিস জার্নি করে। এখন একটু আরাম কর। তোকে সন্ধ্যায় নিয়ে যাব এক জায়গায়। তখন সব বুঝে যাবি।'

বটুকদা নিজের কথা মতো সেদিন ওকে সন্ধ্যার দিকে নিয়ে গিয়েছিল সেই নির্দিষ্ট জায়গাটায়। একটা ফ্ল্যাট। সেখানে বসে রয়েছে কয়েকজন লোক। ওদের মধ্যে বেঢপ মোটা আর টাকমাথা একটা লোক রুপেশকে দেখেই বটুকদা-কে বলে উঠেছিল—

—'আরে ডিউক, তেরা ইয়ে দোস্ত তো কাফি চিকনা হ্যায় রে।' তারপর চোখ টিপে আবার বলেছিল 'ইসকা টেরনিং আগার ঠিক ত্যারা সে হাম দে পায়ে তো ফের ইয়ে তো কামাল দিখায়গা রে।' লোকটার কথা শেষ হতেই বটুকদা সহ ঘরের সবাই ফেটে পড়েছিল এক অদ্ভুত অট্টহাসিতে।

রুপেশের মুখখানা ভয়ে শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছিল তখন। কিন্তু ওর সেই রং উড়ে যাওয়া চেহারাকে পাত্তা না দিয়েই ওরা বুঝিয়েছিল কাজের ব্যাপারটা। কাজটা শুনে আঁতকে উঠেছিল রুপেশ। ওকে করতে হবে পুরুষ দেহব্যবসায়ীর কাজ।

—'মানে এসব কি বলছ তোমরা?' কাতর গলায় বটুকের দিকে তাকিয়ে বলেছিল রুপেশ। পুরুষ দেহব্যবসায়ী? এমন আবার হয় নাকি? রুপেশ মহিলা দেহব্যবসায়ী বা বেশ্যার কথা শুনেছে। পয়সার জন্য নিজেদের সম্মান আর শরীর বিক্রি করে এরা। কিন্তু পুরুষ দেহব্যবসা? এসব কোন গ্রহের কথা!

বটুকই তখন বুঝিয়েছিল রুপেশকে। বলেছিল বড়ো বড়ো শহরের আনাচে কানাচে মহিলা দেহব্যবসায়ীর মতো পুরুষ দেহ ব্যবসায়ীদের অস্তিত্বও নাকি গজিয়ে উঠছে দিনে দিনে। পয়সাওয়ালা অথচ নিঃসঙ্গ একাকী অনেক মহিলাই নাকি পয়সার বিনিময়ে কিনে নেয় পুরুষদের যৌন সঙ্গ। আর শুধু তাই নয় অনেক সমকামি পুরুষও নাকি অর্থের বিনিময়ে ভাড়া নেয় অন্য পুরুষের শরীর। বটুকদের কোম্পানি বড়ো বড়ো পয়সাওয়ালা ক্লায়েন্টদের ভাড়া দেয় তেমনই পুরুষ দেহব্যবসায়ী। গোপন এ ব্যবসা চলছে ভালোই। কিংবা কে জানে ওপর মহলে আঁতাতও থাকতেই পারে এদের।

—'না না। আমি পারব না এসব। আমি যে শাহিন এর মাথা ছুঁয়ে কথা দিয়েছি'... বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেছিল রুপেশের। বলতে পারেনি ও। বটুকদা যে শুরুতেই বলেছিল এ পথে আসা সহজ, কিন্তু বেরনো ততটাই কঠিন। তা ছাড়া বেরিয়ে ও যাবেটাই বা কোথায়? শাহিন এর চিকিৎসার খরচ যোগাবার আর যে অন্য কোনো পথ নেই ওর। আজ ও বুঝতে পারছে যে ভালোবেসে যে শুধু মেয়েরাই অগ্নিপরীক্ষা দিতে পারে এমন নয়, ভালোবাসায় সবাই সমান। সত্যিকারের ভালোবাসা পুরুষদেরও সম্মুখীন করে কঠিন থেকে কঠিনতম অগ্নিপরীক্ষার। রুপেশ জানে না ও জিতবে কিনা, জানে না ভবিষ্যৎ আর কি কি অন্ধকার দেখাবে ওকে, ও শুধু জানে ওকে যেভাবেই হোক বাঁচাতে হবে নিজের ভালোবাসার মানুষটাকে।

www.banglabookspdf.com

—'স্যারজি আ গেয়া আপ কা লোকেশান।' ক্যাব চালকের স্বরে হুঁশ ফিরল রুপেশের। ভাড়া মিটিয়ে নামল রুপেশ। একটা গেস্ট হাউস। হ্যাঁ এখানেই তো আসার কথা ছিল ওর। শহরের সীমানার বাইরের এই গেস্ট হাউসেই তো থাকার কথা ওর ক্লায়েন্টের। ভাড়া মিটিয়ে নামল রুপেশ। এগিয়ে গেল ধীর পায়ে ৩১৩ নম্বর ঘরের দিকে।

বেল টিপতেই দরজা খুলল বেঢপ মোটা, প্রায় টেকো এক মহিলা। বয়স রুপেশের মামির মতোই হবে। তবে বেশ ধনী দেখেই বোঝা যাচ্ছে। রুপেশের সারা শরীরটা যেন চোখ দিয়ে জরিপ করে নিল সে। তারপর দু-দিকে গাল ছড়িয়ে হাসল বিশ্রী ভাবে। ভাঙা ভাঙা কালচে ছাপ পরা দাঁত বেরোতেই আরও কুশ্রী দেখাল তাকে।

—'হ্যালো ম্যাম। আই আম স্যানডি, নাউ অ্যাট ইয়োর সার্ভিস।' সদ্য শেখা পেশাদারী চালে কথাগুলো বলল রুপেশ। বুকের ভিতর অসম্ভব তোলপাড় চলছে ওর।

মহিলা অল্প একটু মাথা দোলাল। তারপর ক্ষিপ্র শকুনের গতিতে এগিয়ে এসে নিজের মোটা আর খসখসে ঠোঁট দুটো ঘষে দিতে লাগল রুপেশের ঠোঁটে। উগ্র পান মশলা আর মদের গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল রুপেশের। ইচ্ছে করল এক ধাক্কায় ওই মহিলাকে ধরাশায়ী করে ছিটকে সরে যেতে। কিন্তু না, অদৃশ্য শেকলে যে বাঁধা রয়েছে ও। ওর যে অগ্নিপরীক্ষা। ভালোবাসার পরীক্ষা। রুপেশ নিজেকে মেলে ধরতে চেষ্টা করল আস্তে আস্তে। ও বুঝতে পারল ও মহিলা ক্রমে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে বিছানার দিকে। রুপেশ দু-চোখ বন্ধ করল। ও বুঝতে পারল ও আস্তে আস্তে পরিণত হচ্ছে একটা রক্ত মাংসের পুরুষ শরীর রূপী যন্ত্রে। হঠাৎ যেন ও দেখতে পেল এই মুহূর্তে ওর থেকে বহুদূরে থাকা ওর শাহিনকে, ওর ছোট্ট সংসারটাকে। শাহিন যেন হাত মেলে ডাকছে ওকে আর রুপেশ যেন চিৎকার করে বলছে— 'তুই ভালো হয়ে যাবি রে বউ। একদম ভালো হয়ে যাবি। আবার তারপর সব আগের মতো হয়ে যাবে।' হ্যাঁ রুপেশ আবার একদিন ঠিক ফিরবে ওর শাহিনের কাছে। কারণ রুপেশ যে শুধু শাহিনের। আবার সেদিন রাতের বেলায় শাহিনের মাথা নিজের বুকে চেপে বলবে রুপেশ— 'তুই যে আমার সব রে পাগলি। তুই যে আমার জগত।' শুধু সেই দিনটার জন্যই যে এত কিছু আজ। না রুপেশ হারবে না, ওর ভালোবাসাকে ঠিক জিতিয়ে দেবে ও। সব আবার আগের মতো ঠিক করে দেবে ও। আবার শুধু বাঁচবে রুপেশ শাহিন আর ওদের ছোট্ট পৃথিবী ভর্তি এক সমুদ্র ভালোবাসা।

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

লৌকিকের মাঝে

১

—'মাম, মাম আমি মরে যাব। ও আমায় মেরে ফেলবে। তুমি অফিস যেও না।' অফিস যাবার মুখেই আমাকে আঁকড়ে ধরল মিলু মানে আমার আট বছরের মেয়ে।

আমার বুকের ভিতরটা আবার ধক করে উঠল। কী হচ্ছেটা কী ওর? সত্যি কি তবে আমার মেয়েটা মানসিকভাবে আরও অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে?

মনের সব উদ্বেগকে চেপে ধরে মিলুকে কাছে টানলাম। ওর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললাম —

—'এসব কী বলছিস মা? কে মারবে তোকে?'

—'বিন্নি মাজী আমায় মেরে ফেলবে। ও শানুকেও মেরে ফেলেছে। আমি নিজে দেখেছি মাম।' দেখছি ভয়ে শুকিয়ে গেছে মিলুর মুখ।

আমি একবার তাকালাম বিন্নির দিকে। বেচারি মুখ চুন করে দেওয়ালে সেঁটে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ওর দিকে তাকাতেই কাঁদ কাঁদ গলায় বলে উঠল—

—'বউদিদি আমি চলে যাই গো। আমার আর এখানে কাজ করা হবে না। মিলু আমায় কেন যে রাক্ষসী ঠাউরেছে আমি তো তার কিছুই বুঝতে পারছি নে।'

আমি চোখের ইশারায় বিন্নিকে আশ্বস্ত হতে বললাম।

—'না রে মা। বিন্নি মাসি খুব ভালো। ও তো তোকে খুব ভালোবাসে। ও তো তোর সাথে অনেক খেলা করবে। তোকে ভালোবাসবে।' নানা কথায় ভোলাবার চেষ্টা করতে শুরু করলাম আমি আমার মেয়েটাকে। কিন্তু মিলু যেন কিছুই মানতে নারাজ। শুধু কেঁদেই চলেছে হাপুস নয়নে।

ঘড়ির দিকে এবার তাকালাম ঝট করে একবার। সময় দৌড়চ্ছে নিজের গতিতে। এবার বেরোতে না পারলে অফিসে আবার আজ লেট হয়ে যাবে।

—'বিন্নি ওকে বোঝা একটু। আমি বেরোলাম।' মেয়েটার কান্না কতকটা উপেক্ষা করেই বেরিয়ে পড়লাম আমি।

ভাড়া করা ক্যাবে বসে যাত্রা করলাম অফিস অভিমুখে। মনের ভিতরটা বড্ড হুহু করছে। মিলু আরও কাঁদছে কিনা কে জানে! মিলু আমার এমনিতে খুব বুঝদার আর শান্ত মেয়ে। কিন্তু ইদানীং কেন যে এমন একটা অদ্ভুত ভয় ওকে পেয়ে বসেছে সত্যি আমি তার কিছুই বুঝতে পারছি না। শানুর অস্বাভাবিক মৃত্যুই কি এর জন্য দায়ী? নাকি আমাদের মুর্শিদাবাদ ট্যুর এর মূল কারণ? ওই গল্পটাই কি খুব বেশি প্রভাব ফেলল ওর শিশু মনে?

www.banglabookspdf.com

আসলে মিলুর মতো বাচচারা যাদের সারাদিনটাই প্রায় একা একা কাটাতে হয় ওদের মনের মধ্যে হয়তো নানা রকম শেড তৈরি হয়ে যায় আর যার প্রতিফলন ঘটে এভাবে।

আমি সারাদিন অফিসে ব্যস্ত থাকি, মিলুর বাবা মানে আমার স্বামী আছেন কর্মসূত্রে দিল্লিতে। আর আমার বাবা মা শ্বশুর শাশুড়ি এরাও সবাই কলকাতার বাইরে। নিজেদের আদি বাড়িতে। তাই মিলুকে সারাদিনই থাকতে হয় কাজের লোকের কাছে। হয়তো একাকীত্বই কোনোভাবে ওকে মানসিক রোগী বানিয়ে তুলছে। নাঃ। আমি আর ব্যাপারটা অবহেলা করব না। আমি দেখা করব আজই আমার ছোটোবেলার বন্ধু কেয়ার সাথে যে এখন শহরের নাম করা শিশু মনোরোগ বিশেষজ্ঞ।

২

—'এই যে সমাধিটা দেখছেন এটা হল কলিজা খাকি বেগমের সমাধি। কলিজা খাকি বেগম মানে কে জানেন তো ভাবিজী? বেগম হলেন মুর্শিদাবাদের পহেলা নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ এর মেয়ে আজমউন্নিসা।'

—'কিন্তু একে কলিজা খাকি বেগম কেন বলছেন?' গাইড কে একরাশ কৌতূহল নিয়ে প্রশ্ন করল আমার ননদ রিনা।

—সে তো অনেক বড়ো কাহানি বহেনজি। আমি তাও বলছি একটু। সে অনেক দিন আগের কথা। মুর্শিদকুলি খাঁ এর বেটি আজমউন্নিসার তখন সবে সাদি হয়েছে সুজাউদ্দালার সাথে। তো সেই সময় বেগম সাহেবাকে ধরল এক আজিব ব্যামো। দিল কা বিমারি যেটাকে কিনা এখন আমরা বলি হার্টের অসুখ।

অনেক জায়গা থেকে অনেক কবিরাজ, হেকিম সবাই এলেন। কিন্তু কেউ সারাতে পারলেন না বেগম সাহেবার সেই আজিব বিমারি। সবার তো খুব পরেশানি হয়ে গেল। সেই সময় এলেন কোথা থেকে এক বুড়ো হেকিম সাহেব। তিনি বাতলালেন উপায়। বেগম সাহেবাকে এমন এক দাওয়া খেতে হবে যেটা কিনা তৈরি হবে ইনসান এর বাচচার কলিজা থেকে।'

—'মানে? সে কি সাংঘাতিক কথা? দেখলাম শিউরে উঠেছে রিনা।

—'আরে বহেন এখনি এত তাজ্জব হবেন না। তাজ্জব হবার তো আরও বাকি আছে। তো বেগম সাহেবার জন্য ব্যবস্থা করা হল সেই অদ্ভুত দাওয়াই। আর সেই দাওয়াই আসর করল। ফল দেখাল। বেগম সাহেবা সুস্থ হয়ে গেলেন। কিন্তু ওনার নেশা লেগে গেল। কলিজার স্বাদ ওনার এমন জবরদস্ত লেগে গেল যে উনি সেই নেশা আর ছাড়তে পারলেন না। উনি হুকুম দিলেন ওনার রোজ নাস্তা করার জন্য চাই একটা করে মানুষের বাচচার কলিজা। আর বেগম সাহেবার হুকুম না মানে কার এত হিম্মত! ব্যস! চলতে লাগল বেরেহেমি কা মওত। রোজ দিন মরতে লাগল বাচচা। আর তাদের কলিজা পেয়ে খুশি হতে থাকলেন বেগম সাহেবা। সেই জন্যেই তো ওনার আর এক নাম কলিজা খাকি বেগম।

কিন্তু এই রাজ বেশিদিন চাপা থাকল না। জানাজানি হয়ে গেল। আর সবটা জানার পর মুর্শিদকুলি খাঁ জিন্দা জ্বালিয়ে দিলেন নিজের বেটিকে। এই জায়গাতেই জিন্দা জ্বালান হয় উনাকে। তবে কেউ

www.banglabookspdf.com

কেউ বলেন যে ওনাকে জিন্দা জ্বালিয়ে ছিলেন উনার পতি সুজাউদ্দলা। তাই এখানেই তৈরি হয় ওনার সমাধি১৭৩৪ সালে।

—'কিন্তু আমি একটা রিসার্চ পেপারে পড়েছিলাম যে আজমউন্নিসাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ব্যাপারটা নাকি আদপেও সত্যি নয়। এটা নাকি পুরোপুরি মিথ। আসলে নাকি সত্যিটা জানাজানি হবার পর আজমউন্নিসাকে উড়িষ্যায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরে মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর পর আবার এই মুর্শিদাবাদেই ফিরে আসে আজমউন্নিসা। কালের প্রভাবে এক সময় মারা যায় সে। আর তারপরই তাকে সমাধিস্থ করা হয় এখানে।'

গাইডের গল্প উপেক্ষা করেই সেদিন বলেছিলাম আমি।

—'না ভাবিজী ইতনা ভি আসান কুছ নেহি থা। বেগম কা বেরহমি কা উয়ও মওত আর উনকা চিখ আজও এই মুলুকের আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়ায়। অমাবস কি রাত মে এখনও শুনাই দেয় চিখ। অনেক ঘর থেকে আজও গায়েব হয়ে যায় বাচচা। সবাই বলে বেগম! বেগমের কলিজার নেশা আজও মরেনি। তাই তো আজও সে ফিরে ফিরে আসে নিজের পিয়াস বুঝাতে।'

গাইডের হিসহিসে গলার স্বর, পড়ন্ত বিকালের ফ্যাকাসে আলো আর প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য বহনকারী মুর্শিদাবাদের বাতাস সব মিলিয়ে কেমন যেন গা ছমছম করে উঠেছিল আমার সেদিন। আর তখনই লক্ষ্য করেছিলাম এই গল্প শুনতে শুনতে ভয়ে আর আতঙ্কে কেমন পাংশুবর্ণ হয়ে গেছে মিলুর মুখটা। হঠাৎ দৌড়ে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে বলেছিল—

—'মাম আমার খুব ভয় করছে। প্লিজ এক্ষুনি বাড়ি চল।'

এতটা বলে আমি থামলাম। তাকালাম কেয়ার দিকে।

—'হুম।' একটা গম্ভীর শব্দ করল কেয়া। আমার দিকে তাকিয়ে বলল—

—'তুই ঠিক কি বলতে চাইছিস?'

—'আমার মনে হয় এই গল্পটা শুনে মিলু সেদিন খুব ভয় পেয়েছিল। আর তাই এই গল্পটা কোনোভাবে ওর শিশুমনে গেঁথে গিয়ে খুব প্রভাব ফেলেছে। যার বহিঃপ্রকাশেই...'

—'বিন্নি আর শানু... এবার এই দুটো ফ্যাক্টর এর ডিটেল দে আমায়।' আমার কথা মাঝপথে থামিয়েই বলল আবার কেয়া।

—'দ্যাখ তুই তো জানিসই আমি মিলুকে নিয়ে কলকাতায় একাই থাকি। আমার সারাদিন কেটে যায় অফিসে। আর তাই মিলুকে আমায় রেখে যেতে হয় কাজের লোকের ভরসাতেই। মিলুকে দেখাশুনা করত নোলক মাসি নামে এক মহিলা। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য হঠাৎ করে নোলক মাসি কাজ ছেড়ে দেওয়ায় আমি বেশ মুশকিলে পড়েছিলাম। তাই জন্য সেই বার আমাদের মুর্শিদাবাদ ট্যুরের সময় আমি কথা প্রসঙ্গেই আমাদের গেস্ট হাউজের কেয়ার টেকারকে বলেছিলাম যদি কোনো ভালো বিশ্বাসী কাজের মেয়ে তার সন্ধানে থাকে, যে কিনা কলকাতায় থেকে কাজ করতে চায় তাহলে সে যেন আমায় জানায়।

www.banglabookspdf.com

তাই আমাদের কলকাতা ফেরার দিন সকালেই সেই কেয়ার টেকার নিয়ে আসে বিন্নিকে। বিন্নি ওখানকার লোকাল মেয়ে। খুব গরিব। তিনকুলে কেউ নেই। তাই সে চায় কলকাতায় একটা ভালো কাজ আর খাওয়া পরার আশ্রয়। সেদিন বিন্নিকে দেখে আর ওর সাথে কথা বলে আমার বেশ ভালোই লেগেছিল। তাই আমি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে আসি কলকাতায়।

বিন্নি বেশ চটপটে আর কাজেরও। ব্যবহারটাও চমৎকার। আমার ওকে ভালোই লেগে যায় প্রথম দিন থেকেই। কিন্তু আমি লক্ষ্য করছিলাম মিলু কেমন যেন আড়ষ্ট থাকে বিন্নির কাছে। সর্বদা এড়িয়ে চলতে চায় ওকে। অথচ বিন্নি মিলুকে বেশ ভালোবাসে। কিন্তু তবুও ওর এমন ব্যবহারের কারণ আমি বুঝতে পারছিলাম না। তাই একদিন বিন্নির আড়ালে আমি মিলুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন মিলু এড়িয়ে চলতে চায় ওকে? তখন মিলুর উত্তর শুনে আমি শিউরে উঠেছিলাম আর সেদিনই প্রথম বুঝতে পেরেছিলাম বোধ হয় মিলুর মানসিক কিছু সমস্যা হচ্ছে।'

—'কী বলেছিল মিলু?' প্রশ্ন করল কেয়া।

—'মিলু বলেছিল বিন্নির গা থেকে নাকি ও মানুষের রক্তের গন্ধ পায়। ওর মনে হয় বিন্নি নাকি মানুষের রক্ত খেকো একটা পিশাচ।'

সেদিন ওর এ হেন উত্তর শুনে ওকে এক দফা ধমকে দিয়েছিলাম। কিন্তু তখন কি আর জানতাম যে আরও বড়োসড়ো কিছু ঘটতে চলেছে! একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল আমার।

—'কী হয়েছিল?'

—'আমাদের এপার্টমেন্টের বেশির ভাগ বাচচাগুলোই ওয়ার্কিং প্যারেন্ট এর চাইল্ড। এরা প্রায় সবাই কাজের লোকদের কাছেই থাকে। প্রতিদিন বিকালের দিকে এরা সবাই ছাদে যায় খেলা করতে। সেদিনও খেলছিল ওরা। জানি না ঠিক কীভাবে ফ্ল্যাটের ছাদ থেকে সেদিন পড়ে যায় শানু। পা পিছলে হয়তো। ঠিক বলতে পারব না। শানু আমাদের এপার্টমেন্টেরই একটা বাচচা। শানুর এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে সবাই আমরা খুব ভেঙে পড়েছিলাম। থানা পুলিশও হয়েছিল। কিন্তু পোস্টমর্টেম রিপোর্টে আসে যে এটা দুর্ঘটনাই।

শানুর মৃত্যুর পর থেকেই মিলু খুব অস্বাভাবিক ব্যবহার করতে শুরু করে। সব সময় ভয় পেতে থাকে। আর বারবার বলতে থাকে একটাই কথা। ও নাকি দেখেছে শানুকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে বিন্নি। আর ওকে ঠেলে ফেলার সময় নাকি বিন্নি বলছিল চাই চাই... আমার তোর কলজেটা চাই।

প্রথমবার এসব শুনে আমি খুব বকি মিলুকে। কিন্তু দিনদিন পরিস্থিতি খুব জটিল হয়ে যাচ্ছে রে কেয়া। মিলু বেশি করে আরও অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে। ভয়টা আরও বেশি যেন পেয়ে বসছে ওকে। আমার মনে হয় মুর্শিদাবাদে শোনা ওই কলজে খাকি বেগমের গল্প, শানুর মৃত্যু আর নতুন বিন্নির এখানে আসা সব মিলিয়ে মিলু...'

আমার লম্বা ভাষণের শেষে একরাশ আশা নিয়ে তাকালাম কেয়ার দিকে।

—'আজকাল চাইল্ড সাইকোলজি অনেক বেশি জটিল হয়ে যাচ্ছে রে। আজকাল বাচচারা অনেক লোনলি হয়ে যাচ্ছে। ভার্চুয়াল জগতেই বেশি আটকে পড়ছে ওরা। বাবা মা আত্মীয় স্বজনদেরও কাছে

www.banglabookspdf.com

থেকে সেভাবে পায় না ওরা। যাই হোক, তুই একদিন ওকে নিয়ে আয় আমার কাছে। আমি কথা বলব।'

—'আচ্ছা পরের সপ্তাহে নিয়ে আসব।' চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম আমি। দেখলাম কেয়ার ভুরুতে একটা গম্ভীর ভাঁজ। কেন ঠিক বুঝতে পারলাম না।

আমি বেরিয়ে যাবার মুহূর্তেই পিছু ডাকল কেয়া।

—'ভালো কথা, ওই বিন্নি বলে মেয়েটার পরিচয় পত্র মানে আধার বা ভোটার কার্ডের কপি কাছে রেখে দিয়েছিস তো?'

চমকে উঠলাম প্রশ্নটায়। না এটা তো হয়নি। মাথায়ই আসেনি, যদিও আসা উচিত ছিল।

—'না রে মানে সেটা হয়নি। আসলে এত হুড়োমুড়ি করে ওকে নিয়ে এলাম। তখন একটা লোকই বেশি দরকার ছিল। তাই আর খেয়াল হয়নি।' বললাম আমতা আমতা করে।

—'উঁহু। এটা ঠিক করিসনি। অচেনা একটা মেয়ে। তাকে এভাবে কি কেউ বাড়িতে রাখে নাকি?'

কেয়ার গলাটা ভীষণ রকম গম্ভীর শোনাল।

কেঁপে উঠল আমার বুকটা। কেন বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ মনে হল বিন্নি সত্যি ভালো মেয়ে তো? সত্যি ওর মধ্যে কোনো গণ্ডগোল নেই তো? আজকাল তো কত কী হয়!

ধুর! এসব কি ভাবছি আমি! বিন্নি যে কতটা নিরীহ আর গোবেচারা আমি তো নিজেই জানি। নিজের মনকেই নিজে শাসন করলাম আমি।

৩

ক-দিন ধরেই আমরা মনটা খুব বেশি অশান্ত। জানি না কেন। গত পরশু কেয়ার সাথে কথা বলে আসার পর থেকেই বেড়েছে মনের এই উচাটনটা। যদিও এর কোনো যুক্তিপূর্ণ কারণ নেই। কিন্তু তবুও...

আজ মিলুকে নিয়ে যাবার কথা কেয়ার কাছে। তাই একটু আগে আগেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েছি। জানি না কেন একটা অজানা আশঙ্কায় সকাল থেকেই বারবার বুকটা কেঁপে কেঁপে উঠছে আজ। কেন কে জানে শুধু মনে হচ্ছে আজ যেন খুব খারাপ কিছু একটা ঘটবে। ঘটবেই।

সুরমা এপার্টমেন্ট মানে নিজের বাসস্থলের কাছাকাছি আসতেই ধক করে উঠল বুকের ভিতরটা। একী! এপার্টমেন্টের সামনে এত লোকের ভিড় কেন? সবাই এত উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত পা নেড়ে কী বলছে?

আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন ফিসফিস করে উঠল বিপদের বার্তা নিয়ে। পড়িমরি করে দৌড়ে গেলাম আমি ভিড়ের কাছে।

—'কী হয়েছে? কী হয়েছে এখানে?' পাগলের মতো করছি আমি। আমার স্নায়ু আর আমার বশে নেই।

—'মা তোর যে সর্বনাশ হয়ে গেল রে। ছাদের ভাঙা পাঁচিল গড়িয়ে শানুর মতো তোর মিলুও...' আর্তনাদ করে উঠলেন আমার এক পরিচিত মুখ।

www.banglabookspdf.com

এবার আমার চোখ দেখল সেই মারাত্মক দৃশ্যটা। আমার মিলু... আমার মিলুর থ্যাঁতলানো দেহটা পড়ে রয়েছে নীচে।

আমার পা এর নীচের মাটি কাঁপছে বুঝতে পারলাম। বুঝতে পারলাম আমার গলার কাছটা শুকিয়ে খটখটে হয়ে গিয়েছে।

—'বিন্নি কোথায়?' নিজের বশের বাইরে গিয়েই যেন ঠোঁট ঠেলে বেরিয়ে এল কথাগুলো।

কেউ হয়তো শুনতে পেল না। কিংবা কেউ হয়তো উত্তর দিল আমি শুনলাম না।

পড়িমরি করে রুদ্ধশ্বাসে দৌড় লাগালাম আমি। নিমেষের মধ্যে আছড়ে পড়লাম নিজের ফ্ল্যাটের দরজায়।

দরজা খোলা। খাঁ খাঁ করছে খালি ফ্ল্যাটটা। বাইরে বিছিয়ে যাওয়া সন্ধ্যার অন্ধকার ছুঁয়ে দিচ্ছে ফ্ল্যাটের কোণাগুলো।

—'বিন্নি... বিন্নি... বিন্নি....' উন্মাদিনীর মতো চিৎকার করলাম আমি। না, কোনো উত্তর এল না।

—'বিন্নিইইই...' আবার মরণ চিৎকার দিলাম আমি।

এবার অন্ধকার ঠেলে সামনে এগিয়ে এল সে। পরনের শাড়িতে রক্তের ছিটে।

—'কেন? কেন? কেন করলি এটা বল?' তীব্র আস্ফালন আর আর্তনাদ মিশে কেমন যেন একটা স্বর বেরোল আমার গলা চিরে।

ততক্ষণে অনেকেই চলে এসেছেন আমার পিছনে।

—'মা বিন্নি তো পাগলের মতো করছে এটা হবার পর থেকেই। আসলে ও একটু বোধ হয় অন্যদিকে গেছিল তখনই...'

না কারো কথা শুনতে পাচ্ছি না আমি। না আমি শুনব না।

বিন্নি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমি এগিয়ে গেলাম ওর দিকে। পাগলের মতো ঝাঁকাতে শুরু করলাম আমি বিন্নিকে। পাগলের মতো চড় মারছি ওকে।

—'দে। ফিরিয়ে দে আমার মিলুকে।'

হঠাৎ শরীরে একটা অন্যরকম কিছু টের পেলাম। বিন্নি চেপে ধরেছে আমার হাত। উফফ! কী ভয়ানক সেই স্পর্শ। যেন অপার্থিব কোনো দানবীয় শক্তি ছুঁয়ে যাচ্ছে আমায়।

—'বিন্নি... ছাড়...' বলতে গিয়েও বলতে পারলাম না।

ওর দু-চোখের মণির রং বদলে গেচে। কালো মণির জায়গায় দুটো আগুনের গোলা।

—'আমি কলজে চাই। মিলুর কলজে খাব আমি। আমার যে বহু দিনের নেশা।' হিসহিস করে বলল বিন্নি। না আমি ছাড়া আর কেউ শুনতে পেল না ওর সেই ফিসফিসে রাক্ষুসে স্বর।

চকিতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম আমি। তার মানে ওই মেরেছে আমার মেয়েটাকে। একদম ঠিক বলত মিলু। শুধু আমি বুঝতে পারিনি। আমার ভুলের জন্যই আমার মেয়েটা...

মুহূর্তের মাঝে ঘটে গেল কাণ্ডটা। আমি দুরন্তগতিতে টেবিল থেকে উঠিয়ে নিলাম সদ্য কিনে আনা চকচকে ফল কাটার ছুরিটা আর নিজের শরীরের সব শক্তি সহযোগে ঢুকিয়ে দিলাম সেটা বিন্নির

www.banglabookspdf.com

পেটের ভিতর।

—'আআ'... তীব্র আর্তনাদ করে বিন্নি লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে।

—'একী করলে তুমি? একী? একী?' অনেকগুলো গলার স্বর। আর সেই স্বরগুলো ছাপিয়েও শুনতে পেলাম পুলিশের গাড়ির সাইরেন।

৪

আমার বিচার চলছে। আমি তো খুন করেছি তাই। আমার মেয়ে মিলু নাকি অসাবধানতাবশে ছাদ থেকে পড়ে মারা গেছে। অন্তত ডাক্তারি রিপোর্ট তাই বলছে।

আর আমি নাকি হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে বাড়ির গরিব কাজের মেয়েকে সবার সামনে খুন করেছি।

মিলুর কলজে খাওয়ার কথাটা, যেটা বিন্নি বলেছিল সেটা নাকি আমি ছাড়া কেউ শোনেনি। সবাই বলছে আমি মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছি। তাই হয় কে নয় আর নয়কে হয় করছি।

এমনকী কেয়াও নাকি তাই বলেছে। সেও বলেছে মিলুর পাওয়া শেষ কয়দিনের ভয় আর মিলুর মৃত্যু সব মিলিয়ে নাকি আমি পাগল হয়ে গেছি।

আমার মানসিক চিকিৎসাও চলছে। জানি না আমার কি হবে? হয়তো ফাঁসি হবে। কিংবা হয়তো জেল। কিংবা হয়তো উন্মাদাশ্রমে জায়গা হবে আমার।

কিন্তু না। আমি পাগল নই। বিশ্বাস করুন আমি পাগল নই। কলজে খাকি বেগমের গল্প শেষ হয়নি। সত্যি আজও বেঁচে আছে তার শতাব্দী প্রাচীন কলজের নেশা। সেই এসেছিল বিন্নির রূপ ধরে আমার স্থির বিশ্বাস।

কিন্তু না আমি জানি কেউ মানবে না একথা। সবাই আমায় পাগল প্রমান করেই ছাড়বে। এটাই তো আমরা। কেউ অলৌকিককে মানি না, শুধু বড়ো বড়ো বুলি কপচাই বিজ্ঞানের ধজ্জা তুলে। আমিও তো সেদিন মানিনি মিলুর কথা। মানলে তো আজ আমার মেয়েটাও থাকত বেঁচে। তাই মাঝে মাঝে মানতে হয়। মাঝে মাঝে বুঝতে হয়। বিশ্বাস করতেই হয় লৌকিকের মাঝেই লুকিয়ে থাকে অলৌকিক।

—

www.banglabookspdf.com

আজ বৈশাখী আসুক...

১

—'হ্যাঁ এই তো, সাবধানে... সাবধানে... আমার হাতটা ধরুন... হ্যাঁ এই তো... একদম পারফেক্ট'...।

হুইল চেয়ার থেকে খুব সাবধানে ৩০২ নম্বর কেবিনের রোগীকে বিছানায় শুইয়ে দিল শম্পা।

'থ্যাঙ্কস'... খুব ছোটো করে বলল লোকটা। বিছানায় নিজেকে ঠিক মতো সেট করে নিয়েই আবার শম্পার দিকে ছুঁড়ে দিল সেই দৃষ্টিটা।

চকিতে সতর্ক হয়ে গেল শম্পা। নিজেকে বাঁচিয়ে একটু কোণার দিকে সরে গেল। সন্তর্পণে নিজেকে ব্যস্ত করে দিল ফলের রস ঢালার কাজে। নয় নয় করে শহরের এই নামজাদা বেসরকারি নার্সিং হোমে নার্সের কাজের তো কম দিন হল না, তাই পরিস্থিতি আঁচ করতে এখন শিখে গেছে ও। এই ধরনের সেলিব্রিটি রোগীও কম দেখা হল না, কিন্তু কোনো কেসেই এত অস্বস্তিতে পড়তে হয়নি শম্পাকে। এখন মনে হচ্ছে কেন যে ও নাচতে গেল মেয়েটার কথায়! তার আর কি? যত হ্যাপা তো শম্পার।

এই লোকটা অবশ্য ঠিক সেই অর্থে সেলিব্রিটি নয়। সিনেমা বা সিরিয়ালের নায়ক, গায়ক বা মন্ত্রী নয়। এ হচ্ছে নামজাদা সাংবাদিক। 'এগিয়ে খবর' চ্যানেলের স্টার সাংবাদিক। বাংলার এক নম্বর নিউজ চ্যানেলের এই পপুলার মুখটাকে এখন কে না চেনে! ফলের রস ঢালা যখন প্রায় শেষের দিকে, ঠিক তখনই প্রশ্নটা এল আবার— 'সিস্টার, আমি কিন্তু এখনও আমার জবাবটা পেলাম না। আর আপনি জানেন জবাবটা না নিয়ে আমি ছাড়ব না।' সামান্য কেঁপে উঠল শম্পা। এই লোকটার অনেক ক্ষমতা। যদি একবার কোনো স্টেপ নেয়, বা কোনো কমপ্লেন করে নার্সিং হোম-এর কমিটিতে কেউ আর বাঁচাতে পারবে না শম্পাকে।

—'আমি তো আপনাকে যা বলার বলেছি স্যার।' কাঁপা গলায় উত্তর দিল শম্পা।

—'হ্যাঁ কিন্তু সেটা আমি বিশ্বাস করছি না। আমি সেদিন আপনাকে নিজের কানে একজনকে অন্য কথা বলতে শুনেছি। আপনি কাউকে বলছিলেন যে আপনি সেদিন বাড়ি থেকে খাবারই আনেননি।'

প্রমাদ গুনল শম্পা। কি বলবে বুঝতে পারল না। ভীষণ গম্ভীর আর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকটা। সত্যি খুব আলাদা। তবে শম্পার কাছে ও তো শুধু নামি সাংবাদিক বা রোগী নয়, ওর আরও একটা পরিচয় আছে। যেটা লোকটা নিজেও জানে না।

—'স্যার। আপনার কিন্তু খুব কুইক ইমপ্রুভ হচ্ছে। কাল থেকে আপনি নিজেই হুইল চেয়ার নিয়ে ঘুরবেন। আমি আর হেল্প করব না। আমি আপনার সাথে থাকব, কিন্তু আপনি নিজেরটা নিজেই করবেন।' প্রসঙ্গ পাল্টে অন্য কথায় যেতে চাইল শম্পা।

www.banglabookspdf.com

—'আপনার হেল্প আজও লাগত না। কিন্তু প্রশ্নের উত্তরটা'... কথাটা শেষ হল না। কেবিনের দরজায় মৃদু টোকার শব্দ। কেউ বাইরে থেকে ডাকছে শম্পাকে।

—'এক্সকিউজ মি স্যার, আমি দু-মিনিটে আসছি। এই দরজার জাস্ট বাইরেই আছি আমি।' কেবিনের দরজা ঠেলে বাইরে বেরোল নার্স। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই খোলা দরজাটা দিয়ে একমুঠো জুঁই ফুলের গন্ধ মাখা বাতাস এসে আছড়ে পড়ল ৩০২ নম্বর কেবিনে। চমকে উঠল বিছানায় থাকা লোকটা। আবার... আবার সেই গন্ধ... তার মানে সে এখানেই আছে। খুব কাছাকাছি কোথাও। হয়তো একদম এই ঘরটার পাশেই রয়েছে সে।

—'না, একদম না। কোনোভাবেই এই ভাবনাকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না।' নিজের মনকেই কষে ধমক লাগাল 'এগিয়ে খবর' চ্যানেলের দুঁদে সাংবাদিক।

২

হিং টিং ছট, অং বং চং মন্ত্র এক নাগাড়ে পড়েই চলেছে পুরোহিতটা, যার বিন্দু বিসর্গও বুঝছে না শ্রুতি। শুধু শ্রুতি কেন, এখানে উপস্থিত বেশির ভাগ লোকই যে বুঝছে না, সে বিষয়ে সুমনা ১০০ ভাগ নিশ্চিত। তবুও হয়েই চলেছে একের পর এক মন্ত্র আচার অনুষ্ঠান। কারণ এগুলোই সমাজের নিয়ম। উফফ! আর কতদিন নিয়মের দোহাই দিয়ে সমাজ চালাবে এই স্বেচ্ছাচারিতা? আর কতদিনই বা শ্রুতির মতো মেয়েদের নিজের সব ইচ্ছা আর অনুভূতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে মেনে যেতে হবে এসব? একদম ভালো লাগছে না ওর। ইচ্ছে করছে এক্ষনি ছুটে কোথাও পালিয়ে যেতে। ভারী বেনারসি শাড়ি আর গয়নার ওজন যেন প্রতি মুহূর্তে ওকে জানান দিচ্ছে আজ থেকে শুরু হল ওর আপোষের জীবন। স্থির দৃষ্টিতে ও তাকিয়েছিল যজ্ঞের আগুনের দিকে। কেমন যেন জ্বলন্ত ক্যানভাসের মতো মনে হচ্ছে আগুনটাকে। টুকরো টুকরো ছবির কোলাজ যেন ভেসে উঠছে ওই আগুনটার ওপর দিয়ে শ্রুতির চোখের সামনে একের পর এক। হারিয়ে যাওয়া দিনের টুকরো কিছু স্মৃতি। নাঃ, কিছুতেই মনটাকে নিজের বশে করতে পারছে না মেয়েটা। চোখ সরিয়ে নিল ও আগুনের দিক থেকে। চোখটা কেমন জ্বালা করছে। এবার ও দৃষ্টি ঘোরাল পাশে। ছেলেটা বাধ্য মূর্তির মতো বসে রয়েছে বর আসনে। কিন্তু ওর চোখ দুটোও বলছে যে ওরও মন বড়ো চঞ্চল হয়ে রয়েছে। শ্রুতি জানে এই মুহূর্তে ওরও চোখের সামনে হাজার ফেলে আসা মুহূর্তের কোলাজ।

হঠাৎ ঘাড়ে একটা খুব চেনা হাতের ছোঁয়া, ঈষৎ কেঁপে উঠল শ্রুতি। ঘাড় ফেরাল এবার। হ্যাঁ ঠিক। মৌলীই ছিল।

—'আমি আজ চলি রে। সব ভালো ভালো মিটে যাক। পরশু দেখা হচ্ছে আবার।'

—'থেকে যা না রে প্লিজ আজকের রাতটা।' কেমন আর্তির মতো শোনালো শ্রুতির স্বরটা।

—'না রে তুই তো জানিস মা-কে একা রাখা যাবে না। আমি গেলে তবে আয়া মাসি বাড়ি যাবে।'

—'তাহলে বিয়েটা শেষ হলে যা।'

—'আমারও তো তাই ইচ্ছে করছে। কিন্তু এতটা পথ একা ফিরব তো...।' এবার একটু নীচু হল মৌলী। শ্রুতির কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল— 'কিছু ভাবিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে

www.banglabookspdf.com

দেখিস।'

চমকে উঠল শ্রুতি। মৌলীর গলার স্বরটা অবিকল সেই এক রকম লাগল, হুবহু সেই দিনের মতো।

আবার শ্রুতির চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা দৃশ্য। শহরের নামজাদা কলেজটার আকাশে উড়ছে হলুদ আবীরের ফোয়ারা। ইলেকশনে হলুদ দল জিতেছে। হই চই এর তাই আর শেষ নেই। আবার ক্ষমতায় হলুদ দল। অনেকগুলো ছেলে-মেয়ে বেষ্টিত হয়ে এগিয়ে আসছে লম্বা, হিরো মতো একটা ছেলে। সেই জি এস হচ্ছে এবার। এত দিন কাগজে কলমে জি এস না থাকলেও বেশ হোমরা চোমড়া তো ও ছিলই। ওর হাত জড়িয়ে রয়েছে একটা মেয়ে। ছেলেটাও শক্ত করে চেপে রেখেছে সেই মেয়েটার হাত। আর দূর থেকে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে এই দৃশ্যটা দেখছে আর একটা মেয়ে। খুব মলিন চেহারা মেয়েটার। এই ঠাট বাঁট-এর কলেজের আকাশে কেমন একটা বেমানান ঘুড়ির মতো। পরনে সস্তা সালোয়ার কামিজ, গায়ের রং যথেষ্ট চাপা, খুব সাধারণ মুখশ্রী আর চোখে কেমন যেন ভীতু ভীতু ভাব। ও বি সি কোটার রিজারভেশনের জোরে এই বড়ো কলেজটায় চান্স পেয়েছে খুব মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ মেয়েটা। উল্লাস করতে করতে মেয়েটাকে পাশ কাটিয়েই চলে এল আসন্ন জি এস আর তার দল বল। ভীতু চোখ দুটো হঠাৎই জলে ভরে উঠল। ঠিক তখনই মৌলী এসে হাত রাখল মেয়েটার কাঁধে। এই স্পর্শ টুকুরই যেন অপেক্ষায় ছিল সে। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল এবার।

—'পাগলি কাঁদছিস কেন? যাকে ভালোবাসিস তার সফলতায় কেউ কাঁদে?'

—'আমি খুব খারাপ রে মৌলী।' মৌলীকে জড়িয়ে ধরে আরও জোরে জোরে কেঁদে উঠল মেয়েটা।

—'আমি জানি ওর সফলতায় আমার খুশি হওয়া উচিত। কিন্তু আমি যে পারছি না। এত দিন ও শুধু ক্লাস রিপ্রেজেনটেটিভ আর কালচারাল সেক্রেটারি ছিল তাতেই তো ওকে কলেজ চত্বরে প্রায় পাওয়াই যেত না। ক্লাসেও আসত কম। আর এবার তো... এবার তো...। ওকে শুধু চোখের দেখাটুকু দেখা নিয়েই তো খুশি ছিলাম আমি। সেটাও বোধ হয় এবার হারাল রে মৌলী।' বাচচাদের মতো ডুকরে কেঁদে উঠল সরল মেয়েটা।

—'কিচ্ছু ভাবিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে দেখিস।' মেয়েটার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে বলল মৌলী। সূর্য অস্তে যাচ্ছে। আকাশ যেন লাল আবীরে মাখামাখি। সেই লাল আবীরের কুচি কুচি অংশ ছুঁয়ে যাচ্ছে দুই বন্ধুর পবিত্র ভালোবাসাকে। মৌলী মনে মনে বলল— 'হে ভগবান এই লাল আভার একটু অংশ এই মেয়েটাকেও দাও তুমি। মেয়েটা যে বড্ড ভালো। বড্ড সরল।

৩

ঝ্যাং ঝ্যাং করে গিটার বাজিয়ে গান গাইছে ছেলেটা কলেজ ক্যান্টিন চত্বরে। আর তাকে ঘিরে পাঁচ-ছটা ছেলে-মেয়ে বসে মন্ত্র মুগ্ধের মতো শুনছে সেই গান। গান শেষ হতেই হাততালিতে ফেটে পড়ল তারা যথারীতি। আর আবীর-এর ঠোঁটেও ফুটে উঠল রোজকার মতোই একটা বিজয়ী নায়কের হাসি। আবীর সুদর্শন, স্মার্ট, ভালো লেখে, ভালো গান করে, খুব সুন্দর কথা বলে, পড়াশুনাতেও

www.banglabookspdf.com

খারাপ না। আর সবচেয়ে বড়ো কথা ওর মধ্যে একটা অদ্ভুত যাদু আছে, যে কারণে স্কুল লাইফ থেকেই লোকজনের ভীষণ নজর কাড়ে ও। যে কোনো জায়গাতেই খুব কম দিনেই ও ভীষণ পপুলার হয়ে যায় আর যে কোনো ক্ষেত্রেই সফলতাও ও পেয়ে যায় তাড়াতাড়ি। অবশ্য এই কলেজেও যে এত তাড়াতাড়ি এত বেশি লোকের মন ও জয় করে ফেলবে সেটা ভাবেনি আবীর। এটা দেশের অন্যতম বিখ্যাত কলেজ, এখানে কেউই তেমন হেলা ফেলা নয় তাই আবীর ভেবেছিল এখানে হয়তো নিজের জাদু জমানো ওত সহজ নাও হতে পারে। কিন্তু না, যথারীতি বরাবরের মতোই এখানেও অনেকেই আবীর জাদুতে কুপোকাত। আজকাল তো আবীরের ফ্যানের সংখ্যা আরও বেড়ে গেছে। আর হবে নাই বা কেন আগামী ইলেকশনের পর আবীরই যে জি এস হচ্ছে সেটা তো প্রায় নিশ্চিত। গান শেষে অনেক হাততালি আর প্রশংসার মাঝে আবীর খুঁজছিল বিশেষ দুটো চোখ। হ্যাঁ সেই চোখ দুটোও ভীষণ আবেগ মাখা একটা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আবীরের দিকে। আবীর জানে ওই দৃষ্টির মানে। এত ভিড়ের মাঝে এক টুকরো আড়াল খুঁজে নিয়ে আবীরকে পাগলের মতো আদর করতে চাইছে তমিস্রার মন এখন। এই কলেজে সুন্দরীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রথম দিন থেকেই একাধিক মেয়ের প্রতি একটা হালকা ক্রাশ তৈরি হচ্ছিল আবীরের। হ্যাঁ, আবীর এমনটাই। সুন্দর, স্মার্ট মেয়েদের প্রতি ওর একটা ভালো লাগা তৈরি হয়ে যায় হুট হাট। এখানেও তার ব্যাতিক্রম হয়নি। তবে আবীরের প্রতিও এখানে ফিদা প্রচুর মেয়ে সেটা জানা আছে ওর। তবে তমিস্রার ব্যাপারটা একদম আলাদা। ওর মধ্যে আলাদা একটা ব্যাপার আছে। যেই কারণে ওকে একটু বেশিই ভালো লেগেছিল আবীরের। যাই হোক ফাইনালি ওদের সম্পর্কটা ভালো ভাবে দানা বেঁধেছে তাও মাস দুয়েক হল। সময়ের মেয়াদটা কম হলেও সম্পর্কের গভীরতাটা মোটেও কম না। তবে এটা ঠিক যে খুব ঘনিষ্ঠ দু-একজন বন্ধু ছাড়া এখনও কেউ জানে না ওদের সম্পর্কের কথা। তবে আবীরের মন বলছে তমিস্রার সাথে ওর সম্পর্কটা হয়তো টিকে যাবে বেশ কিছু দিন।

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

—'আবীর, আবীর... এই আবীর...' চারপাশের ভিড়টা ছাড়িয়ে হঠাৎ একটা ডাক পৌঁছাল ওর কানে। ডাকের উৎসটা খুঁজতে এদিক ওদিক তাকাল আবীর। আর ওমনি ঝাং করে মাথাটা গরম হয়ে গেল ওর। তপন এদিকেই আসছে বিচ্ছিরি চিৎকার করতে করতে। এই তপন ছেলেটাকে একদম সহ্য হয় না ওর। আনস্মার্ট, গাঁইয়া, ব্যক্তিত্বহীন ছেলে একটা। নেহাতই নিজের ডিপার্টমেন্টের ছেলে তাই... নইলে কে কথা বলত এরকম একটা ছেলের সাথে। আবীরদের ডিপার্টমেন্টে মেয়ে একটু বেশি, আর এই ছেলেটাও মেয়েদের সাথেই বেশি মিশে থাকে ওই জন্যই। মেয়েদের ফাই ফরমাশও খাটে বোধ হয় মাঝে মাঝে। ইশস! কী অদ্ভুত মানসিকতা। তপন দৌড়াতে দৌড়াতে চলে এল প্রায় আবীরের সামনাসামনি। হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প।

—'আবীর, একটা কথা ছিল। একবার একটু ওদিকে যাবি রে ভাই?'

বিরক্তিতে কুঁচকে গেল আবীরের মুখ। ও ভালোই জানে কী কথা বলতে চাইছে তপন। তাই বেশ গম্ভীর ভাবেই বলল— 'যা বলার এখানেই বল।'

—'এখানে বলা গেলে কি আর ডাকতাম রে তোকে ভাই? প্লিজ চল না।' উফফ ছেলেটা বড্ড নাছোড় তো। অগত্যা উঠল আবীর। নইলে বোধ হয় এখানে দাঁড়িয়ে ঘ্যান ঘ্যান করেই যাবে। একটু ফাঁকা একটা কোণা খুঁজে নিয়ে এগোল আবীর সেদিকে। আর পিছু পিছু তপনও।

—'কিছু কি ভাবলি রে ভাই?'

—'কী ভাবব বলতো? কী ব্যাপারে?' একটু খিঁচিয়েই জবাব দিল আবীর।

—'শ্রুতির ব্যাপারটা। বিশ্বাস কর মেয়েটা সত্যি খুব ভালো। খুব আবেগি আর সরল। আজকালকার মেয়েদের মতো একদম নয়। আর তোকে সত্যি বড্ড...'

—'ব্যস তপন।' ধমকে উঠল আবীর। 'বড্ড নির্লজ্জ যে মেয়েটা সেটা তো বুঝতেই পারছি। নইলে বার বার তোকে এভাবে পাঠায় নাকি উমেদারি করতে?'

—'না আবীর না। ও তো জানেই না এভাবে আমি তোকে বলছি। ও আমাকে পাঠায়নি। ও একতরফা একটা প্রেমের জ্বালায় বড্ড কষ্ট পাচ্ছে। আর বন্ধু হয়ে আমরা কি করে সেটা দেখি বল। শুধু তোকে একটি বার চোখের দেখা দেখার আশায় নিদারুন শরীর খারাপ নিয়েও কলেজ আসছে। ওর মতো মেয়ে হয় না রে।'

আবীরের বলতে ইচ্ছে করল তাহলে তুই ই ওকে ভালোবেসে বুকে জড়িয়ে নে না। ওর সাথে তো তোকেই মানায়। দুজনেই কোটার জোরে ঢুকে গেছিস এখানে। কিন্তু মুখে তো আর ঠিক বলা যায় না। হাজার হোক দুজনেই নিজের ডিপার্টমেন্টের ছেলে-মেয়ে বলে কথা।

—'দেখ, তুই বোধ হয় পাগল হয়ে গেছিস।' সুর একটু নরম করল আবীর। —'আর সেই জন্যই বুঝতে পারছিস না যে কতটা উদ্ভট একটা কথা বলছিস তুই।'

—'না শোন তুই...'

—'তুই শোন আমার কথা। ওকে বল আবীর মৈত্র কে নিয়ে ভেবে নিজের সময় আর এনার্জি নষ্ট না করে নিজের লেখা পড়া, ড্রেসিং সেন্স আর লুকটা নিয়ে ভাবতে। ওগুলো একটু ভালো করার

www.banglabookspdf.com

চেষ্টা করুক ও, তাহলে হয়তো ওর প্রেম করার সাধটা মিটলেও মিটতে পারে। আর হ্যাঁ, বড়ো কলেজে পড়ছিস তোরা, তাই কমন সেন্সটা বাড়া। বামন হয়ে চাঁদ ধরা যায় না সেটা বুঝতে গেলে কমন সেন্সই যথেষ্ট।' কথাগুলো খুব রুক্ষ স্বরে বলে গটগট করে এগিয়ে গেল আবীর, আর তপন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল বোকার মতো।

আর পুরো ঘটনাটাই থামের আড়াল থেকে দেখতে পেল সেই 'বামন'টা, যে কিনা চাঁদ ধরার স্বপ্ন দেখেছিল। দু-চোখ জলে ভরে উঠল তার। মেঘলা দুপুরের বিষণ্ণ বাতাসটা যেন নখ বের করে আঁচড়াচ্ছে তাকে। সত্যি তো! আবীর তো ঠিক বলেছে পুরোপুরি। কোথায় সে আর কোথায় আবীর। আকাশ আর পাতাল পার্থক্য। কিন্তু সব জেনে বুঝেও এই বেইমান হৃদয়টা কেন যে ওই আবীরের জন্যই...।

গুড়গুড় করে মেঘ ডাকছে। মেঘের ভ্রুকুটিটাও বেড়েছে আরও অনেকখানি। মনে হয় আজ খুব ঢালবে। কালবৈশাখীর দামাল বাতাস আর বৃষ্টির ফোঁটা এলোমেলো করে দেবে সবটুকু। কলেজের বাইরে বেরিয়ে এল মেয়েটা। ঝাপসা দুটো চোখ নিয়ে বৃষ্টির বড়ো বড়ো ফোঁটা গায়ে মাখতে মাখতে এগিয়ে চলেছে সে। বৃষ্টির জলে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে মেয়েটার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া মুক্তোর দানাগুলো।

৪

কলেজ স্ট্রিট প্যারামাউনটের সামনে দাঁড়িয়ে উশখুশ করছিল শ্রুতি। কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখল একবার। প্রায় পাঁচটা বাজতে চলল তবু রোদের ভ্রুকুটি যেন কমে না। আসলে জ্যৈষ্ঠ মাসের রোদ তো, তাই যেন গিয়েও যেতে চায় না। ঠিক শ্রুতির খারাপ ভাগ্যের মতো। উফফ! এখনও এল না ছেলেটা। একবার কি ফোন করে দেখবে? না থাক বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে এটা। কেন যে ও রাজি হল দেখা করতে আসার জন্য। অবশ্য না হয়ে আর কি বা উপায় ছিল। যে কোনো উপায়েই হোক ভাঙতে তো হবে বিয়েটা। হ্যাঁ, শ্রুতির বাবা মা যেমন পণ করেছে যে মেয়ের বিয়ে দিয়েই ছাড়বে, তেমনি ও পণ করেছে যে সব কটা বিয়ে ও ভেঙেই ছাড়বে। শ্রুতি বিয়ে করবে না নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে। ও একটা স্বনির্ভর মেয়ে। তাহলে কি প্রয়োজন আছে শুধু শুধু জীবনে জটিলতা বাড়ানোর। গ্র্যাজুয়েশনে এমন কিছু মার কাটারি রেজাল্ট হয়নি শ্রুতির। তাই প্রথাগত শিক্ষাকে বিদায় জানিয়ে শ্রুতি ভর্তি হয়েছিল নার্সিং ট্রেনিং-এর জন্য। ট্রেনিং শেষে শম্পাদি-র রেফারেন্সে জয়েনও করেছে জুনিয়র হিসেবে শম্পাদি-র নার্সিং হোমেই। শম্পাদি ওর মাসতুতো দিদি। কিন্তু দারুণ ভালোবাসে ওকে। অনেকদিন ধরেই শম্পাদি বেশ সুনামের সাথে চাকরি করছে শহরের নামি ওই বেসরকারি নার্সিং হোমটায়। তাই শ্রুতির চাকরিটা মোটামুটি সহজেই হয়ে গেছিল। পৃথিবীতে শম্পাদি একমাত্র মানুষ যে শ্রুতির অনুভূতিটাকে সম্মান করে। পাগলামি মনে করে না। হ্যাঁ আবীরের প্রতি শ্রুতির গভীর এক তরফা প্রেমটা আজও একই আছে, কিন্তু কেউ বোঝে না সেটা। সবাই ওকে পাগল ভাবে এসব বলতে গেলে। উল্টে ওকেই বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করে। আর শ্রুতির মতো মধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ মেয়েদের নিজের অনুভূতি নিয়ে বিলাসিতা করার অনুমোদন যে আজ ও নেই। সে

www.banglabookspdf.com

যতই সমাজ এগিয়ে যাক না কেন। আত্মীয় স্বজন পাড়া পড়শি পাগল করে দিচ্ছে বাবা মা কে ওর বিয়ের জন্য। বাবা মা-ও কোমর বেঁধে লেগে পড়েছে মেয়ের বিয়ের জন্য। অসুস্থ বয়স্ক মানুষ দুটোর শুধু একই কথা— 'পাগলামি করিস নে সুমি। কি ভাবিস তুই ওই ছেলে আসবে তোর জন্য! এ সব ভুলে সংসার কর, দেখবি সব ভুলে যাবি তুই। আমরা না থাকলে কি হবে তোর?' না কিছুতেই বোঝানো যায় না ওদের। তবে এটাও ঠিক শ্রুতি পাগল নয়। ও জানে চাঁদ বামনের ঘরে আসে না। কিন্তু তা বলে মনে একজনকে বসিয়ে রেখে অন্য কারোর ঘর করা, তার বাচচার মা হওয়া এ যে হয় না। সে শ্রুতিকে ভালো না বাসলেও তো শ্রুতির ভালোবাসাটা মিথ্যা হয়ে যায় না। সব প্রেম কে কি এক রকম হতেই হবে? সব প্রেমেই কি ভালোবাসাটা দু-তরফ হতেই হবে? সব প্রেমেই কি সারাজীবন দুটো মানুষকে পাশাপাশি থেকে সংসার করে নুন তেলের হিসাব করতেই হবে? প্রতিটা মানুষ যেমন আলাদা তেমনি সবার অনুভূতিও আলাদা। সবার ভালোবাসাকে ছুঁয়ে দেখার মনটাও আলাদা। হ্যাঁ কেউ বলতেই পারে শ্রুতির পাগলামি এসব। এমন প্রেম বাস্তব সমাজ আর জীবনে কোনো দাম নেই। না তাতে কিছু যায় আসে না শ্রুতির। ও না হয় একটু পাগলই হল। সবাই কি এক রকম হবে নাকি! দু-দুটো সম্বন্ধ এর আগে এসেছিল শ্রুতির জন্য। একজন ওকে পছন্দ করেনি, আর একজন ছেলেকে ব্যক্তিগত ভাবে কথা বলে ও স্পষ্ট জানিয়েছিল যে সে অন্য কাউকে ভালোবাসে। কিন্তু আপাতত সেই ভালোবাসার মানুষের সাথে বিয়েটা ওর সম্ভব নয় তাই নিজে থেকে বাড়িতে সম্বন্ধ নাকচ করতে পারবে না ও। তাই ছেলেটা নিজেই যেন ভেঙে দেয় বিয়েটা। কাজও হয়েছিল তাতেও কিন্তু এই দেবরূপ ছেলেটা বড়ো অদ্ভুত। শ্রুতি এর ক্ষেত্রেও একই ভাবে বলেছিল, কিন্তু সে শুনে বলেছিল— 'আপনার কথা আমি মানতে পারি তাহলে আপনাকেও আমার একটা কথা রাখতে হবে। পরশু বিকালে প্যারামাউন্টের সামনে দাঁড়াবেন। একবার কথা বলব। তারপর সব ডিসিশন হবে।' কিন্তু কোথায় সে? আসবে না নাকি? আসুক একবার। আজ আরও কড়া ডোজ দিতে হবে।

—'এক্সকিউজ মি. ম্যাডাম... একটু দেরি হয়ে গেল না?' অপরিচিত কণ্ঠস্বরে চমকে পিছনে তাকাল শ্রুতি। এসে গেছে ছেলেটা।

শ্রুতি অল্প হেসে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই ছেলেটা বলল— 'চলুন ভিতরে গিয়ে বসা যাক।'

সরবতের গ্লাস নিয়ে মুখোমুখি বসে আছে দুজনে। শ্রুতিই প্রথম কথা শুরু করল।

'দেখুন সেদিনই আপনাকে বলেছিলাম আমি একজনকে ভালোবাসি। আর হ্যাঁ এটা ঠিক যে এই মুহূর্তে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আর হবেও না। কিন্তু আমার ভালোবাসাটা বা অনুভূতিটা তো আর তাতে মিথ্যা হয়ে যায় না। আমার বাড়ির লোকরা এসব বোঝে না। তাই আমি বিয়ে করব না বললে তারা হাজারটা প্রশ্ন করবে। কিন্তু একজন আধুনিক ছেলে হিসাবে আপনি নিশ্চয় বোঝেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে একজন মেয়েকে বউ বানানো উচিত না। তাই বিয়ে না করার কথাটা আপনাকেই বলতে হবে।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেল শ্রুতি। একটু থামল তারপর। দেখল অদ্ভুত ভাবে হাসছে ছেলেটা। মাথাটা গরম হয়ে গেল এবার শ্রুতির। স্বর একটু রুক্ষ করে বলল—

www.banglabookspdf.com

'আপনি হাসতেই পারেন। আমাকে পাগল, স্কিতজফ্রেনিক যা খুশি ভাবতে পারেন। কিন্তু আমার অনুভূতি আমার কাছে ১০০ ভাগ সত্যি। তাই...'

—'কে বলল আমি পাগল ভাবছি আপনাকে?' এতক্ষণে মুখ খুলল ছেলেটা।

—'প্রতি মানুষের অনুভূতি তার কাছে তার মতো করে সত্যি। এমনকি যাদের আমরা পাগল বলি তারাও আমার আপনার কাছে অস্বাভাবিক। কিন্তু তার নিজের কাছে সে একদম সত্যি। আর এই যে কথাগুলো আপনি বললেন, আপনাকে দেখতে আসার আগের মুহূর্তেও আমি ভেবেছিলাম এগুলো বোধ হয় আমাকেই বলতে হবে আপনাকে। যেমন এর আগেও বলেছি দু-এক জায়গায়। আমি তো আর জেনেশুনে কোনো মেয়ের জীবন নষ্ট করতে পারি না। তাই আমার অনুভূতির জন্য তারাও আমায় পাগল ভেবেছিল বোধ হয়। আরও অনেকেই ভাবে বোধ হয়। কিন্তু তাতে আমার কিচ্ছু যায় আসে না। কারণ ওই যে, আমার কাছে আমি সত্যি।'

ভীষণ অবাক লাগল শ্রুতির। এসব কি বলে লোকটা? ওর মনের কথা বোধ হয় বুঝতে পারল দেবরূপ। বলল— 'কী হল? পাগল ভাবছেন তো আমায়? জানেন আমি ক্লাস নাইন থেকেই রিক্তাকে ভালোবাসি। ও আমাদের পাড়ায় থাকত, দীর্ঘ দশ বছরের প্রেম আমাদের। রিক্তা ছাড়া কোনোদিন নিজেকে ভাবতে পারিনি আমি আর ও জানত না আমায় ছাড়া কিছু। কাগজে কলমে বা আচার মেনে বিয়ে না হলেও মনে মনে আমরা স্বামী স্ত্রীই ছিলাম। কিন্তু সেই রিক্তাই চলে গেল আমায় ছেড়ে। মাসির বাড়ি যাচ্ছিল ও সাতদিনের জন্য শিলিগুড়িতে। মারাত্মক এক রেল দুর্ঘটনা কেড়ে নিল ওকে আমার থেকে।' এবার একটু থামল দেবরূপ। আবার বলে চলল— 'ওর মৃত্যুটা মেনে নিতে পারিনি আমি। সব সময় মনে হয় ও আশে পাশেই আছে আমার। যে কোনো সময় সামনে চলে আসবে। আমি যখন একা থাকি, যখন ঘুমাই ওর স্পর্শ অনুভব করি আমি। তাই যে যাই বলুক আমার পক্ষে রিক্তার জায়গা অন্য কাউকে দেওয়া সম্ভব ছিল না। বিয়ে নিয়ে কোনোদিন ভাবিইনি আমি। কিন্তু বিধি বাম। মা হঠাৎ আক্রান্ত হলেন ক্যান্সারে। মৃত্যু শয্যায় কথা আদায় করলেন যে আমি বিয়ে করব। মা কোনোদিন কিছু চাননি আমার থেকে। তাই মায়ের শেষ সময়ে কথাটা না দিয়ে পারলাম না। তারপর থেকে দাদা বউদি আর বাড়ির বাকিরা উঠে পড়ে লাগল আমার বিয়ে নিয়ে। কিন্তু রিক্তার জল ভরা চোখ আমি দেখতে পাই আমার বিয়ের আলোচনার সময়। তাই একটার পর একটা বিয়ে ভাঙতে থাকলাম আমি। কোনো মেয়ের জীবন নষ্ট হোক আমি চাই না, আমার যে আর কিছু দেবার নেই কাউকে। কিন্তু সেদিন আপনার কথা শুনে প্রথমবার অন্য কিছু মনে এল আমার।' একটু থেমে সরবতে চুমুক দিল দেবরূপ। শ্রুতি তাকিয়ে আছে উদগ্রীব চোখে। আবার বলতে শুরু করল দেবরূপ —

—'যখন আপনি সেদিন আমার কোনো কথা শোনার আগেই বললেন কাউকে ভালোবাসেন, বিয়ে করতে চান না আমায়। অথচ সেই ভালোবাসার মানুষ এখন আপনার থেকে দূরে চলে গেছে তাই আপনাদের বিয়েটাও এক্ষুনি সম্ভব নয় তাই বিয়ে ভাঙতে হবে আমায়, তখন আমার মনে হল হয়তো আপনি সেই যাকে আমি খুঁজছি।'

www.banglabookspdf.com

—'মানে?' বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল শ্রুতি।

—'মানে আমি ভাবছিলাম যদি এমন একজনকে পাওয়া যায়, যে সাহায্য করবে আমায়। দেখুন শ্রুতি বিয়ে নিয়ে এই লুকোচুরি খেলাটা আপনি বেশিদিন চালাতে পারবেন না। একসময় আপনার বাবা মা কোথাও না কোথাও বিয়ে আপনাকে দেবেই। আর আমিও এভাবে কত দিন পাত্রী দেখা দেখা খেলব? মা-কে দেওয়া কথাটা যে রাখতে হবে আমায়। তাই বলছিলাম যদি আপনার আর আমার বিয়ে মানে বিয়ে বিয়ে নাটকটা সেরে ফেলা যায় তাহলে সমাজ তথা পরিবারে এই নিত্য দিনের বিয়ের চাপ থেকে আমরা মুক্তি পেয়ে যাব। আর যেহেতু আমরা একই পথের পথিক তাই একে অপরের অনুভূতিকে সম্মান করব আর খুব ভালো বন্ধু হয়ে উঠব। কিন্তু কারোরই কিছু প্রত্যাশা আর থাকবে না এই সম্পর্ক থেকে। কি ভুল বলছি?'

—'না, মানে কিন্তু এমন আবার হয় নাকি? দেখুন আমি...'

—'আমি কিছু সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছি না আপনার ওপর। আপনি ভাবুন। তারপর জানান আমায়। যদি আপনার আমার কথাগুলো ঠিক না লাগে তাহলে আমি না হয় আপনার কথা মতোই জানাবো আপনার বাড়িতে। চলি আজ।'

চলে গেল দেবরূপ। শ্রুতি বসে রইল ঝুম মেরে। সূর্য অস্ত যাবার পর অন্ধকারে ডুবছে শহর। হাল্কা হাওয়া ছুঁয়ে যাচ্ছে সবাইকে। শ্রুতির কানে বাজছে লোকটার কথাগুলো। সত্যি না পাওয়ার ব্যথা নিয়ে কত মানুষই না ঘুরছে চারপাশে। কজনেরই বা খবর রাখি আমরা। শ্রুতি ধীর পায়ে উঠে নামল রাস্তায়। বুক ভরে বড়ো করে শ্বাস নিল একটা। বুকে জমে থাকা জগদ্দল পাথরের বোঝাটা হঠাৎই যেন একটু হালকা ঠেকল মেয়েটার। গুড়গুড় মেঘ ডাকল আকাশে। ক্লান্ত দগ্ধ দিনের শেষে কালবৈশাখী আসছে বোধ হয় ঘর্মাক্ত পৃথিবীর ক্লেদটুকু শুষে নিতে।

banglabookspdf.com

৫

বিছানায় শুয়ে ছটফট করছিল শ্রুতি। কিছুতেই ঘুম আসছে না। কেন... কেন এত অভিশপ্ত শুধু ওরই ভাগ্যটা? যাদের ও ভালোবাসে, যাদের ও ভালো চায় তারা সবাই কেন জ্বলে পুড়ে মরে এভাবে? একদিনের জন্যও কি শান্তি পাবে না ও? দেবরূপের সাথে বিয়ের পর থেকে যা হোক তাও কাটছিল দিনগুলো। ছেলেটা ভীষণ ভালো। রিক্তার জন্য ওর সাংঘাতিক ভালোবাসা দেখে মাঝে মাঝে শ্রুতির মনে হত সত্যি কত দুর্ভাগা এই রিক্তা। এত অপার প্রেম ছিল ওর জন্য, কিন্তু তবুও চলে যেতে হল ওকে। না, শ্রুতির মনে দেবরূপের জন্য কক্ষনো প্রেম জাগেনি, কিন্তু একটা অপার শ্রদ্ধা লোকটা আদায় করে নিয়েছিল নিজ গুনেই। আস্তে আস্তে ভীষণ ভালো বন্ধু হচ্ছিল ওরা। ভীষণ ভরসা করত শ্রুতি দেবরূপকে, আর সেও শ্রুতিকে আর ওর অনুভূতিকে খুব সম্মান করত। স্বামী স্ত্রী সুলভ সম্পর্ক ওদের ছিল না, তবে এও ঠিক যে সময় বড্ড বড়ো ওষুধ। কে বলতে পারে কোনোদিন হয়তো ঠিক হয়ে যেত ওদের মধ্যেও সব। কিন্তু যে সুযোগ আর এল কই। হঠাৎ শহরে ধেয়ে এল এক মারণ জ্বর। চার দিনের জ্বরে প্রাণ হারাচ্ছে বহু লোক।

www.banglabookspdf.com

দেবরূপও সেই জ্বরের কবলে পড়ল। ওদের বিয়ের বয়স তখন সবে ছ-মাস। নিজের নার্সিং হোমেই দেবরূপকে ভর্তি করিয়েছিল শ্রুতি। সেবার কোনো ত্রুটি রাখেনি। কিন্তু তবুও শেষ রক্ষা আর হল কই?

দেবরূপ যখন চরম অসুস্থ হয়ে নার্সিং হোমে ভর্তি তখনই একদিন আবার সে সামনে চলে এসেছিল খুব অপ্রত্যাশিত ভাবে আর শ্রুতির বুকে আবার আছড়ে পড়েছিল একই সাথে লক্ষ কোটি ঢেউ। দেবরূপকে আলাদা কেবিনে রাখতে পারেনি শ্রুতি। যে বেডে দেবরূপ ছিল, তার পাশের বেডে ভর্তি থাকা লোকটা বোধ হয় কোনো ভাবে পরিচিত ছিল তার। তাকে দেখতে হঠাৎই একদিন চলে এসেছিল সে। কোনো বাঁধা ধরা ভিজিটিং আওয়ারে নয়, দুপুরের দিকে এমনি একটা সময়। এত বছর পর আবার সে একদম সামনে। 'এগিয়ে খবর' চ্যানেলে তো তাকে সব সময়তেই দেখা যায়, কিন্তু আজ আবার সে একদম সামনে। শ্রুতি খুব কষ্ট করে শক্ত করছিল নিজের মন, একবারও তাকায়নি তার দিকে। কিন্তু... কিন্তু মনে হল সে যেন কয়েক মুহূর্তের নির্নিমেষ দৃষ্টি দিয়ে দেখছে ওকে। বিশ্বাস হয়নি শ্রুতির। কী করে বিশ্বাস হবে? সে এখন বিখ্যাত মানুষ। শ্রুতি শুনেছে যে কলেজের পুরোনো কোনো লোকের সাথে যোগাযোগ রাখে না সে। ফেসবুকে পর্যন্ত অ্যাড করে না। সেখানে সে কি করে শ্রুতির দিকে... না এটা হতেই পারে না। কারণ তার সেই কথাটা যে আজও ভোলেনি শ্রুতি। 'বামন হয়ে যে চাঁদ ধরা যায় না।' এই ঘটনার দু-দিন পরেই চলে যায় দেবরূপ তার রিক্তার কাছে। আবার শ্রুতি একা। দেবরূপের মৃত্যুটা ওকে আরও একবার বুঝিয়েছিল যে ভগবান ওর প্রার্থনা শোনেন না। যেমন আজও আবার সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝছে ও। আবীরকে ও নিঃস্বার্থ ভাবেই ভালোবেসে গেছে চিরকাল। হোক না একতরফা প্রেম, তবুও তার মঙ্গল কামনা করতে একদিনও ভোলেনি ও। তবুও আবীরের এই পরিণতি আজ? গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে একটা পা বাদ চলে গেল মানুষটার? তাও আবার শ্রুতির চোখের সামনেই। শ্রুতিরই নার্সিং হোমে। এটা তো শ্রুতিই মানতে পারছে না। তাহলে সে কীভাবে মানবে? না, শ্রুতি যাদের ভালো চায় তাদের কারোর ভালো হয় না। না আবীর, না দেবরূপ, না শম্পাদি। আজ শম্পাদি বোধ হয় ওর জন্যই বিপদে পড়তে চলেছে। শ্রুতির মনটা বরাবরই বেয়াড়া আর অবুঝ। বিশেষ করে আবীরের ব্যাপারে। তাই যেদিন ও প্রথম শুনল আবীর এখানকার পানসে আর কষটে মারা খাবার খেতে পারছে না, সেদিন কিছুটা ঝুঁকি নিয়েই আবীর-এর প্রিয় আলুপোস্ত নিয়ে এসেছিল নিজের হাতে রান্না করে। কলেজে পড়তে এটা শুনেছিল শ্রুতি যে, আলুপোস্ত তার বড্ড প্রিয়। শম্পাদির ডিউটি ছিল সেদিন ওর ঘরে। তাই কিছুটা জোর করেই খাবারটা গুঁজে দিয়েছিল ও। ভেবেছিল শম্পাদি ঠিক ম্যানেজ করে খাইয়ে দেবে তাকে। কিন্তু না, শম্পাদি পারেনি। খাবারটা সে খেলেও ধরা পড়ে গেছে শম্পাদি। এবার এটার জল কতদূর গড়াবে কে জানে!

আকাশে আস্তে আস্তে আলো ফুটছে, পাখির কিচিমিচি জানান দিচ্ছে যে রাত এবার শেষ। শ্রুতি ধীরে ধীরে বিছানায় উঠে বসল। জল ভরা চোখে তাকাল দেওয়ালে টাঙানো শ্রী কৃষ্ণের বড়ো বাঁধানো ছবিটার দিকে। অস্ফুটে বলল— 'হে ভগবান সব কষ্ট শুধু আমায় দাও, কিন্তু আমার কাছের লোকগুলোকে আর কষ্ট দিও না, প্লিজ দিও না।'

www.banglabookspdf.com

৬

—'মাম, ওরা তখন বলছিল তুমি নাকি মারা যাবে? তুমি নাকি আমায় ছেড়ে চলে যাবে?' এটা কি সত্যি মাম? কেন তুমি চলে যাবে? মারা যাওয়া মানে কি মাম? স্টার হয়ে যাওয়া তাই না?'

বছর সাতেকের বাচচা ছেলেটার মাথায় অপার স্নেহে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল তার মা। এবার থামল পলকের জন্য।

—'কে তোকে বলেছে এসব?'

—'ওই তো ওরা বলছিল। আমি শুনতে পেয়ে গেছি। তুমি স্টার হয়ে যাবে না তো মাম?'

—'আমি স্টার হয়ে গেলে তোর খুব কষ্ট হবে না রে?'

—'হ্যাঁ, হবেই তো। তুমি না থাকলে কে আমায় এভাবে ভালোবাসবে বল? কে আমার কান্না পেলে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে বল? কে ঘুমানোর সময় আমায় ছুঁয়ে থাকবে বল?'

মায়ের শুকনো মুখটা কালো কষ্টের ছায়ায় ঢেকে গেল। বাচচা ছেলেটার চুল ঘেঁটে দিয়ে কান্না চেপে বলল— 'আছে একজন। যে তোকে আমার মতো করেই ভালোবাসবে। আমার মতো করেই ছুঁয়ে থাকবে সারা জীবন। তোর সব কান্না সে মুছিয়ে দেবে।'

—'সে কে মাম?'

—সে একটা পরী। সে একদিন আসবে তোর কাছে। লাল বেনারসি শাড়ি পরে, ফুলের মুকুট পরে সে আসবে। সারাজীবন সে তোর কাছে থাকবে তোকে ভালো বাসার জন্য।'

—'সে কবে আসবে মাম? সে কোথায় আছে?'

—'এই তো সোনা, সে তুমি আর একটু বিগ বয় হলেই চলে আসবে। সে তো এখানেই আছে। খুব আশে পাশে কোথাও। তুমি যেদিন তাকে খুঁজে পেয়ে যাবে সেদিনই সে চলে আসবে...।'

না, আজ পর্যন্তও তাকে খুঁজে পায়নি আবীর। মা হারা ছেলেটার অবচেতন মনে ভালোবাসা খুঁজে পাবার যে সুপ্ত ইচ্ছাটা ছিল, সময় আর পরিস্থিতির প্রভাবে তার বিকাশ হয়তো ঘটেছিল সম্পূর্ণ অন্য ভাবে কিন্তু তাতে কিছু হয়নি। আবীর যেমন একা ছিল তেমনই একা রয়ে গেছে। এই এত বছরের জীবনে সম্পর্ক তো কম হয়নি। কিন্তু মা যেমনটা বলেছিল তেমন ভালোবাসার ছোঁয়া কখনো খুঁজে পায়নি আবীর। কোনো সম্পর্ক তো দু-বছরের বেশি টেকেইনি ওর। কখনো আবীর নিজেই বেরিয়ে এসেছে সম্পর্ক থেকে নানা ইগো, আর খারাপ লাগার কারণে। আর কখনো বা অপর দিকের মানুষটা চলে গেছে কিছু না কিছু দোহাই দিয়ে। আসল ব্যাপার হচ্ছে সত্যিকারের ভালোবাসাটা কোনোদিন আসেনি ওর কাছে। আজ প্রায় দু-বছর হল আবীর সিঙ্গেল। আসলে সম্পর্ক, প্রেম এই শব্দগুলো এখন খুব ভিত্তিহীন লাগে ওর কাছে। আবীর জানে এখনও বহু মহিলা আকৃষ্ট ওর প্রতি। কিন্তু আবীর-এর আর ভালো লাগে না কাউকে। কারণ সবাই তো এক। সম্পর্ক মানে দু-দিন একসাথে পাব-এ যাওয়া, পার্টিতে নাচা, পাঁচতারা হোটেলে ডিনার করা। তার পর সব শেষ। অবশ্য এখন ওর খ্যাতি, টাকা পয়সাকে ভালোবেসে কেউ হয়তো থেকে যেতেও পারে সারাজীবন, কিন্তু সেই ভালোবাসার ছোঁয়াটা কি দিতে পারবে সে?

www.banglabookspdf.com

মা মারা যাবার মাস খানেক আগে সেই যে পরীটার কথা বলে গেছিল, সেটা তরুণ বয়সের গরম রক্তে চাপা পড়ে গেলেও মুছে যায়নি কোনোদিনই। সেই জন্যই তো বোধ হয় সেই এক ফোঁটা নিঃস্বার্থ স্নেহের ছোঁয়ার জন্য এত কাঙাল পানা করে মনটা আজকাল।

মায়ের সেই কথাগুলো নতুন করে মনে পরার সূত্রপাত ঠিক এই জায়গাটা থেকেই, মানে এই নার্সিং হোম থেকেই।

গত বছর হঠাৎ যখন শহরে ধেয়ে এল কালাজ্বর, তখন তিমিরদাও ভর্তি হয়েছিল এখানে। তিমিরদা আবীরের জ্যাঠতুতো দাদা, কিন্তু বড্ড ভালোবাসে ওকে। তাই ওকে দেখতে প্রথমবার এখানে পা রেখেছিল আবীর। সেই সময়েই চোখ চলে গেছিল পাশের বেডে। আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে একটা ছেলে আর ভীষণ স্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে নার্স। অপার মমতা যেন ঝরে পড়ছে তার দু-চোখের তারা থেকে। নার্সের মুখটা চেনা। কলেজের সেই ভীতু ভীতু মেয়ে শ্রুতি। তবে এখন আর তেমন ভীতু ভাবটা নেই চোখে। অনেক পরিণত সে এখন। কেমন মিষ্টি যুঁই ফুলের গন্ধ যেন ভেসে আসছে তার শরীর থেকে। দৃশ্যটায় কী যেন একটা ছিল। কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখ সরাতে পারল না আবীর। ওই গন্ধটায় কেমন যেন একটা মাদকতা রয়েছে।

—'তিমির দা, পাশের বেডে ছেলেটাকে নার্স তো খুব টেক কেয়ার করছে। তোকেও দেখছে তো এভাবে?' প্রশ্নটা করেই ফেলেছিল আবীর।

—'হ্যাঁ রে ভাই। এটা নামি নার্সিং হোম। যত্ন আত্তির কোনো ত্রুটি নেই। তবে এখানে যাকে দেখেছিস, উনি তো ওই নার্সের বর। তাই ওনার সাথে কি আর তুলনা...'

তিমিরদা'র কথাগুলো হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে কেমন যেন ধাক্কা মারল আবীরকে। বাড়ি ফিরে এসেও বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল একটা মমতা মাখানো হাতের স্পর্শ, ঠিক যেমনটা মা বলেছিল অনেক বছর আগে।

পলকের জন্য হঠাৎ মনে হয়েছিল ওই স্পর্শ, ওই মমতা আসলে তো আবীরেরই হতে চেয়েছিল। মন কে সঙ্গে সঙ্গে কষে শাসন করেছিল সেদিন আবীর। ছি! এগুলো কি ভাবনা। শ্রুতি একজন পর স্ত্রী। কিন্তু মন যে বড়ো বেয়ারা। শত শাসন সত্ত্বেও মাঝে মাঝেই সেই দৃশ্য ভেসে ওঠা চোখের সামনে কিন্তু থামেনি।

নিয়তি বড়ো বিষম বস্তু। তাই আজ আবার আবীর এই নার্সিং হোমেই। আজ ও পঙ্গু। পা হারানোর পর প্রথম যখন চেতনা এল আবীরের, উফফ সে কী অসহ্য যন্ত্রণা। আবীরের আর্ত চিৎকারে ছুটে এল অনেক ডাক্তার, নার্স। কিন্তু ওর চোখ খুঁজছিল এক জোড়া হাত। এখন যে বড়ো দরকার সেই স্পর্শ। ঘুমের ইঞ্জেকশান দেওয়া হল আবীরকে। চোখ বুজতে বুজতে মনে হল সেও এসে দাঁড়িয়েছে যেন। সেই যুঁই ফুলের গন্ধটা ছুঁয়ে যাচ্ছিল আবীরকে।

তারপর সেদিন ঘটল সেই অদ্ভুত ঘটনা। লাঞ্চের থালায় হঠাৎ আলু পোস্ত। না কোনো ভাবেই মিল নেই এখানকার বিস্বাদ খাবারগুলোর সাথে। মনে হচ্ছে কেউ যেন খুব যত্ন নিয়ে বানিয়েছে খাবারটা শুধু আবীরের জন্যই। মনে মনে সন্দেহটা দানা বেঁধেছিল তখনই। ডিউটিরতা নার্স শম্পাকে চেপে

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

ধরেছিল ও। প্রথমে ভুল ভাল যুক্তি দিয়ে রেহাই পেতে চাইলেও গতকাল আবীরের জেরার মুখে পড়ে স্বীকার করেছে সব। সে শম্পারই বোন। আর খাবারটা তারই বানানো ছিল। আসলে শুধু আজ নয় বিগত আট বছর ধরে সে নিঃশব্দে ভালোবেসে গেছে আবীরকে, কিছু পাবার আশা ছাড়াই। নিজের বিবাহিত জীবনও কাটায়ইনি স্বাভাবিক ভাবে। আজ একাকী বিধবা মেয়েটা দাঁতে দাঁত চেপে নিজের জীবন সংগ্রাম চালাচ্ছে, তবুও আবীরের মঙ্গল কামনা করতে সে ভোলে না একদিনের জন্যও।

না, এগুলো শোনার আর জানার পর থেকে আর নিজেকে সামলে রাখতে পারছে না আবীর। খুব অচেনা একটা অনুভূতি ছেয়ে রয়েছে ওর বুকের মধ্যে। কেবিনের এসিটা বন্ধ করল ও। ভালো লাগছে না আর মেকি শৈত্য। খুলে দিল জানালা। আসুক খোলা হাওয়া, আজ যে প্রাণ খুলে নিঃশ্বাস নেবার দিন।

টিক টিক... দরজায় মৃদু টোকার শব্দ।

—'কাম ইন'... নিজের একপেশে সাহেবি কায়দায় বলল আবীর। ভিতরে এল সে।

—'আপনি আমায় ডেকেছেন স্যার?'

—'হুম। সিস্টার শম্পার হেল্প নিয়ে আমার লাঞ্চে তুমি নিজের রান্না পাঠিয়ে দিয়েছিলে? কি ভাবলে? ধরা পরবে না? তুমি জান না এটা বে আইনি। তুমি জান আমি কি করতে পারি এর জন্য?'

—'স্যার আপনি আমাকে যা ইচ্ছা শাস্তি দিন। দয়া করে শম্পাদি-কে ছেড়ে দিন। ওর কোনো দোষ নেই।' গলা কাঁপছে মেয়েটার।

খুব কষ্ট করে হাসি চাপল আবীর। আবার গম্ভীর গলা করে বলল— 'ছেড়ে দিতে হবে তোমাদের? বাঃ! কী সুন্দর।' কয়েক মুহূর্ত থামল ও। তারপর আবার বলল—

—'ঠিক আছে ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু একটা শর্ত আছে।'

—'বলুন স্যার।'

—'একদিনের ওই একমুঠো আলু পোস্ততে আমার হবে না। সারা জীবন আলু পোস্ত সাপ্লাই করে যেতে হবে আমাকে।'

—'মানে?' ভেঙে পড়ছে আস্তে আস্তে মেয়েটা।

—'আমার মা ছোটোবেলায় আলু পোস্ত করে দিতেন আমায়। আমার খুব ভালো লাগত। তার পর মা চলে গেলেন। আর আমিও খুঁজতে লাগলাম এমন একটা মেয়ে যে আলু পোস্ত রান্নায় পারদর্শী। কিন্তু তেমন কাউকে আজ অবধিও খুঁজে পেলাম না। কিন্তু এবার যখন এমন একজনকে পেয়েছি তাই আর ছাড়তে পারব না, নিজের বউ করে বাড়িতেই রেখে দেব।'

—'এসব আপনি কি বলছেন স্যার? কেন এভাবে অপদস্থ করছেন আমায়?' ঝরঝর করে কাঁদছে মেয়েটা।

আবীরও এবার সিরিয়াস হল। গলা নামিয়ে বলল— 'কেন রে? যাকে দূর থেকে ভালোবাসতে পারিস, তাকে কাছে টেনে ভালোবাসতে পারবি না? নাকি আমি এখন পঙ্গু বলে আপত্তি তোর আমায়

www.banglabookspdf.com

বিয়ে করতে?’

বাচচা মেয়ের মতো ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে এখন কাঁদছে শ্রুতি। আবীর তবু বলে চলেছে— ‘আজকাল পা বাদ গেলে কেউ অথর্ব হয় না সেটা তুইও জানিস। নকল পা মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে অব্যাহত রাখে। কিন্তু দিনের শেষে? দিনের শেষে আমার যে একটা হাত দরকার রে যাকে ভর করে আমি চলব। যে হাতের ছোঁয়াটা শুধু আমার হবে। কিরে ধরবি না আমার হাত?’ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আবীর। শ্রুতি কাঁপছে তির তির।

—‘কিন্তু... কিন্তু... বামন হয়ে যে চাঁদ ধরা যায় না।’

—‘পুরোনো কথায় অভিমান করে এখনও দূরে সরে থাকবি? ক্ষমা করবি না পঙ্গু লোকটাকে?’

আস্তে আস্তে হাত বাড়াল শ্রুতি। আলতো করে ছুঁল আবীরের হাত। দু-চোখের জলে থই থই মেয়েটার।

জানলা দিয়ে ছুটে আসছে ঠাণ্ডা ভেজা হাওয়া। জুঁই ফুলের গন্ধ মিশে যাচ্ছে আবীরের নিশ্বাসে। কী সুন্দর লাগছে সব কিছু এই বিকালটায়। গুড়গুড় করে ডেকে উঠল মেঘ আকাশ কাঁপিয়ে। খোলা জানলা দিয়ে ছুটে আসা বৃষ্টির ফোঁটা ভিজিয়ে দিচ্ছে ওদের।

—‘কালবৈশাখী!’ অস্ফুটে বলল শ্রুতি।

—‘না কাল নয়, আমার আজ বৈশাখী চাই... জীবনের অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেছে। আর নয়, একটুও নয়। বসন্তকে যে এবার বেঁধে রাখার পালা!’ অন্তরের অন্তঃস্থল চিরে শব্দ হয়ে বেড়িয়ে এল আবীরের সবটুকু ভালোবাসা।

—

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

চামড়ার মুখোশ

১

লাইব্রেরিতে একলা বসে বসে নোটস তৈরি করছিল রুনু। বাইরে জোরে বৃষ্টি পড়ছে আজ। ঘুটঘুটে কালো অন্ধকার যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে পৃথিবীটাকে। আর মাঝে মাঝেই কান ফাটান শব্দে বাজ পড়ে খানখান করে দিচ্ছে ফালি লাইব্রেরি ঘরখানার স্তব্ধতা।

আজ সকাল থেকে আকাশের মুখ ভার। তাই কলেজে আজ উপস্থিতির হারও ছিল কম। কিন্তু তবুও রুনু কামাই করেনি। কারণ ওর কামাই করতে ভালো লাগে না। কী হবে কামাই করে? কামাই করা মানেই তো সারাদিন লেডিজ পিজির ঘরে পড়ে থাকা আর সুহানা, মলি, রিক্তা ওদের হাসির খোরাক হওয়া।

হ্যাঁ রুনু ওদের কাছে হাসি ঠাট্টার পাত্রী। একটা অজ গ্রাম থেকে কলকাতা শহরে পড়তে এসেছে ও। গরিব ঘরের মেয়ে। ওদের মতো দামি জামা কাপড় যেমন ওর নেই, তেমনই ও জানে না শহুরে আদপ কায়দা আর চলন বলনও। ওরা সবাই যখন ওদের অবস্থাপন্ন পরিবারের গল্পে পিজি মাতিয়ে রাখে, তখন রুনু শুধুই নীরব শ্রোতা। সত্যি তো কী আর বলবে ও? ওর তো বলার মতো তেমন কিছুই নেই। তাই এমন একটা মেয়ে হাসি ঠাট্টার খোরাক হবে বই কী।

সুহানা এর মধ্যে সব থেকে বেশি উগ্র। আর রুনুকে নিয়ে মজা করতে ওই সব থেকে বেশি ভালোবাসে। রুনু আগে কষ্ট পেত। কিন্তু এখন অনেকটা অভ্যাস হয়ে গেছে ধীরে ধীরে। ও বুঝে গেছে এই শহরে এগুলো মানিয়ে নিয়েই চলতে হবে ওকে।

তবে হ্যাঁ এই শহরটা যে রুনুকে কিছু দেয়নি এমন বলতে পারবে না রুণু। বিকাশ যে ওর এক পরম পাওয়া। রুণু জানে না বিকাশ কেন এমন পাগলের মতো ভালোবাসে ওকে। মাত্র সাড়ে পাঁচ মাসেই বিকাশ বড্ড আপন হয়ে গেছে ওর।

—'আর কত দেরি? বাড়ি যাবে না?' একটা খোনা গলার স্বরে চমকে উঠল রুনু।

লাইব্রেরিয়ান অজিত পাণ্ডে মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে রুনুর একদম সামনে। অদ্ভুত একটা নোংরা লোলুপ চাহনি যেন ঝরে পড়ছে লোকটার দু-চোখ বেয়ে যেটা ছুঁয়ে যাচ্ছে রুনুর শরীর।

—'হ্যাঁ এই তো আর মিনিট দশেক।' শুকনো গলায় বলল রুনু।

হে হে হে... অদ্ভুতভাবে হাসল লোকটা।

রুনুর সারার শরীর ভয়ে গুলিয়ে উঠল। কলেজ বোধ হয় প্রায় ফাঁকা। বাইরে অবিশ্রান্ত বর্ষণ আর এই অদ্ভুতে টিমটিমে আলো জ্বলা তিনতলার কোণার একদিকের এই লাইব্রেরী ঘরটা। হাত চালিয়ে

www.banglabookspdf.com

নোটটা শেষ করতে লাগল রুনু। কিন্তু হঠাৎ চমকে উঠল রুনু দড়াম একটা শব্দে। পাণ্ডে বন্ধ করছে লাইব্রেরির দরজা।

—'একী দরজা বন্ধ করছেন কেন?' কেঁপে গলা রুনুর গলা।

কোনো উত্তর না দিয়ে এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে পাণ্ডে রুনুর দিকে। শরীর কাঁপছে রুনুর। হঠাৎ ঝপ করে নিভে গেল ঘরের আলোটাও।

আতঙ্কে ভয়ে টেবিল খামচে ধরল রুনু। ও বুঝতে পারছে পাণ্ডে এবার ওর একদম সামনে।

—'না। না বলছি। আর এক পাও এগোবেন না বলছি।' যদি এগোন আমি কিন্তু...

না। শেষ হল না রুনুর কথা। তার আগেই একটা বীভৎস চিৎকার ছিটকে এল—

—'আআআ...।' মরণ চিৎকার করছে পাণ্ডে।

দপ করে আবার জ্বলে উঠল আলো।

—'উফফ! মাগো!' ভয় আতঙ্কে এবার নীল হয়ে গেছে রুনুর শরীর। রুনুর সামনেই পড়ে রয়েছে পাণ্ডের অচেতন দেহ। গলার কাছে খুবলানো মাংস। গর্ত হওয়া জায়গা থেকে ফিনকি দিয়ে বের হচ্ছে রক্ত।

কী হয়ে গেল হঠাৎ? কে মারল পাণ্ডেকে? কোথায়ই বা গেল আততায়ী? সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে রুনুর মাথার মধ্যে। সবাই কি তাহলে এবার রুনুকে ধরবে? কিচ্ছু বুঝতে পারছে না রুনু।

না পালাতে হবে। এক্ষুনি। শুধু এইটুকুই এখন বুঝতে পারছে ও। হ্যাঁ এখন পালাতে হবে এই জায়গা থেকে।

পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে কলেজ থেকে বেরিয়ে এল মেয়েটা। বৃষ্টিতেই ছুটছে। খেয়াল নেই যেন আর কোনো দিকে।

banglabookspdf.com

২

বিছানার ওপর জড়সড় হয়ে বসেছিল রুনু। কলকাতায় এই সবে কিছুদিন হলই তো ও এসেছে। কিন্তু তার মধ্যে যে এভাবে বিপদ ধাওয়া করবে ওকে সেটা ও ভাবতেই পারেনি। কয়েক মাস আগেই ঘটে গেল লাইব্রেরির সেই বীভৎস ঘটনা। একটা জল ঝড়ের রাতে ওরই চোখের সামনে খুন হয়ে গেল ওদের লাইব্রেরিয়ান। কিন্তু সত্যি চোখের সামনে কি? রুনু তো সত্যিই জানত না কে আততায়ী? ও তো দেখেইনি কিছু। খুনের ঠিক আগের মুহূর্তটাতেই তো ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেছিল সব কিছু। কিন্তু কাউকে সে কথা বিশ্বাসই করাতে পারেনি ও। থানা পুলিশ কোর্ট কাছারির গেড়োতে এখনও আটকে আছে ও। সে সব মিটতে না মিটতেই আবার এই বীভৎস ঘটনা!

আজ শরীরটা ভালো নেই রুনুর। তাই আজ ও কলেজ যায়নি। আর আজই আবার কী একটা কারণে ছুটি নিয়েছিল সুহানাও। গোটা দিনটা এই ফাঁকা পিজিতে সুহানার সাথে সারাদিন থাকতে হবে ভেবেই মনটা বিরক্তিতে ভরে যাচ্ছিল ওর। তাই কতকটা বিরক্ত মুডেই স্নান ঘরে ঢুকেছিল ও।

স্নান করতে করতে হঠাৎই রুনুর কানে আছড়ে পড়েছিল ভয়ার্ত একটা চিল চিৎকার। মরণ আর্তনাদ করছে সুহানা। ভিজে গায়েই তড়িঘড়ি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে আঁতকে উঠেছিল রুনু।

www.banglabookspdf.com

বিশ্বাস করতে পারছিল না নিজের চোখকে।

মেঝের ওপর পড়ে রয়েছে সুহানার রক্তাক্ত দেহ। চোখ দুটো ঠিকরে আসছে। গলার কাছে একটা মাংস খুবলান গর্ত। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে।

বীভৎস দৃশ্যটা দেখে টলে পড়েই যাচ্ছিল রুনু। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে শুধু বিকাশকে ফোন করেছে একটা।

—'বিকাশ, বিকাশ প্লিজ একবার এসো আমার পিজিতে। আমি একাই আছি এখন। প্লিজ বিকাশ। কেন ডাকছি সেটা তুমি এলেই বলব।' হ্যাঁ শুধু এইটুকুই ও বলেছে বিকাশকে আপাতত।

টিং টং! কলিং বেলের শব্দে চমকে উঠল রুনু। উঠে গিয়ে খুলে দিল দরজাটা। বিকাশ এসে গেছে।

—'কী হয়েছে রুনু? হঠাৎ এমন জরুরি তলব? কোনো প্রবলেম নাকি তুমি... একীইই!! বীভৎস মৃতদেহটা দেখে আঁতকে উঠেছে বিকাশ। ভয়ে সাদা হয়ে গেছে ওর মুখ।

—'এটা কি রুনু? কীভাবে?'

বাচচা মেয়ের মতো বিকাশের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবার রুনু। শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরল ওকে।

—'বিশ্বাস কর বিকাশ আমি জানি না। আমি কিচ্ছু জানি না। আমি সত্যি জানি না। আমি জানি না কে এভাবে খুন করল সুহানাকে। কে এই অদৃশ্য হত্যাকারী আমি জানি না। আমি বুঝতে পারছি না কে আমায় ফাঁসানোর চেষ্টা করছে?' পাগলের মতো মাথা ঝাঁকাচ্ছে রুনু।

—'রুনু, আমায় ছাড় বলছি।' রুনুর বাহুপাশে আবদ্ধ হয়ে আজ যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে বিকাশের।

—'না বিকাশ আমি তো তোমায় ছাড়ব বলে ধরিনি।'

—'আমার লাগছে। আমার লাগছে রুনু। আআ।' বীভৎস চিৎকার ছিটকে এল বিকাশের গলা চিরে।

এবার হালকা হয়ে এল রুনুর বাহুপাশের বন্ধন। আস্তে আস্তে এলিয়ে পড়ছে মেঝেতে বিকাশের প্রাণহীন দেহটা। গলার কাছে খোবলানো গর্ত। রক্ত বেরোচ্ছে ভক ভক করে।

রুনু একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল দেহটার দিকে খানিকক্ষণ। সিনেমার ফ্ল্যাশব্যাকের মতো অনেক টুকরো দৃশ্য ভেসে উঠছে ওর চোখের সামনে। অনেকগুলো মিষ্টি দুপুর আর বিকাল। অনেকগুলো হাতে হাত আর চোখে চোখ রাখার মুহূর্ত।

বিকাশের বুক পকেট থেকে মোবাইলটা টেনে বের করল রুনু। আবার খুলল হোয়াটসঅ্যাপের সেই ম্যাসেজটা, যেটা দু-দিন আগে প্রথম বিকাশের চোখ এড়িয়ে নজরে আসে রুনুর।

বিকাশ লিখেছে ওর বন্ধু দীপককে—

—'আরে ভাই রুনুর মতো গেঁয়ো মেয়েকে বিয়ে করা যায় নাকি? ওর সাথে শুধু টাইমপাস করছি। এরপর সুযোগ বুঝে ওর শরীরটাকে ভোগ করে নেব। তারপর আর খুঁজেই পাবে না আমাকে ও। আর ওর মতো মেয়ের অত ক্ষমতা নেই আমাকে খুঁজে বের করার।'

www.banglabookspdf.com

হাঁটু গেড়ে এবার টাটকা মৃতদেহের সামনে বসে পড়ল রুনু। দু-হাতের আঁজলা ভরে তুলে নিল অনেকখানি তাজা রক্ত। তৃপ্তি করে পান করল সেই রক্ত সুধা।

এবার ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল দেওয়ালের লম্বা আয়নাটার সামনে। একটানে ছিঁড়ে ফেলল মুখে সাঁটা চামড়ার মুখোশটা। ধীরে ধীরে সারা শরীর থেকে খসে পড়ছে ওর মানুষ নামক প্রজাতির খোলস।

এবার বেরিয়ে এল ইরুককুকিরিস। হ্যাঁ। ইরুককুরিরিস এই গ্রহের বাসিন্দা নয়। অনেকগুলো ছায়াপথ, গ্রহ, উপগ্রহ পেরিয়ে এসেছিলও এখানে। এখানে এসেই ও প্রথম পেয়েছে 'মানুষ' নামক প্রাণীটার রক্তের স্বাদ। উফফ! কী ব্যাপক স্বাদ!

তখন থেকে ঠিক করে নিয়েছে ও। নিজের ক্ষমতার জোরে চামড়ার মুখোশ পরে আর সারা শরীরকে মানুষের চামড়ায় ঢেকে ঘুরে বেড়াবে ও গোটা পৃথিবীটা। মানুষের ছদ্মবেশে থাকতে থাকতে সামনে পাওয়া শয়তান মানুষ খুঁজে বের করে নিজের রক্ত পিপাসা মিটাবে ও। তবে এক মুখোশে বেশিদিন থাকবে না। এক একটা রূপের মেয়াদ হবে সাত মাস করে। আর প্রতিটা রূপে মারবে তিনটে করে শয়তান। তাদের গলার নলি চিরে রক্ত পান করবে ও।

রুনু অবতারে ও মেরেছে পাণ্ডেকে, যে কিনা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে যে কোনো নিষ্পাপ মেয়েকে নষ্ট করতে পারে। আর মেরেছে সুহানাকে, যার কাছে কিনা গরিব হওয়াটা মস্ত বড়ো অপরাধ। আর শেষ পর্যন্ত কিনা বিকাশও! এত বড়ো প্রতারক সেই ছেলেটাও! সত্যি এই পৃথিবীটা বড্ড বাজে জায়গা। আর মানুষ জাতিটাও মোটেই ভালো না।

ইরুককুরিরিস এবার নিজের শরীরটাকে অদৃশ্য করে ভাসিয়ে দিল হাওয়ায়। অদৃশ্য ইরুকুকু উড়ছে এবার। কেউ আর দেখতে পাচ্ছে না ওকে। এবার ও খুঁজে নেবে অন্য কোনো একটা চামড়ার মুখোশ, তখন আবার সবাই দেখতে পাবে ওকে। এবার ও যাবে অন্য কোনো নতুন একটা শহরে। আবার নতুন রূপ, আবার নতুন জায়গা, নতুন মানুষ আবার রক্ত পান করার নতুন খেলা! নতুন শিকার, নতুন শাস্তি আর নতুন কয়েকটা মৃত্যু।

—

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

দমকা হাওয়া

তারিখ : ১২.০৩.২০০৫

—'ঠিক সময়ে পৌঁছে যাস কিন্তু...' স্কুল থেকে বেরোবার মুখেই কথাটা ছুঁড়ে দিল সুজিত। অল্প ঘাড় নেড়ে সায় জানাল দীপ। ঘড়ির কাঁটা চার ছুঁই ছুঁই। তার মানে আরও দু-ঘণ্টা পর থেকে নতুন কোচিং-এর সময়।

তাহলে কি বাড়ি ফিরে যাওয়াই ভালো? নিজের মনেই প্রশ্ন করল দীপ।

—'নাঃ...' বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ঠেলে জবাবটাও ফিরে এল আপনা থেকেই। প্যান্টের পকেট থেকে ঠিকানা লেখা কাগজটা বের করে একবার আলতো চোখ বুলিয়ে হাঁটা শুরু করল ধীর পায়ে। বাস নিয়ে তো লাভ নেই। সময় তো অনেকটাই বাকি।

পুরো পথটা হেঁটে যখন দীপ পৌঁছল ঠিকানায় তখন ঘড়িতে পাঁচটা পাঁচ।

ঘামে ভিজে জামা প্রায় নেতা। গলা শুকিয়ে পুরো কাঠ। চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে হঠাৎই ওর চোখে পড়ল একটা ছোটো মতো কাফে। নাম বৈশাখী কেবিন। আধুনিক কাফে টাইপ কিছু নয়। খুব-ই সাদা মাঠা। এ সি নেই।

banglabookspdf.com

দীপ ভিতরে গিয়ে বসে একটা পেপসি অর্ডার দিল। কাফেটা ওর বয়সের ছেলে মেয়েদের ভিড়ে ঠাসা।

সবই প্রায় কম বয়সি যুগল। ওর জীবনটাও যদি আর সবার মতো হত তাহলে হয়তো...

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে পেপসিটা শেষ হয়ে গেল। দীপ উঠে গেল কাউন্টারে। কাউন্টারে বসে রয়েছে একটা মেয়ে। পরনে মলিন সালোয়ার। গায়ের রং চাপা, সাধারণ চেহারা, তবুও কেন যেন চোখ সরাতে পারল না দীপ। কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থবির হয়ে গেল ওর মা, চুম্বকের মতো আটকে গেল ওর চোখ।

—'কি হল আপনি ঠিক আছেন তো?' মেয়েটার গলার স্বরেই চমক ভাঙল দীপের।

ইশশশ! মেয়েটা বুঝতে পেরে গেছে। নিজের স্বভাব অনুযায়ী খুব নার্ভাস হয়ে গেল দীপ। কি করবে বুঝতে পারল না। আমতা আমতা স্বরে বলল—

—'না না মানে আসলে...।' মেয়েটা খুব সুন্দর করে হেসে ওর হাত থেকে টাকাটা নিল। বলল 'না না, ঠিক আছে। আমি বুঝতে পেরেছি।'

ব্যালেন্সটা ফেরত দেবার সময় ওর হাতটা ছুঁয়ে গেল দীপ এর হাত। জীবনে প্রথম বার কোনো নারীর স্পর্শ... একটা অদ্ভুত অচেনা শিহরন অনুভব করল দীপ সারা শরীরে...।

তারিখ : ১৫.০৪.২০০৫

www.banglabookspdf.com

—'উফফফ! পয়লা বৈশাখ এর দিন কি পড়তে আসতে ভালো লাগে বল?' মুখে একরাশ বিরক্তি নিয়ে কথাটা বলল রূপক।

—কেন ভাই ভালোই তো হল, তুমি তোমার করিনা কাপুরের দেখা পেয়ে গেলে... চোখ টিপে মুচকি হেসে বলল সুমন।

—'এই, কেবল চরণ আজ কেমন ঝিল্লি মেরে এসেছিল দেখলি?' বলে উঠল এবার নয়ন।

—'তাতে আর নতুন কী এখন? আজকাল তো দীপ কুমার এর প্রচুর কেতা বেড়েছে। মনে হয় কোন ভালো মেয়ে পটিয়েছে আর তাই...' রূপককে কথা শেষ করতে না দিয়ে সুমন বলল—

—'খেপলি নাকি? দুনিয়ার কোনো মেয়ে ওকে পাত্তা দিতে পারে বলে তোর মনে হয়?'

—'প্লিজ তোরা থামবি?' সুজিত একটু চেঁচিয়ে উঠল। তারপর স্বর একটু নরম করে বলল—

—'দেখ ভাই, তোরা এভাবে বলিস না। ও আমাদের পাড়াতেই তো থাকে তাই আমি সত্যি জানি ওর কষ্টের অনেকটাই। তোদের তো আগেও বলেছি জন্মের পরই ওর মা মারা যায়। ওর বাবা ওকে ছুঁয়েও দেখেননি। ওকে অপয়া ভাবতেন। ওকে নিয়ে যান ওর দিদা। বছর দুয়েক এর মধ্যে বিয়ে করেন ওর বাবা। ওর খবরও নিতেন না। তারপর ওর যখন চার বছর বয়স তখন ওর দিদা মারা গেলে ওর বাবা ওকে নিয়ে আসেন। ওর সৎ মা ওকে আসবাব ছাড়া আর কিছু ভাবেননি কোনোদিন। ওর বাবার ও ছেলের প্রতি টান নেই বিশেষ। ওর ছোটো ভাইটাও মুখ ঝামটা দেয় কথায় কথায়। এরকম যার জীবনকাহিনী সে ছেলে কীভাবে আর পাঁচটা ক্লাস নাইনের ছেলের মতো হবে বল। কিন্তু ওরও অনেক গুন আছে। অনেকেই হয়তো সেটা জানে না। দারুন লেখে ছেলেটা।'

—'প্লিজ, আর বোর করিস না।' চেঁচিয়ে উঠল নয়ন।

—'জলদি পা চালা। ওই নতুন যে শরবতের দোকানটা খুলেছে ওখানে যেতে হবে। আমার লেটেস্ট ক্রাশ মিলি আজ আসবে ওখানে, তোদের সাথে আলাপ করাব। আর ওই ঝিঙ্কু মামনি আরও দুজন সুন্দরীকে আনবে।'

—'বলিস কি রে!' একসাথে উল্লাসে ফেটে পড়ল সব।

এক ঝাঁক কিশোর উল্লাসে মুখরিত হয়ে গেল নববর্ষের সকাল।

তারিখ : ১৬.০৫.২০০০৫

দীপ বিছানায় শুয়ে ছটফট করছিল। আজ তিন সপ্তাহ হল বিছানায় শয্যাশায়ী ও। অসময়ে চিকেন পক্স আর টাইফয়েড একসাথে। সবাই বেশ ভয় পেয়ে গেছে এবার। বাবাও প্রতিদিন এসে বসছেন দীপ এর কাছে। ঘন ঘন ফোন করছেন ডাক্তার কাকুকে। আর দীপ ছটফট করছে, শরীরের থেকেও অনেক বেশি মনের কষ্টে।

আজ তিন সপ্তাহ হয়ে গেল বৈশাখীর সাথে দেখা নেই।

হ্যাঁ, মনে মনে এই নামটাই ওর রেখেছে দীপ। আসল নাম যাই হোক না কেন বৈশাখী কেবিনের ওই মায়াবিনী তো কালবৈশাখীর হাওয়ার মতোই আচমকা আছড়ে পড়েছে দীপের জীবনে।

www.banglabookspdf.com

সেই প্রথম দেখার পর অদ্ভুত এক অচেনা ভালো লাগা নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল দীপ। রাতে ভালো করে ঘুমাতেই পারেনি। পর দিন আবার ছুটে গেছিল অদ্ভুত এক টানে ওই কাফেতে। যথারীতি পেপসি নিয়ে বসেছিল এমন একটা টেবিলে যেখান থেকে অস্পষ্ট হলেও দেখা যায় ওর মুখ। ছোটোবেলা থেকে দীপ এর জীবনে নানা বিপর্যয় গেছে। তাই আত্মবিশ্বাসটা ওর একটু কমই। ও জানে স্কুলে সবাই ওকে কেবলা চরণ বলে। সব মেয়েরা ওকে জোকার ভাবে কারণ ও আর সবার মতো ঝকঝকে নয়। তাই এদিনও সাহস করে ও মেয়েটার দিকে তাকাতে পারছিল না কিছুতে।

এভাবেই প্রায় মিনিট পনেরো কেটে গেল। শেষে অতি কষ্টে ঠাকুরের নাম জপে ও দৃষ্টি ঘোরাল মেয়েটার দিকে। আর তাকিয়েই চমকে গেল। দেখল সেও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে দীপ এর দিকেই। দীপ কক্ষনো মেয়েদের সাথে মেশেনি সেভাবে। তবু আজ ওর বুঝতে ভুল হল না যে এই দৃষ্টি মোটেই কোনো জোকার ছেলেকে দেখার মতো দৃষ্টি নয়, অন্য এক জাদু মাখা এ দৃষ্টি। দীপ অবশিষ্ট পেপসি কোনোমতে শেষ করে দাম চোকাতে গেল তাড়াতাড়ি। আর আজ ও একই ভাবেই ছুঁয়ে দিল দীপ এর হাত। এর পর থেকে কেটে গেছে প্রায় দু-মাস। কোচিং থাক বা না থাক নানা অছিলায় দীপ বার বার ছুটে গেছে ওই কাফেতে। একই ভাবে তাকিয়ে থেকেছে ওর দিকে আর বুঝতে চেষ্টা করেছে ওর চোখ দুটোর ভাষা। কোনোদিন হয়তো হালকা হাসি উপহার পেয়েছে মেয়েটার থেকে। আবার কোনদিন ও একটু বেশি গভীর ভাবে ছুঁয়ে গেছে দীপের হাত। দীপের যেন বিশ্বাসই হয় না তাহলে ওকেও ভালো লাগতে পারে কোনো মেয়ের? নাকি সবটাই ওর বিভ্রম? না না তাই বা হবে কেমন করে? সব তো দিনের আলোর মতোই সত্যি। দীপও আস্তে আস্তে বদলেছে এই দু-মাসে অনেক। এখন বেশ তকতকে থাকার চেষ্টা করে ও। নিজের মধ্যেকার হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাসটা যেন আজকাল আবার একটু একটু করে ফিরে পাচ্ছে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও ওর সাথে কথা বলে উঠতে পারেনি। ওই বা বলে না কেন কে জানে। বোধ হয় ও খুব লাজুক দীপ এরই মতো। হ্যাঁ দীপ বুঝতে পেরেছে ও অনেকটা দীপ এর মতো। ওর চোখ দেখে দীপ বুঝতে পারে ওরও অনেক কষ্ট লুকিয়ে আছে ওই দু-চোখের গভীর নদীতে। অবশেষে সেদিন একটা সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিল দীপ। পেপসি খেয়ে টাকা দেবার সময় নিজের মোবাইল নম্বরটাও গুঁজে দিয়েছিল বৈশাখীর ডেস্কে।

আর কিছু লিখবে ভেবেও লিখে উঠতে পারেনি। ইশশ! কী ভালো হত যদি দীপ ওর ক্লাসের সুমন, তমাল এদের মতো হতে পারত।

কিন্তু দীপ এর ভাগ্য তো বরাবরই ওর শত্রু। এবারও ভাগ্য ওর প্রতিকূলেই গেল। এই সাহসী কাজটা করার পরদিন থেকেই দীপ জ্বরে পড়ল। আর তারপর চিকেন পক্স আর টাইফয়েড ধেয়ে এল একসাথে। ও বিছানায় বন্দি হয়ে গেল। না, ওর অচেনা নাম্বার থেকে ফোন আসেনি। কী হল? বৈশাখী কি রেগে গেল? নাকি বুঝতে পারল না? নাকি ওই নাম্বার লেখা কাগজটা কোনোভাবে অন্য কারো কাছে চলে গেল? ওর কোনো বিপদ হবে না তো? উফফ! কবে যে ঠিক হবে দীপ? অহস্য লাগছে এই অবস্থাটা।

তারিখ: ০৩.০৬.২০০৫

www.banglabookspdf.com

দীপ এখন একটু সুস্থ হয়েছে। আজই প্রথম বাড়ি থেকে বের হল দীর্ঘ অসুস্থতার পর। আর প্রথমেই এসেছে বৈশাখী কেবিন। রোজকার মতোই বিকেলের ভিড়ভাট্টা। আজ বাইরে বেশ মেঘ হয়ে রয়েছে। মনে হয় বৃষ্টি হবে জোর। তাই ওকেও ফিরতে হবে তাড়াতাড়ি। শরীর বেশ দুর্বল। কিন্তু বৈশাখী কোথায় আজ? ও তো নেই কাউন্টারে। এই দু-তিন মাসে তো এমন কোনোদিন দেখেনি দীপ। গলা ব্যথা তাই আজ কফি নিয়েছে। সেটা শেষ হয়ে গেল দেখতে দেখতে। তবু তার দেখা মিলল না। অগত্যা আর একটা কফির অর্ডার দিল দীপ। এদিকে বাইরে বেশ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে আর কাফেতেও ভিড় বাড়ছে। দ্বিতীয় কফিটাও শেষ হয়ে গেল। ওর ভিতরে যেন কেউ হাতুড়ি পিটাতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে। গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গেল দীপ। কাউন্টারে আজ মোটা মতো একটা লোক। কোনোমতে তাকে দাম মিটিয়ে খুব কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে নিল দীপ। না, ওকে আজ পরতেই হবে।

—'দাদা ওই মেয়েটা আজ আসেনি?'

—'কে?' রুক্ষ স্বরে জবাব দিয়ে টেরচা চোখে তাকাল লোকটা।

—'ওই যে যিনি কাউন্টারে থাকতেন...' অল্প কেঁপে গেল দীপ এর গলা।

—'অ, বকুল এর কথা বলছ? তো তাকে দিয়ে তোমার কী দরকার হে?' দীপ থতমত খেয়ে গেল লোকটার রুক্ষ ব্যবহারে।

—'ও তো কাজ ছেড়ে দিয়েছে এ মাস থেকে। ও দেশে চলে গেল। ওর বিয়ে হয়ে গেল কিনা।' বিরাট কান ফাটানো শব্দে বাজ পড়ল কোথাও।

মোটা লোকটা চেঁচিয়ে উঠল—

—'ওই ছেলে তোমার ব্যালেন্সটা তো নিয়ে যাও...'

বৃষ্টির মধ্যে পাক খেতে খেতে হারিয়ে গেল শব্দগুলো। আর সবাই দেখল কালবৈশাখী ভেজা বিকালে উদভ্রান্তের মতো দৌড়াচ্ছে একটা ছেলে। কিন্তু সেই ছেলেটার চোখের জল কেউ দেখল না, সেটা যে মিশে গেছে বৃষ্টির বড়ো বড়ো ফোঁটার সাথে।

তারিখ : ২৪.০৪.২০১৮

হুহু করে হাইওয়ে দিয়ে ছুটছে গাড়িটা। গাড়ির পিছনের সিটে বসে রয়েছেন সাম্প্রতিক কালের অন্যতম খ্যাতনামা লেখক দীপ মুখোপাধ্যায়। ভদ্রলোকের পেশা অধ্যাপনা, আর নেশা কলমের আঁচড়ে ছবি আঁকা। সকলে বলেন ওনার কলম নাকি কথা বলে, অদ্ভুত এক যাদু আছে নাকি এই লেখকের কলমের ভাষায়।

সম্প্রতি ওনার উপন্যাস 'ভালোবাসার নানা রং' নিজের ঝুলিতে সংগ্রহ করেছে বেশ অনেকগুলো পুরস্কার।

—'দাদা মনে হচ্ছে ঝড় বাদল আসবে।'

—'হ্যাঁ? কী বললি?' ড্রাইভারের ডাকে যেন ভাবনার ঘোর ছিঁড়ে বেরিয়ে এলেন দীপ। মানুষটা ভাবের জগতেই যেন মিশে থাকেন। শুধু মাঝে মাঝে প্রকৃতির টানে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। এই

www.banglabookspdf.com

যেমন এখন ফিরছেন বোলপুর শান্তিনিকেতন থেকে।

—'মানে বলছিলাম যে আকাশের অবস্থা ভালো নয়। মনে হচ্ছে কালবৈশাখী হবে।'

—'তা ভালোই তো। হোক না কালবৈশাখী। আজকাল তো হয়ই না প্রায়।' অল্প হেসে বললেন দীপ।

—'কি বলছেন দাদা! কালবৈশাখী ঝড় কখনো ভালো হয় নাকি? বিচ্ছিরি খ্যাপাটে ঝড়, বৃষ্টির তাণ্ডব। কত গাছ পড়ে। কত কাঁচা বাড়ির ছাদ উড়ে যায়। একদম ধ্বংস করে দেয় কালবৈশাখী ঝড়ের দাপট।'

—'কে বলেছে যে কালবৈশাখী শুধু ধ্বংস করে? অনেক সময় পাগলা ঝোরো বাতাস আর দমকা হাওয়া কত কিছু আমূলে সব পাল্টে ফেলে আবার সব নতুন করে সাজিয়ে দেয় জানিস?' আর বেশি কথা বাড়াল না ড্রাইভার। দাদা লেখক মানুষ। সব ভাবনা চিন্তার ধরনই আলাদা। গাড়ির জানালার কাঁচ খানিকটা নামিয়ে দিল দীপ। ঝড়টা শুরু হচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া গাড়ির জানালার ফাঁক গলে ছুঁয়ে দিল দীপকে আর অমনি দীপ পৌঁছে গেল অনেকগুলো বছর আগে। ঠিক এমনই এক কালবৈশাখীর বিকালে হুট করে ওর জীবন থেকে হারিয়ে গেছিল সেই মেয়েটা যে কিনা পাগলা ঝরো হাওয়ার মতোই একদিন আছড়ে পড়েছিল ওর জীবনে। তার উপস্থিতিটাই কেমন যেন একটু একটু করে বদলে দিয়েছিল দীপকে। হারানো আত্মবিশ্বাস আবার খুঁজে পেয়েছিল দীপ, আবার নতুন করে বাঁচার, ভালো থাকার ইচ্ছে ফিরে এসেছিল ওর মধ্যে। বৈশাখী না না বকুল দীপের জীবন থেকে হারিয়ে গেলেও ওর চোখ দুটো যেন আজও অনুসরণ করে দীপকে। তাইতো আজ সেই কেবলা দীপ হতে পেরেছে সমাজের একজন সফল মানুষ দীপ মুখোপাধ্যায়। পুরোনো দীপের খোলনালচে বদলে যাবার সেই একমাত্র কারণটা আজ গোটা পৃথিবীটা না জানলেও দীপ নিজে তো হাড়ে হাড়ে জানে। আর তাই ও বিশ্বাস করে সব ঝড় ভাঙতে আসে না, কিছু কিছু ঝড় ভেঙে গড়তেও আসে।

—'এই গাড়ি থামা, গাড়ি থামা।' দাদার ডাকে ক্যাঁচ করে ব্রেক কষে গাড়ি থামাল রঘু।

—'কী হল দাদা? গাড়ি কেন থামাতে বলছেন বৃষ্টি হচ্ছে যে।'

রঘুর কথা কানে পৌঁছাল না দীপের। ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে ও। হাইরোডের মাঝে একটা ছোটো মতো খাবারের দোকান, দীপ বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে মাখতে মাখতে পাগলের মতো ছুটে যাচ্ছে সেই দিকে।

প্রথমে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল রঘু, তারপর দাদার পিছু নিল সেও। খাবারের দোকানটার নাম বৈশাখী টিফিন সেন্টার।

বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছে দীপের। দোকানের সামনে গিয়েই আরও চমকে উঠল ও।

কাউন্টারে বসে একটা মেয়ে। মুখ নীচু করে হিসাব লিখছে সে।

—'এক্সকিউজ মি...' ধরা গলায় বলল দীপ।

—'হ্যাঁ বলুন' মেয়েটা তাকাল এবার দীপের দিকে। আর অমনি চমকে উঠল দীপ। আরে! এ তো সেই... সেই মেয়েটা। দীপের বৈশাখী। সেই মলিন সালোয়ার, চোখে উদাস দৃষ্টি।

www.banglabookspdf.com

—'বলুন স্যার কী লাগবে?' মেয়েটা কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে দীপের দিকে।

—'কোক লাগবে আর সাথে যদি ফ্রাইটাই...' দীপ বলল একটু ঢোঁক গিলে।

—'হ্যাঁ হয়ে যাবে দশ মিনিটে। আপনি একটু বসুন।'

দীপ বসল একটা চেয়ার টেনে। বাইরে বৃষ্টির দাপট আরও বাড়ছে।

না, এই মেয়েটাও বৈশাখী নয়। শুধু ওর মতোই চোখে একটা উদাস দৃষ্টি আছে এরও। চেয়ারে বসে দু-হাতে মাথার রগ টিপল দীপ। ও তো জানে বৈশাখীকে আর কোনোদিনই নিজের চোখের সামনে দেখতে পাবে না। তবুও কেন যে বৈশাখী কাফে, বৈশাখী টিফিন, বৈশাখী স্টোর এমন কোনো দোকান দেখলেই আজও এমন আকুল হয়ে ওঠে...

দীপ এবার আস্তে আস্তে আর একবার তাকাল মেয়েটার দিকে। মেয়েটা কার দিকে যেন একটা দেখছে। দীপের দৃষ্টিও ঘুরল আবার সেই দিকে।

আরে! এ তো দীপই। সেই ভীতু চাহনি, পাতলা চেহারা। সেই ছোটোবেলার দীপই তো বসে আছে একটা চেয়ারে আর তার দিকেই তো তাকিয়ে রয়েছে মেয়েটা। আর সেই পুরোনো দীপও একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে মেয়েটার দিকে।

আবার চোখে রগড়ে সেদিকে তাকালেন একবার খ্যাতনামা লেখক দীপ মুখোপাধ্যায়। না, দীপের ছোটোবেলার চেহারার সাথে মিল থাকলেও ওই ছেলেটা দীপ নয়। আর হবেই বা কি করে!

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন দীপ মুখোপাধ্যায়। হন হন করে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছেন নিজের গাড়ির দিকে।

—'স্যার... স্যার কী হল? আপনার খাবার হয়ে গেছে স্যার...' চিৎকারটা ক্রমেই ফিকে হয়ে এল দীপের কানে।

—'রঘু তাড়াতাড়ি চল। খুব তাড়াতাড়ি। একটা খুব জরুরি কাজ মনে পড়ে গেছে...' গাড়িতে উঠেই বললেন লেখক তথা অধ্যাপক বাবু।

গাড়ি স্টার্ট দিল রঘু। আবার ছুটছে গাড়ি।

হ্যাঁ সত্যি কাজটা শুরু করবে দীপ আজ থেকেই। বাংলার সবচেয়ে নাম করা পূজা বার্ষিকী 'আমার দেশ' এর জন্য উপন্যাসটা লিখতে হবে। আর আজ থেকেই শুরু হবে নতুন উপন্যাস 'দমকা হাওয়া'। না দীপ জানে না এক্ষুনি দেখা ছেলে-মেয়ে দুটোর মধ্যে কি আছে, না ও জানে না ওরা শেষ অবধি মিলবে কিনা তবে 'দমকা হাওয়া' উপন্যাসে মিলিয়ে দেবে দীপ ওদের গল্পটা। আর এভাবেই পরিণতি না হয় পাক অনেক বৈশাখী, আর অনেক দীপের অসমাপ্ত গল্পগুলো।

—

www.banglabookspdf.com

হিয়ার প্রেম

প্রতীমের শোবার ঘরে ঢুকেই ওর বুকে আছড়ে পড়ল নিশা। পাগলের মতো নিজের ঠোঁট আর নাক ঘষতে শুরু করল প্রতীমের বুকে আর মুখে। উফফ! কী শান্তি। ফাইনালি প্রতীম এখন পুরোপুরি ওর জিম্মায়। প্রতীমও সাংঘাতিক ভাবে নিজেকে মিশিয়ে দিচ্ছে নিশার মধ্যে। হ্যাঁ, এই মুহূর্তটার স্বপ্নই তো চাকরিতে জয়েন করার সেই প্রথমদিন থেকে দেখ এসেছিল নিশা। ওই ঘ্যান ঘ্যানে জঘন্য মেয়েটার কবল থেকে ছাড়িয়ে প্রতীমকে পুরোপুরি নিজের করে নেবে ও। আর আজ সেটা ও সত্যি করেছে। ইশশ! খুব গর্ব ছিল ওই মেয়ের। প্রতীম নাকি ওর ছোটোবেলাকার প্রেম। ওরকম অনেক ছোটোবেলার প্রেম দেখা আছে নিশার! প্রতীম-এর মতো স্মার্ট ছেলে, যে কিনা ওর বস আর যাকে পটিয়ে বিয়ে করতে পারলে তরতর করে নিশার কেরিয়ার গ্রাফ মই বেয়ে উঠবে, তাকে কি কোনোভাবেই হাতছাড়া করা যায়।

টিং টং। হঠাৎ কলিংবেল বেজে উঠল প্রতীমের ফ্ল্যাটের। ইশশ! এই সব সময়ে এভাবে ছন্দপতনের কোনো মানে হয়!

—'উফফ! কে আবার এল এই সময়? আজ তো সানডে।' বিরক্ত মুখে বলল প্রতীম।

—'তুমি বস। আমি দেখছি।' গায়ে হাউস কোট চড়াতে চড়াতে জবাব দিল নিশা।

দরজা খুলতেই একরাশ বিরক্তি আর খারাপ লাগা এসে ঝাপটা মারল ওকে।

—'কী ব্যাপার তুমি এখানে?' খুব কড়া গলায় প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল নিশা আগত অতিথির দিকে।

—'কে এসেছে নিশা?' ভিতর থেকেই হাঁক ছাড়ল প্রতীম।

—'তোমার প্রাক্তনী।' মুখ বিকৃত করে ব্যাঙ্গাত্মক স্বরে জবাব দিল নিশা।

ইতিমধ্যে মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েই গেছে প্রতীম। এসেই প্রায় হুংকার দিয়ে উঠল ও।

—'আবার? আবার এসেছ তুমি? নির্লজ্জ বেহায়া। তোমায় এত করে বলেছি না একদম বিরক্ত করবে না আর তুমি আমায়। তাও আবার এসেছ? বেরোও। বেরিয়ে যাও বলছি।'

—'প্লিজ প্রতীম। প্লিজ এভাবে বোলো না। আমি তোমায় ছাড়া কীভাবে বাঁচব বল। তুমি তো জানো তোমায় আমি কতটা...। আমার পৃথিবীর সবটুকু জুড়ে রয়েছ তুমি। প্লিজ এভাবে আমায় নিঃস্ব করে দিও না। তুমি জানো আমি গত সাত রাত দু-চোখের পাতা এক করিনি। তুমি জানো, আমি কি ভীষণ মানসিক অশান্তিতে আছি। আমার মনে হচ্ছে আমি পাগল হয়ে যাব। প্লিজ তুমি আমার কাছে ফিরে এসো। আমি কথা দিচ্ছি তুমি যা বলবে আমি তাই করব। সব কথা শুনব তোমার।' এবার কান্নায় ভেঙে পড়ল প্রতীমের প্রাক্তনী।

—'দেখো বোকার মতো কথা বোলো না। আমি তোমাকে আগেও বলেছি, আবারও বলছি এই সম্পর্কটা আমি আর রাখব না কারণ আমি আর এটা থেকে কোনো এক্সাইটমেন্ট পাচ্ছি না। তুমি

www.banglabookspdf.com

মেনে নাও সেটা। মেনে তো তোমাকে নিতেই হবে। তুমি নিজেও শান্তিতে বাঁচ। আর আমাকেও শান্তি দাও। আর আমি তো যতদূর শুনেছি তোমায় কাছে পেতে চায় এমন কোন নতুন মানুষেরও আবির্ভাব হয়েছে তাই না? প্লিজ তুমি যাও না সেখানে।' এবার আগের থেকে একটু সুর নরম করে বলল প্রতীম।

—'উফফ! প্রতীম প্লিজ। এই মেয়েটাকে প্লিজ ভাগাও। আমি আর নিতে পারছি না এই সব নাটক।' রুক্ষ স্বরে কথাগুলো ভাসিয়ে দিয়ে দুপদাপ করে ভিতরে চলে গেল নিশা। মেজাজ দেখিয়ে দুম করে বন্ধ করে দিল শোবার ঘরের দরজা।

—'এই তুমি যাও তো এবার।' আবার হুংকার ছাড়ল প্রতীম।

—'না প্রতীম না এত সহজে তো নয়।' এবার দাঁতে দাঁত ঘষে হিসহিসিয়ে উঠল মেয়েটা।

—'আমার সাথে বিগত বারো বছর প্রেম করে আজ যেই শখ মিটে গেল অমনি ফেলে দেবে আমায়? না এত সহজে আমি তো ছাড়ার পাত্রী নই প্রতীম দেব।'

—'তো কি করবে তু...' প্রতীম নিজের কথাটা শেষ করতে পারল না। কারণ তার আগেই ও দেখতে পেয়ে গেল ওর প্রাক্তনীর হাতে ঝলসে উঠেছে চকচকে একটা ধারালো ফলার ছুরি। প্রতীম কিছু বুঝে ওঠার আগেই মেয়েটা বিদ্যুৎ বেগে সেই ছুরি তাক করে দৌড়ে এল প্রতীমের দিকে।

'আ আ আ আ...' তীব্র আর্তনাদ রবিবারের সন্ধ্যার নির্জন ফ্ল্যাটের সমস্ত নৈঃশব্দকে খান খান করে দিল মুহূর্তের মাঝে। গোটা ফ্ল্যাটের সারা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল আর্তনাদ আর গোঙানির বিষাক্ত গন্ধ।

১

চোখটা হালকা লেগে গেছিল হিয়ার। কিন্তু একটা দুঃস্বপ্ন এসে ছিঁড়ে খুঁড়ে দিল হিয়ার সেই তন্দ্রা। ধড়মড় করে জেগে বিছানায় উঠে বসল ও। অন্ধকার ঘর আবছা রাত বাতির আলোয় মাখামাখি। হিয়া বিছানায় একা। দীপ্ত পাশে নেই। বুকের মধ্যে ছ্যাঁত করে উঠল হিয়ার। পর মুহূর্তেই দু-চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল দু-ফোঁটা জল। না, এভাবে নিজের সবটুকু নিজের চোখের সামনে ও শেষ হয়ে যেতে দেবে না। শোবার ঘর সংলগ্ন ব্যালকনিতে এবার চোখ রাখল হিয়া। হ্যাঁ ও যা ভেবেছে ঠিক তাই। দীপ্ত ওখানেই। কানে ফোন চেপে গভীর আলাপে মগ্ন। আসলে যে ও আলাপ কী, আর কার সাথে এখন যে সেটা আর অজানা নেই হিয়ার। দীপ্ত ঈশিতার সাথে কথা বলছে। প্রেম করছে। অথচ এ তো সেই দীপ্ত। সেই দীপ্ত যে হিয়ার মুখের এক চিলতে হাসি দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত এক সময়ে। এ তো সেই দীপ্ত যে হিয়ার সাথে শুধু একটিবার কথা বলার জন্য কত পাগল ছিল। এ তো সেই দীপ্ত যে না থাকলে হিয়া হয়তো আজ বন্ধ থাকত কোনো অন্ধ কূপের ঘুপসিতে। সেই সময়ে সেই ঘটনার পরে দীপ্ত যদি সেদিন সবটুকু দক্ষ হাতে না সামলাত তাহলে কি আজকের এই দিনটা, এই স্বাভাবিক জীবনটা পেত হিয়া? না পেত না। সেটা হিয়াও জানে। অথচ সেই দীপ্তই কিনা আজ প্রতারণা করছে হিয়ার সাথে! দিনের পর দিন ঠকাচ্ছে হিয়াকে একের পর এক মিথ্যা বলে, সেই মিথ্যার আড়ালে নিজের অবৈধ সম্পর্ককে চাপা দিয়ে। প্রথম যেদিন হিয়া টের পেল এই

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

ব্যাপারটা হিয়া সেদিন পাগলের মতো কেঁদেছিল। ঠিক করেছিল নিজেকে শেষই করে ফেলবে। করতও হয়তো তাই, যদি না

দীপ্তর প্রতারণার আসল উদ্দেশ্যটা জেনে ফেলত ও। দীপ্ত তো আসলে দীপ্তই নয়।

বিছানা থেকে পা টিপে টিপে নামল হিয়া। ব্যালকনির দরজাটা হালকা ফাঁক করে কান পাতল।

দীপ্ত ফোনে কথা বলছে।

—'হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি সব সামলে নেব। আমি আছি তো নাকি? বিশ্বাস কর আমি সব সময় পাশে আছি তোমার। তুমি শুধু ভরসাটা রেখ আমার প্রতি।' চমকে উঠল হিয়া। হাড় হিম করা হিমেল একটা স্রোত খেলে গেল হিয়ার শিরদাঁড়া বেয়ে। এই গলার স্বর দীপ্তর নয়। এ গলার স্বর অন্য কারোর। আর এই গলার স্বর যে ভীষণ চেনা হিয়ার। খুউউব চেনা।

সে ফিরে এসেছে। সে প্রতিশোধ নিতে ফিরে এসেছে। দীপ্তর শরীরকে ভর করেছে সে। প্রতি রাতে সে ফিরে আসে দীপ্তর মধ্যে। আবার সেই বিশ্বাসঘাতকতা। আবার সেই ধোঁকা। আবার তার না মেলা হিসাবগুলো বোধ হয় এভাবেই সে মিটিয়ে নেবে ঠিক করেছে। দীপ্তকে ওর কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায় সে। তাইতো সে বেছে নিয়েছে দীপ্তর শরীরটাই। কিন্তু সে জানে না এবার হিয়া একা নয়। এবার বটবৃন্দ বাবা আছে হিয়ার সাথে। খবরের কাগজে প্রথম এই বটবৃন্দ বাবার ব্যাপারে জানতে পেরেছিল হিয়া। আগে কোনোদিন এ সব বাবা টাবায় বিশ্বাস ছিল না হিয়ার। কিন্তু ওই যে বলে মানুষ খারাপ সময়ে খড়কুটকেও আঁকড়ে ধরে। হিয়ার অবস্থাও সেদিন ছিল কতকটা সেরকমই। প্রথম প্রথম দীপ্তর বদলটায় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিল হিয়া। সেই সময়তেই একদিন কি যেন একটা মনে করে ছুটে গেছিল খবরের কাগজের ওই ঠিকানাটায় দীপ্তর একটা ছবি সাথে নিয়ে।

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

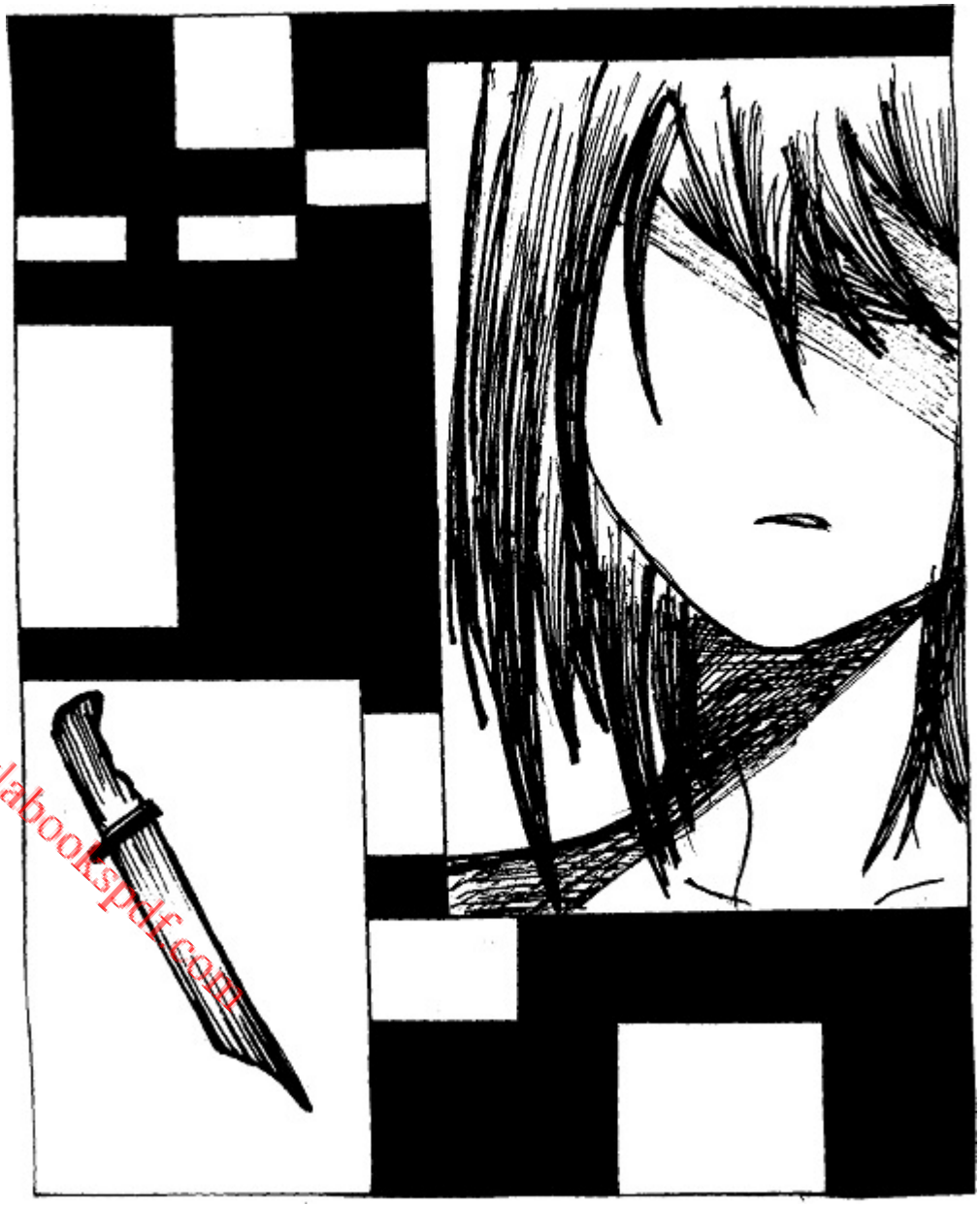

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

—'উয়ও লট আয়া হ্যায় বেটি। তেরি পতি কে শরীর পে আব ও অয়াপাশ আ গ্যায়া হ্যায়।' প্রথম যেদিন এই কথাটা শুনেছিল সেদিন তোলপাড় হয়ে গেছিল হিয়ার মধ্যে। সে ফিরে এসেছে। মৃত্যুর পরেও এভাবে ফিরে আসা যায়? মনে বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের নিদারুণ টানাপোড়েন অতিষ্ঠ করে দিয়েছিল ওকে। অবশেষে ওর চোখের সামনেই একটু একটু করে কাটল সব কুয়াশা। এখন তো ওর চোখের সামনেই রয়েছে পুরো স্পষ্ট ছবিটা। দীপ্ত প্রতিদিন একটু একটু করে আরও বেশি প্রতীম হয়ে উঠছে। সেই কথা বলা, সেই হাসি, সেই গলার স্বর, সেই আদপ কায়দা এমনকী সেই গায়ের গন্ধটাও। তিন বছর আগে মরে যাওয়া মানুষটাই যেন প্রতি মুহূর্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর চোখের সামনে দীপ্তর ছদ্মবেশে। প্রতি মুহূর্তে এখন সতর্ক থাকতে হয় হিয়াকে। কারণ ও জানে ওর সাথে এখন দীপ্ত নয়, থাকে প্রতীম। প্রতীম এসেইছে হিয়াকে মেরে নিজের বদলা নিতে। আর তাই ফিরে এসেছে ওর প্রতারণাও। তবে এখন হিয়া জানে কীভাবে নিজের ঘর বাঁচাতে হবে ওকে। বটবৃন্দ বাবা যে পথ দেখাচ্ছেন ওকে। আগামী অমাবস্যাই যে সেই বিশেষ দিন যেদিন ওকে করতে হবে আসল কাজটা। সেদিনই তো ওই ফিরে আসা প্রতারকটার ছায়াকে শেষ করে আবার নিজের দীপ্তকে ফিরিয়ে আনবে ও নিজের কাছে, নিজের করে। সেই পুরোনো ছন্দে। বটবৃন্দ বাবার প্রতিটা কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে ও।

—'হিয়া জেগে গেছে। আমি রাখছি।' ফোন রেখে দিল দীপ্ত থুড়ি প্রতীম। হিয়া তড়াক করে ফিরে এল বিছানায়।

—'একী তুমি জেগে বসে আছ।' কথাটা বলল দীপ্তর আড়ালে থাকা প্রতীম।

—'তুমি কার সাথে কথা বলছিলে?' জিজ্ঞাসা করল হিয়া।

—'জানোই তো হিয়া, আমি আই টি সেক্টরে কাজ করা মানুষ। তাইতে আবার প্রোজেক্ট ম্যানেজার। রাত বিরেতে ক্লায়েন্ট কল বা বাকি টিম মেম্বারদের সাথে দরকারে কথা যে বলতেই হবে।'

সেই এক মিথ্যা কথা। কি ভাবছে এই লোকটা? এভাবেই একের পর এক মিথ্যা বলে ক্রমাগত ভাবে হিয়াকে বোকা বানিয়ে ওকে মেরে ফেলাটা খুব সহজ হবে? না। না না না। এখন সবটা জেনে গেছে হিয়া। সবটুকু। হিয়া এবার হাসবার চেষ্টা করল একটু। লোক দেখানি মেকি একটা সহজ হাসি।

দীপ্ত মানে দীপ্তর আড়ালে থাকা প্রতীম এসে বসল এবার হিয়ার পাশে। হাত রাখল হিয়ার কোমরে। নিজের মাথাটা গুঁজে দিতে চেষ্টা করল হিয়ার বুকে। চমকে উঠল হিয়া। বুকের রক্ত হিম হয়ে এল ওর। না, এ স্পর্শ ওর দীপ্তর নয় তো। তবে অচেনা স্পর্শও নয় যে এটা। এ স্পর্শ প্রতীমের। এবার একটা বোটকা গন্ধ পেল হিয়া। কীসের গন্ধ এটা? কোনো পচনশীল জৈব পদার্থ না? আর তার সাথে মিশে কীসের গন্ধ এটা? এটাই তো প্রতীমের সেই পারফিউম। এ গন্ধ কি কোনোদিন ভুলতে পারে হিয়া? কতবার ও নিজে হাতে গিফট করছে প্রতীমকে এই পারফিউম। কিন্তু দীপ্ত তো এটা মাখে না। তবে? তবে যে কি সেটা সত্যি আজ আর অজানা নেই হিয়ার।

www.banglabookspdf.com

—'কী হল হিয়া? তুমি কি রেগে আছ আমার ওপর?' প্রশ্নটা শুনেই কেমন যেন বিবশ হয়ে এল হিয়ার সারা শরীর। গলার আওয়াজটা দীপ্তর নয়। এটা প্রতীমের।

—'কেন প্রতীম কেন? কেন এভাবে আমার দীপ্তকে আমার থেকে কেড়ে নিচ্ছ তুমি? প্লিজ তুমি চলে যাও। আবার নতুন সর্বনাশ কর না আমার।' বলতে গিয়েও কথাগুলো বলতে পারল না হিয়া। ওর কথা আটকে এল। ওর উলটো দিকে মানুষটার চোখের মণি কালো থেকে আস্তে আস্তে সবুজ হয়ে যাচ্ছে।

—'নাঃ। না...।' কোনোমতে বলল ও। হাত পা অবশ হয়ে আসছে হিয়ার। কারণ ওর ঘরে ওর খাটে ওর সাথে এখন যে রয়েছে সে দীপ্ত নয়, সে প্রতীম। সেই মুখ, সেই হাসি। হ্যাঁ এটা সেই প্রতীম যাকে তিন বছর আগে নিজের হাতে খুন করেছিল হিয়া। মৃত্যুর পরেও শেষ হয়নি ওর প্রতিশোধ স্পৃহা।

নিজের আতঙ্কটা যথাসম্ভব আড়াল করার চেষ্টা করল হিয়া। না একে কিছু বুঝতে দেওয়া যাবে না। তাহলেই আবার সতর্ক হয়ে যাবে এ। যা করার সবটা ওকে খুব সাবধানে করতে হবে আগামী অমাবস্যায়। প্রতীম এবার সুইচ টিপে বন্ধ করে দিল ঘরের আবছা রাতবাতিটাও। সারা ঘর ভেসে গেল নিকষ কালোতে। বুকে অসম্ভব তোলপাড় চলছে হিয়ার। ও যে দেখতে পাচ্ছে প্রতীমের ওই সবুজ চোখের তারায় গন গন করছে প্রতিহিংসার লেলিহান শিখা।

২

ঘড়িতে ঢং ঢং করে একটা বাজতেই ঘুমটা ভেঙে গেল হিয়ার। উফফ! আজকেও এভাবে ঘুমিয়ে পড়তে পারল ও! নিজের ওপরই নিজের নিদারুণ রাগ হল। যদি ঠিক সময়ে ঘুমটা না ভাঙত! আজই যে সেই দিন। আজই যে হিয়ার সেই বহু প্রতীক্ষিত অমাবস্যার রাত। হিয়া আস্তে আস্তে উঠে বসল বিছানার ওপর। আজ যে ওকে পারতেই হবে। ওকে যে আজ পারতেই হবে আবার দীপ্তকে ফিরিয়ে আনার কাজটা করতে। বটবৃন্দ বাবার কথামতো কাজ সেরে ফেলতে হবে আবার। যথারীতি রাতবাতির অস্পষ্ট আলোতে মাখামাখি সারা ঘর। হিয়া এবার তাকাল বিছানার ওইপাশের লোকটার দিকে। আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে প্রতীম। মানে দীপ্তর আড়ালে লুকিয়ে থাকা প্রতীম।

বিছানা থেকে এবার নেমে পড়ল হিয়া। সন্তর্পণে ডায়াল করল বটবৃন্দ বাবার ফোন নম্বর।

—'হাঁ রে বেটি। বোল তু...'

—'বাবা, বাবা আমি পারব তো বাবা?' গলা কাঁপছে এবার হিয়ার।

—'তুই পারবি বেটি। নিজের পেয়ার, নিজের পতিকে ওয়াপাশ আনার জন্য তোকে যে পারতেই হবে।' কেটে গেল ফোনের লাইন। নিজের সবটুকু সাহস একত্র করেছে এবার হিয়া, যেমনটা সেই দিনে করেছিল। সেই তিন বছর আগে। এবার আলমারি খুলে ও বের করল সেটা। বটবৃন্দ বাবার দেওয়া সেই মন্ত্রপুত অস্ত্র, এই অস্ত্রের দ্বারাই যে ওকে শেষ করতে হবে প্রতীমকে। আবার দীপ্ত ফিরে আসবে ওর কাছে সেই আগের মতো নিজস্ব ছন্দে।

www.banglabookspdf.com

খাটের দিকে আস্তে আস্তে ধীর পায়ে এগোচ্ছে হিয়া আর ওর হাতে ঝলসে উঠছে চকচকে শান দেওয়া একটা ছুরি। এবার একদম কাছে ও ঘুমন্ত লোকটার। চোখ বুজে সপাং করে ও বসিয়ে দিল অস্ত্রটা দীপ্তর বুকে, না না প্রতীমের বুকে।

একবার... দু-বার... তিনবার... ব্যস! শেষ প্রতীম। আমি পেরেছি... পেরেছি... পেরেছি... একটা পৈশাচিক নারকীয় উল্লাস খান খান করে দিল রাতের নৈঃশব্দকে। ছুরি হাতে জয়ের আনন্দে পাগলের মতো নাচছে হিয়া। কিন্তু ও বুঝতে পারল না তখনও ওকে জরিপ করে চলেছে দুই জোড়া চোখ।

৩

সব নার্সিং হোমেই বোধ হয় সংলগ্ন একটা মন্দির বা ঠাকুর ঘর থাকে। এখানেও তাই। আর সেই মন্দিরেই বসে নীরবে চোখের জল ফেলছে দীপ্ত। ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছে টুকরো টুকরো পুরোনো স্মৃতির কোলাজ। ভেসে উঠছে ওর ভালোবাসার মুখ। হিয়ার মুখ। কলেজের সেই প্রাণোচ্ছল মেয়েটা যে ছিল খুব হাসি খুশি, প্রাণখোলা আবার তেমনই পরোপকারী। যে কারোর যে-কোনো সমস্যায় আগে এগিয়ে যেত হিয়া, তা সে সমাধান ওর কাছে থাকুক বা না থাকুক। হিয়ার সেই প্রাণ খোলা স্বভাবটাই মন কেড়েছিল দীপ্তর। তাই নিজের ডিপার্টমেন্টের এই মেয়েটার সাথে খুব বন্ধুত্ব না থাকলেও একদিন সাহস করে গিয়ে নিজের মনের কথা বলেই দিয়েছিল দীপ্ত, আর নিজের মনটাও ওর ভেঙেছিল সেইদিনকেই।

—'তুই খুব ভালো ছেলে রে দীপ্ত। কিন্তু তোর প্রস্তাব আমার পক্ষে মানা সম্ভব নয়। কারণ আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অন্য কারোর প্রতি।'

—'কে সে? আমাদের কলেজেরই কেউ কি?' বুকে একরাশ কষ্ট নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল দীপ্ত।

—'না। সে আমাদের পাড়ার একজন। ছোটোবেলা থেকেই আমাদের প্রেম। যদিও সে বড়ো আমার থেকে প্রায় ন-বছরের তবুও সেই আমার কাছে সব।' সেদিনই জেনেছিল দীপ্ত প্রতীম আর হিয়ার প্রেমের কথা। প্রতীম ব্যবসা শুরু করেছে। কোম্পানি খুলেছে কিছু একটা। তবে হিয়ার সাথে প্রেম না হলেও আস্তে আস্তে কীভাবে যে ও খুব ভালো বন্ধু হয়ে গেছিল দীপ্তর। প্রাণ খোলা মেয়েটা যেন সত্যি সবার থেকে অনেকখানি আলাদা। কিন্তু সেই মেয়েটাই হঠাৎ বদলে যেতে শুরু করল কলেজের ফাইনাল ইয়ার থেকে। খুব চুপচাপ হয়ে গেছিল হিয়া হঠাৎ। কিছু বলতেও চাইত না ও স্পষ্ট করে। তবে তবুও আস্তে আস্তে দীপ্ত অনেকটা জেনে নিচ্ছিল ওর থেকে। আর বুঝতে পারছিল প্রতীম ছেলেটা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে হিয়ার থেকে আর যেটা মানতে পারছে না কিছুতেই হিয়া। প্রতীমের জীবনে বাসা বেঁধেছে অন্য কেউ। এভাবেই তাও কেটে গেল বছর দেড়েক। প্রতীমের শোকে হিয়া তখন প্রায় পাগল। ফাইনাল পরীক্ষাও দিল না। ইতিমধ্যে চাকরি পেয়ে গেছিল দীপ্ত। তবুও সব দিক ম্যানেজ করে হিয়াকে সাধ্যমতো সামলে রাখার চেষ্টা করছিল ও। তবুও হল না আর শেষ রক্ষা। হিয়ার মানসিক অবসাদ এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে একদিন প্রতীমের বাড়িতে ওকে খুন করতে চড়াও হয়েছিল হিয়া। কীভাবে যে সেই পরিস্থিতি থেকে হিয়াকে টেনে বার করেছিল দীপ্ত সেটা শুধু দীপ্তই জানে।

www.banglabookspdf.com

—'দীপ্ত, প্লিজ নিজেকে সামলা ভাই।' পিঠে হাতের ছোঁয়া পেয়ে চমকে উঠল দীপ্ত। মানস এসে দাঁড়িয়েছে।

—'মানস, ও ভালো হবে তো রে? আবার সব আগের মতো হয়ে যাবে তো?' কান্নায় ভেঙে পড়ল এবার দীপ্ত। মানস শক্ত করে জড়িয়ে ধরল ওকে। মানস, মানে দীপ্তর স্কুল জীবনের বেস্ট ফেন্ড মানস। এই মানসই তো এখন দীপ্তর একমাত্র ভরসা। মানসই তো প্রথম বলে যে হিয়া ক্যাপগ্রাস ডিলিউসন নামক বিরলতম মানসিক ব্যাধির শিকার।

বিয়ের পর মোটামুটি সব কিছু ঠিকঠাকই চলছিল দীপ্ত আর হিয়ার জীবনে। কিন্তু সমস্যাটা শুরু হল মাস ছয়েক আগে থেকে মানে যবে থেকে দীপ্ত প্রোজেক্ট ম্যানেজারের প্রমোশন পেল তবে থেকে। নতুন পদের খাতিরে বিদেশি ক্লায়েন্টদের সাথে ইউ এস ছকের সময়মতো কথা বার্তা বলতেই হবে। তাই মাঝ রাত্তিরে কল নেওয়া শুরু হল দীপ্তর। কথা বলতে হত নিজের টিমের অন্য মহিলা আর পুরুষ কিছু কলিগদের সাথেও প্রয়োজনে। এই সব দেখে কীভাবে যেন হিয়া ভেবে বসল দীপ্ত বুঝি অন্য কোনো সম্পর্কে আসক্ত। আসলে হিয়ারও দোষ নেই, ও যে বড্ড বড়ো আঘাত পেয়েছে একবার। প্রথম প্রথম দীপ্ত ওকে বুঝিয়ে বলত। কিন্তু কিছুই কাজ হয়নি তাতে। উল্টে তাতে হিয়ার ঘ্যানঘ্যানানি আরও বেড়েছিল। ফলত দীপ্ত নিজেও মেজাজ হারিয়েছে কখনো সখনও। আর তাতেই ফল হয়েছে আরও খারাপ। হিয়ার মনে এই ধারণা জন্ম নিয়েছে যে প্রতীম আসলে বাসা বেঁধেছে দীপ্তর শরীরের আড়ালে। মৃত্যুর পর ফিরে এসেছে ও আবার নিজের প্রতিশোধ নিতে। প্রথমদিকে দীপ্ত ভেবেছিল হয়তো ও নিজেই হ্যান্ডেল করে নিতে পারবে হিয়াকে। কিন্তু যখন ও বুঝতে পারল হিয়ার মানসিক পরিস্থিতি ক্রমশ হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে তখন ও মানসকে জানায় সবটা। আসলে মানস যেমন একাধারে দীপ্তর বন্ধু, তেমনই নামকরা সায়কায়াট্রিস্ট। দীপ্তর মুখে সব কথা শুনে আর হিয়াকে দু-একবার ভিজিট করে মানস বলে হিয়া ক্যাপগ্রাস ডিলিউসন নামক বিরল মানসিক রোগের কবলে পড়েছে। এই রোগে আক্রান্ত মানুষ নিজের কাছের লোকেদেরই শত্রু ভেবে বসে। তারা মনে করে তার কাছের লোকটার আড়ালেই ঘাঁটি গেঁড়ে রয়েছে কোনো প্রতারক শয়তান। মানস চেষ্টা করছিল কাউন্সেলিং করে, ওষুধ পত্র দিয়ে হিয়াকে সারিয়ে তোলার। কিন্তু হিয়া কোনো সহযোগিতা করলে তো! উল্টে আরও জটিল হচ্ছিল ওর অবস্থা। ক্যাপগ্রাস ডিলিউশন-এর সাথে যোগ হল হিয়ার হ্যালুসিনেশন আর স্কিতজোফ্রেনিয়ার জটিলতা। হিয়ার জীবনে আবির্ভাব হল কাল্পনিক বটবৃন্দ বাবা। যাকে হিয়া মনে করছিল নিজের রক্ষাকর্তা। বটবৃন্দ বাবার সাথে সারাদিন কাল্পনিক সংলাপেই হিয়া ব্যস্ত তখন। সারাদিন ফোন কানে চেপে চলছে দীপ্ত রূপী প্রতীমের আত্মা নিধনের প্ল্যান। কারো কোনো কথাই কানে তোলে না সে। সারাদিন বোবা আর নিথর মুঠো ফোন কানে চেপে বাড়িময় ঘুরছে সে। কিন্তু মাসখানেক আগের হিয়ার একটা কাল্পনিক সংলাপ চমকে দিয়েছিল দীপ্তকে। আগামী অমাবস্যার রাতে কোনো মন্ত্রপুত ধারালো অস্ত্র দিয়ে প্রতীমের আত্মা তথা দীপ্তর শরীরকে এফোঁড় ওফোঁড় করার প্ল্যান করছে হিয়া।

—'ভাই এবার কী করব আমি?' ভয়ে আর আতঙ্কে আবার সেদিন মানসের দ্বারস্থ হয়েছিল দীপ্ত।

www.banglabookspdf.com

'ভয় পাস না। আমি যা বলছি তাই কর। আমিও থাকব সেদিন তোর সাথে। হ্যাঁ দীপ্ত সেদিন মানসের কথামতোই চলেছিল। সেই বিশেষ দিনটায় হিয়ার ডিনারে হাল্কা ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল দীপ্ত। তারপর হিয়া ঘুমিয়ে পড়ার পর নিজের বিছানায় নিজের শোবার জায়গায় বেশ পরিপাটি করে সাজিয়ে দিয়েছিল কয়েকটা বালিশ। যাতে হিয়া দেখে বুঝতেই না পারে যে দীপ্ত নেই ওখানে। তারপর ও আর মানস লুকিয়ে পড়েছিল ওদেরই অন্ধকার ঢাকা ফ্ল্যাটের একটা জুতসই আড়াল খুঁজে। সেই আড়াল থেকেই তারপর দেখেছিল ওরা কি পৈশাচিক বর্বরতায় হিয়া প্রতীম ভেবে ছুরির আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করছে বালিশগুলো। তারপর উন্মাদিনীর মতো জয়ের আনন্দে নাচছিল হিয়া। নাচতে নাচতেই জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এক সময়। সেই থেকে ও অজ্ঞানই রয়েছে টানা বিগত ছত্রিশ ঘণ্টা।

হাঁটতে হাঁটতে মানসের সাথে নার্সিং হোমের লবিতে চলে এল দীপ্ত। এসেই থমকাল একটু। এ কাকে দেখছে ও! তার পর মুহূর্তেই মনে পড়ল একে তো ওই ডেকেছিল মানসের কথায়। দীপ্তকে দেখেই একটু গলা খাঁকড়াল প্রতীম।

—'দীপ্ত তুমি আমায় ডেকেছ?' গলা ঝাড়ল প্রতীম।

—'প্লিজ প্রতীমবাবু। প্লিজ আপনি আমায় একটু হেল্প করুন হিয়াকে সুস্থ করে তোলার ব্যাপারে।'

—'আমি সব সময় হিয়ার ভালোই চাই দীপ্ত। সেদিন... সেদিন যেটা হয়েছিল সেটাও নেহাত অ্যাক্সিডেন্ট ছিল। আমি সত্যি হিয়াকে আঘাত করতে চাইনি। কিন্তু ও আমায় এমনভাবে সেদিন অ্যাটাক করতে এসেছিল যে...'

প্রতীমের কথায় আবার দীপ্তর মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠে জেগে উঠল তিন বছর আগের সেই ভয়ানক ঘটনার দিনটা। হিয়ার মানসিক স্থবিরতা তখন প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছে। সেই উন্মত্ত অবস্থায় ও একদিন চড়াও হয়েছিল প্রতীমের নতুন কেনা ফ্ল্যাটটায় কিছু একটা এসপার ওসপার করতে। হয় প্রতীমকে নিশার কবল থেকে ছাড়িয়ে আনবে ও, নয়তো প্রতীমকে খুন করে ও প্রতিশোধ নেবে। সেদিন কিছুটা বচসা হয়েছিল ওর প্রতীমের সাথে। তারপরই উন্মত্তের মতো ধারালো অস্ত্র নিয়ে ও ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় প্রতীমের ওপর। প্রতীম শক্তিশালী পুরুষ। অবস্থা হাতের বাইরে যেতে পারে বুঝে সে আচমকা এক হ্যাঁচকা টান মারে সেই মুহূর্তে হিয়ার হাত ধরে। ঠিক টাল সামলাতে পারেনি হিয়া আচমকা ধাক্কাটায়। তাই বেসামাল হয়ে মাটিতে ছিটকে পড়ে যায় ও, তীব্র আর্তনাদ করে। আর নিজের চেতনাও হারায় সেই মুহূর্তেই। প্রতীম তারপর খবর দেয় হিয়ার বাড়িতে, আর দীপ্তকেও। প্রায় গোটা দু-দিন অচেতন ছিল হিয়া। তারপর যখন ওর জ্ঞান ফিরল তখন দেখা গেল যে মুছে গেছে হিয়ার স্মৃতির বেশ বড়ো একটা অংশ। সেই সময় ডাক্তার বললেন আচমকা পড়ে গিয়ে আঘাত লেগেছে হিয়ার মস্তিষ্কের বিশেষ একটা অংশে। মানসিক আঘাতের অভিঘাত আর ব্রেনের সেই আঘাত লেগেই মুছে গেছে হিয়ার কিছু স্মৃতি। ট্রিটমেন্ট শুরু হল হিয়ার। কিছুদিনের মধ্যে ফিরল হিয়ার হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি। কিন্তু তার সাথে উপস্থিত হল এক নতুন উপসর্গ হিয়ার মধ্যে। ও বারবার বলতে শুরু করল ও নাকি খুন করে ফেলেছে প্রতীমকে। আর দীপ্ত বা হিয়ার বাড়ির

www.banglabookspdf.com

লোকেরা যখনই বোঝাতে চেষ্টা করে যে প্রতীমের কিছু হয়নি, একদম ভালো আছে সে সেটা শুনতেই চায় না হিয়া। উল্টে আরও যেন হিংস্র হয়ে ওঠে ও ওর কথার প্রতিবাদ করে অন্য কিছু বোঝাতে গেলে। সেই সময়ে ডাক্তার বলেছিলেন ওই বিশেষ প্রসঙ্গে যেন কোনো বাদানুবাদ না করা হয় হিয়ার সাথে। ও ওই ব্যাপারে কোনো কথা বলতে গেলেও যেন কোনোভাবেই উৎসাহ না দেওয়া হয় ওকে কোনোভাবেই। ডাক্তারের কথামতো চলে লাভও হয়েছিল। আস্তে আস্তে ওই প্রসঙ্গ ভুলেই গেছিল হিয়া। কিন্তু না, আসলে ও ভোলেনি কিছুই। সেটা তো আজ বোঝা যাচ্ছে হাড়ে হাড়ে। হিয়ার মনের মধ্যে এই ধারণা বেঁচেই ছিল যে নিজের হাতে খুন করেছে ও প্রতীমকে। সেইজন্যই তো আজ হিয়ার মনের অবদমিত সেই ভাবনা চিন্তাগুলো জন্ম দিয়েছে হিয়ার এই অসুখের। ক্যাপগ্রাস ডিলিউশন।

—'দীপ্ত, ডক্টর মানসের সাথে কথা হয়েছে আমার। সত্যি আমার ভাবতে খুব খারাপ লাগছে যে হিয়ার আজ এই অবস্থা। আমার দিক থেকে সব রকম সহযোগিতার জন্য রেডি আমি। যদি আমি গিয়ে হিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে ওকে বোঝাই সবটা, যদি ও দেখে আমি সুস্থ হয়ে বেঁচে রয়েছি তাহলে নিশ্চয় ওর সব ভুল ধারণা কেটে যাবে। আমি বেঁচে থাকলে আমার আত্মা বা সেই আত্মার তোমার মধ্যে ভর করার পুরো ব্যাপারটাই তো বাতিল হয়ে যায় তাই না? নিশ্চয় ও সুস্থ হয়ে উঠবে তাহলে। বিশ্বাস কর দীপ্ত আমি আর নিশা যেমন সুখে ঘর করছি, আমি চাই তেমন ভাবে হিয়াও সুখী হোক তোমার সাথে।' এবার দীপ্তর হাত জড়িয়ে ধরল প্রতীম।

—'হিয়া ব্যানার্জীর হাজব্যান্ড কে আছেন?' নার্সের কণ্ঠস্বরে চমকে তাকাল দীপ্ত।

—'আমি। কেন কী হয়েছে?' একরাশ উদ্বেগ নিয়ে বলল দীপ্ত।

—'পেশেন্ট-এর অল্প সেন্স এসেছে। উনি খুঁজছেন স্বামীকে।'

দীপ্ত ধীর পায়ে এগিয়ে গেল নার্সের পিছু পিছু হিয়ার কেবিনে।

প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে হিয়া। বুকটা খুব জোরে জোরে ওঠানামা করছে ওর। ঠোঁট নড়ছে অল্প অল্প। কি যেন বলছে মেয়েটা বিড়বিড় করে। দীপ্ত শোনার চেষ্টা করল কি বলছে হিয়া।

—'দীপ্ত, দীপ্ত তুমি ফিরে এসেছ আমার কাছে! আমি জানতাম আমি পারব। আমাকে তো পারতেই হত বলো নিজের পুরোনো দীপ্তকে আবার নিজের কাছে ফিরিয়ে আনতে। সব বাধা আমাকে তো পার করতেই হত বলো। আবার আমরা একসাথে আনন্দে বাঁচব দীপ্ত। সেই পুরোনো দিনগুলোর মতো আবার খুব আনন্দে থাকব আমরা।'

দীপ্তর চোখ ভরে উঠল জলে। ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছে পুরোনো হিয়ার সেই হাসি মাখা উজ্জ্বল মুখটা। দীপ্তর চোখ বেয়ে একফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল হিয়ার চিবুকে। হিয়া টেরও পেল না। এবার হিয়ার কপালে পরম স্নেহে হাত রাখল দীপ্ত।

—'তুমি ঠিক বলেছ হিয়া আবার আমরা আগের মতো খুব আনন্দে বাঁচব। আর আমাকেও যে পারতেই হবে আমার পুরোনো হিয়াকে আবার ফিরিয়ে আনতে। তাই সব বাধা জয় করবই আমি। তোমাকে আমি সুস্থ করে তুলবই হিয়া।'

www.banglabookspdf.com

কেউ শুনতে পেল না দীপ্তর দৃঢ় অঙ্গীকারে উচচারিত শব্দগুলো। সাক্ষী থাকল শুধু আকাশ, বাতাস আর উপরের সেই লোকটা, যাকে এই পৃথিবীর মানুষ ভগবান নামে চেনে।

—

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

মলিন মর্ম মুছায়ে

১

সাজটা পুরো কমপ্লিট করে যখন গায়ে পারফিউম ছেটাতে যাবে মিতা ঠিক তখনই দরজায় ধাক্কা দিল মানু।

—'বউদি একজন লোক এসেছে দেখা করতে। দাদাবাবুকে খুঁজছে।'

বিরক্তিতে মুখটা কুঁচকে গেল মিতার। ঝাঁঝ মেরে বলল—

—'কে এল এখন? আর ওকে তুই ঢুকতেই বা দিলি কেন? জানিস না তোর দাদা শহরে নেই এখন? তা ছাড়া সোহম কি বাড়িতে যার তার সাথে দেখা করে নাকি? যা ভাগিয়ে দে।'

—'না মানে বউদি লোকটা বলছে ওকে নাকি তপনদা পাঠিয়েছে...।'

—'উফফফফ।'

বিরক্তিটা আরও বেড়ে গেল মিতার। একে তো ওর দেরি হয়ে যাচ্ছে বিশাখার ছেলের বার্থ ডে পার্টির জন্য। ড্রাইভার কতক্ষণ থেকে ওয়েট করছে, তাইতে উটকো ঝামেলা। আর মানুটাও হয়েছে তেমন। কোনো কাজ ঠিক ঠাক পারে না। অবশ্য লোকটা কে ওর মামাতো ভাসুর পাঠিয়েছেন যখন... কিন্তু বড়দা অফিসে না পাঠিয়ে বাড়িতে কেন লোক পাঠাবেন? আর সোহম তো ফোনে কিছু বলল না।

বসার ঘরে এসে লোকটাকে দেখল মিতা। আগন্তুক এর পরনে একটা ময়লা জামা, রোদে পোড়া গায়ের রং, লম্বা লোকটা বেশ সংকুচিত হয়েই বসে আছে।

ওকে দেখেই সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। গলা খাকরে বলল 'কেমন আছিস... মানে আছ?' চেহারার অনেক পরিবর্তন হলেও চিনতে অসুবিধা হল না মিতার। আর সাথে সাথে ওর বিরক্তি আর খারাপ লাগার অনুভূতিটা আরও শতগুণ বেড়ে গেল আর তার সাথে জড়ো হল একরাশ বিস্ময়। নিজের তিক্ত মনোভাব আর অবাক লাগাটা লোকাবার কোনো চেষ্টা না করে ও গলা ঝাড়ল—

—'তুমি? এখানে কি করতে? আর কেন-ই বা আর কীভাবে-ই বা...'

—'সব বলছি...' ওকে থামিয়ে দিল লোকটা।

—'তুই তো মানে তুমি তো খুব ভালো আছ দেখতেই পাচ্ছি। আমি বোধ হয় খুব অসময়ে এসে পড়লাম না?'

—'আমি এখন বেরোব। সোহম কলকাতার বাইরে গেছে। তপনদা পাঠিয়েছেন শুনে আমি শুধু কথা বলছি তোমার সাথে। যাই হোক সোহম পরের সপ্তাহে ফিরবে, তখন অফিসে চলে যেও।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে দিল মিতা।

www.banglabookspdf.com

—'আমার খুব বিপদ মিতা। প্লিজ দশ মিনিট সময় দাও আমায়। আর আজ আমি তোমার সাথেই দেখা করতে এসেছি, যদিও তোমায় দেখতে পাব কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত না হয়েই এসেছিলাম।'
—'তার মানে?' ভ্রু উঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল মিতা।

হায়ার সেকেন্ডারি তে রেজাল্ট খারাপ হয়নি। তাই সায়েন্স নিয়ে ভর্তি হয়েছিলাম। বছর খানেক যেতে না যেতেই বাবা চলে গেলেন। কোনোরকমে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করলাম। তারপর বিয়ে হল দাদার। অভাব তো ছিলই কিন্তু দাদার বিয়ের পর সব ছবি বদলে গেল। বউদি আমাদের সহ্য করতে পারে না। দাদা যেটুকু টাকা দিত তাও বন্ধ হল। তারপর একদিন আমার অনুপস্থিতে দাদা বউদি মা-কে মারধোর করে জোর করে বাড়িটা লিখিয়ে নিল। সেই থেকে আমি মা আর বোন একটা সস্তার ভাড়া বাড়িতে আছি। বাড়িওয়ালা লোকটা ভালো নয়। তাই বোনকে নিয়ে বড়ো ভয়ে থাকি। আমি টিউশন করে কোনোরকমে আমাদের খাওয়া জোগাড় করি। গ্র্যাজুয়েশনের রেজাল্ট ভালো হয়নি। চাকরি আর কে দেবে বল? বোনটার পড়াশোনাও ছাড়িয়ে দেব হায়ার সেকেন্ডারির পর। তবু যা হোক করে চালিয়ে নিতাম, কিন্তু গত মাসে মা এর ক্যান্সার ধরা পড়েছে।'

—'আর জিনিয়া?' লোকটার কথা মাঝপথে থামিয়ে বলে উঠল মিতা।

এবার খুব অদ্ভুত ভাবে হাসল লোকটা। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

—'জীবনটা যে রূপকথা নয় সেটা আমরা বড়ো হবার সাথে সাথে বুঝতে পারি। আর তখনই রূপকথার জল পরীরা হারিয়ে যায়। জিনিয়ার বিয়ে হয়ে গেছে। ও এখন মুম্বাইতে। তবে খুব অবুঝ ছিল মেয়েটা। বিয়ে ঠিক হবার পর আমায় বলেছিল ওকে নিয়ে পালিয়ে যেতে।' আবার অদ্ভুত ভাবে হাসল লোকটা।

—'এখানে কী মনে করে? তপনদা-কেই বা কীভাবে চেনা?' আরও রুক্ষ হল মিতার স্বর।

টেবিলে রাখা জলের গ্লাসটা থেকে এক চুমুক জল খেল লোকটা। তারপর বলল তপন স্যার এর বাচচাটাকে আমি পড়াতে যাই। সেখান থেকেই চেনা। আমার বিপদের কথা বলেছিলাম ওনাকেও। তাই গত মাসে উনি বললেন আমার ভাইয়ের একটা ছোটোখাটো কোম্পানি আছে। মোটামুটি ১০০ মতো লোক কাজ করে। ওখানে আমার নাম করে গিয়ে একদিন দেখা কর। হয়তো কোনো চাকরি জুটে যেতে পারে। সেটা শুনে পরদিনই যাই। কিন্তু লাভ হয়নি। সোহম স্যার আমায় স্পষ্ট করে হ্যাঁ বা না কিছুই বলেননি। শুধু বললেন মাস খানেক পর আবার এসে দেখা করবে। এখন ব্যস্ত আছি বলে আমায় ভাগিয়ে দিলেন প্রায়। আমি খুব নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছিলাম। তারপর ফেসবুকে সোহম স্যার এর প্রোফাইলে ডিজিট করে দেখলাম যে উনি তোমার হাজব্যান্ড তাই...।'

—'তো? আমি কী করব?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মিতা?

—'সব-ই তো শুনলে। প্লিজ আমায় একটু দয়া কর। তুমি সোহম স্যারকে বলে দিলেই হয়ে যাবে...।'

হয়তো আরও কিছু বলত লোকটা, কিন্তু তার আগেই বেজে উঠল মিতার মোবাইল। চাপা স্বরে দু-একটা কথা বলে ও বলল—

www.banglabookspdf.com

—'আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে। এবার আমি যাব। কথাটা বলেই হন হন করে বেড়িয়ে গেল অভিজাত বাড়ির দামি শাড়ি পরা বউটা।

মলিন জামা পড়া সংকুচিত চেহারার আগন্তুক প্রার্থীও বেরিয়ে পড়ল পিছু পিছু।

২

ভূগোল ক্লাস শেষের ঘণ্টা বাজার পর আর মিনিট পাঁচেক পড়ালেন বিমলাদি।

তারপর বেড়িয়ে গেলেন আর ওমনি কোয়েল এক খোঁচা মারল সুস্মিতাকে।

—'কিরে মিতা, ভূগোলের একটা লাইনও কি শুনলি নাকি সব গোল গোল হয়ে মিশে গেল তোর মনের আকাশে?'

—'শুধু কি ভূগোল? সব ক্লাসেই তো মিতা এখন আকাশে উড়ছে।' বলেই হি হি করে হেসে উঠল তনুজা।

—'থামবি তোরা?' ছদ্ম কোপে চোখ বড়ো বড়ো করল মিতা।

ওমনি দ্বিগুন হাসিতে ফেটে পড়ল কোয়েল, তনুজা আর নীহাররা।

এবার নিজেও হেসে ফেলল মিতা।

উফফফ! কী যে হয়েছে ওর কে জানে! নিজের মন নিজের বশেই থাকছে না আকাশকে দেখার পর থেকে। যদিও ও জানে যে এখন ক্লাস নাইন, মাধ্যমিক এসেই যাচ্ছে দেখতে দেখতে। তার মধ্যে মন বসাতে পা পারলে পড়ায়, চরম বাজে ব্যাপার হবে। কিন্তু মন তবুও মানছে না। বার বার মন শুধু আকাশ আকাশ করছে।

যদিও আকাশ এর সাথে ওর পরিচয় মাত্র মাস চার পাঁচ এর। প্রথম দেখা অঙ্ক কোচিং-এ। নাইনে ওঠার পরই বাবা ভর্তি করে দিয়েছিলেন এলাকার নামজাদা অঙ্ক স্যার অরূপ বাবুর কাছে। প্রথম দিন ওখানে গিয়েই ওর চোখ আটকে গেছিল একটা ছেলের দিকে। পাশে বসা আর একটা ছেলেকে কোনো অঙ্ক বোঝাচ্ছিল সে। বসা অবস্থাতেই বোঝা যাচ্ছে বেশ লম্বা সে। ফর্সা গায়ের রং আর লম্বাটে মুখে বুদ্ধির ছাপ।

প্রথম নজরেই ভালো লেগেছিল মিতার ছেলেটাকে।

তারপর সময়ের সাথে সাথে পরিচয়, তারপর আস্তে আস্তে বন্ধুত্ব হয় আকাশের সাথে। বেশ ভালো বন্ধুত্ব দানা বাঁধে আকাশ আর মিতার। এখন আর শুধু অঙ্ক নয়, বায়োলজি, ইংলিশ, ভূগোলও এক কোচিং-এ পড়ে ওরা।

সপ্তাহে পাঁচ দিন দেখা হয় আর বাকি যে দুটো দিন দেখা হয় না, সে দু-দিন যেন কেমন অস্থির লাগে ওর, কিছু ভালো লাগে না। আকাশ এখন ওর প্রতিটা ভাবনায় মিশে গেছে যেন। ও বোঝে আকাশও ওর প্রতি দুর্বল। এখন শুধু একটাই অপেক্ষা আকাশ এর প্রপোজ করার। মিতা মনে মনে কল্পনা করেই কেমন যেন পাগল পাগল হয়ে যায় আকাশ এর ওকে প্রপোজ করার সেই স্বপ্নিল মূহূর্তটা।

৩

www.banglabookspdf.com

কাল ভ্যালেন্টাইন ডে। আর আজ কিছু একটা এসপার ওসপার করতেই হবে ওকে। লাস্ট তিন চার মাসে কেমন যেন বদলে যাচ্ছে আকাশ। ওর সাথে আর আগের মতো প্রাণ খোলা হয়ে সহজ ভাবে মিশছে না। কেমন যেন এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে। মিতা ভালোই বুঝতে পারছে এর কারণটা। ওই জিনিয়া বলে মেয়েটাই এর কারণ। ইংলিশ কোচিং-এ প্রথম ওদের সাথে পরিচয় মেয়েটার। খুব সাধারণ চেহারা। মিতার মতো সুন্দরী তো নয়ই, মোটামুটি দেখতেও নয়। এমনিতে চুপচাপ থাকে তবে আকাশের সাথে খুব কথা বলার ঝোঁক। আকাশও যে কেন পাত্তা দিচ্ছে আজকাল ওকে কে জানে! মিতা খবর পেয়েছে ও আকাশ এর ফিজিক্স আর হিস্ট্রি কোচিং-এও পড়ে এখন। জিনিয়ার স্কুলের নিশা ওকে বলেছে আকাশকে নাকি কয়েক বার দেখা গেছে জিনিয়ার স্কুলের বাইরেও।

অনেক হয়েছে। আর নয়। আজ অরূপ স্যারের কোচিন শেষে ও তাই আসতে বলেছে আকাশ কে ওই খাল পাড়ের দিকের মাঠটায়। সন্ধ্যার পর জায়গাটা নির্জন থাকে। তাই...

মিতা আর তনুজা দাঁড়িয়ে ছিল। ওই তো আসছে আকাশ। ও কাছাকাছি এসে পড়তেই তনুজা চলে গেল।

—'বল কী বলবি? আর এরকম একটা জায়গায় আমায় ডেকে এনে কী কথা বলার থাকতে পারে তোর?'

—'তুই কি সত্যি জানিস না, কি বলতে চাই আমি? তুই কি সত্যি বুঝিস না যে তোকে আমি...'

—'প্লিজ আর বলিস না। আমি আন্দাজ করেছিলাম তুই হয়তো এরকম কিছু একটাই বলবি তাই আসতে চাইনি। তুই আমার খুব ভালো বন্ধু, কিন্তু ওই ধরনের কোনো নজরে আমি তোকে দেখিনি আর দেখতেও পারব না।'

—'মানে?'

—'মানেটা খুব সোজা মিতা। আমি জিনিয়াকে পছন্দ করি। দিন কয়েক আগে আমি ওকে কমিট করেছি।'

—'জিনিয়া! জিনিয়ার মতো একটা মেয়ের জন্য তুই আমায় প্রত্যাখ্যান করছিস? কি আছে ওর? না আছে রূপ আর না আছে গুন।'

—'একদম চুপ।'

গর্জে উঠল আকাশ। তারপর কয়েক মুহূর্ত থেমে একটু গলা নরম করে বলল—

—'তুই খুব ভালো মেয়ে মিতা। এভাবে নিজেকে নীচে নামাস না প্লিজ।'

মিতার সামনে পুরো পৃথিবীটা দুলে উঠল যেন হঠাৎ করে যেন। যা ঘটছে, যা শুনছে তার কিছুই যেন ও বিশ্বাস করতে পারছে না। মেনে নিতেই পারছে না কোনোভাবে।

কোনো কিছু না ভেবে আকাশকে হুট করে দু-হাতে জড়িয়ে ধরল ও। জোর করে নিজের ঠোঁট ঘষে দিতে চাইল আকাশ এর ঠোঁটে।

'ছাড়... ছাড় বলছি আমায়...'

www.banglabookspdf.com

এক ধাক্কায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিল আকাশ। ঘৃণা ভরা একটা চাহনি মিতার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে হন হন করে বেরিয়ে গেল নির্জন মাঠটা থেকে।

বসন্তের সন্ধ্যায় পাক খেতে থাকল একটা তিতকুটে নীলচে বাতাস।

৪

মাঘ মাসের শেষ। ঠাণ্ডাটা যাব যাব করেও যায়নি পুরোটা। তবুও অল্প অল্প ঘাম হচ্ছিল মিতার। এসিটা চালিয়ে দিল ও। ঘড়ি বলছে রাত দুটো। কিন্তু ঘুম আসছে না মিতার চোখে। বারবার ফ্ল্যাশব্যাকের মতো সামনে চলে আসছে পুরোনো কিছু স্মৃতি। অপমানে ঢাকা এরকমই একটা বসন্তের সন্ধ্যা। সেই অপমানের সন্ধ্যাটা মিতাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত বহু দিন। আকাশ সেই ঘটনার মাস দুয়েকের মধ্যে ছেড়ে দেয় ওদের সব কটা কমন কোচিং। সেই অপমানের পর মিতাও আর কক্ষনো কথা বলেনি আকাশের সাথে। আকাশ ওর জীবন থেকে হারিয়ে যাবার পরও ভুলতে পারেনি সেই অপমানের জ্বালা। প্রতি মুহূর্তে মনে হত যদি একটা, শুধু একটা সুযোগ পেত ও ওই অপমানের প্রতিশোধ নেবার। কিন্তু সেটা যে চরম অবাস্তব একটা ভাবনা তা বুঝতে বুঝতে মিতার লেগে গেছিল অনেকগুলো বছর।

কিন্তু গতকাল কী হল? হঠাৎ আকাশকে আচমকা এত বছর পর নিজের সাম্রাজ্যতে দেখে আবার তাজা হয়ে উঠল ওর সব পুরোনো ক্ষত। ওর ক্ষয়ে যাওয়া প্রতিশোধের ভাবনাটা আবার বেঁচে উঠেছে একটু একটু করে। চাকরি নেই ছেলেটার। দীনহীন অবস্থা। এই অবস্থায় আশার আলো হিসেবে সে দেখছে তপন দার সুপারিশ করা সোহমের কোম্পানির চাকরিটা। ওর আশার আলো এক ফুঁতে আজ নিভিয়ে দিতে পারে মিতা।

কিন্তু কার ওপর নেবে প্রতিশোধ? ওই জীর্ণ, জীবন যুদ্ধে নুব্জ লোকটার ওপর? আর তা ছাড়া আজ ওর প্রতিশোধ তো শুধু আকাশকে ডোবাবে তা নয়, আরও অন্ধকারে ঠেলে দেবে আকাশের বোন আর ওর মা-এর জীবনও। ওরা তো একেবারেই নিরপরাধ। এটা কি তবে পাপ হবে না মিতার? আজ সব আছে ওর, কি তুলনা আজ ওর আর আকাশের। তবে আর কীসের প্রতিশোধ! কিন্তু ওর অপমান মিতার জীবনে ক্ষতি করেছিল অনেক। মাধ্যমিকের খারাপ রেজাল্ট, ভালো স্কুলে তারপর চান্স না পাওয়া বড়ো ক্ষতি নয় এগুলো? না কিচ্ছু মাথায় আসছে না ওর। কান মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। ভেবেই চলেছে মিতা উথাল পাথাল। কিচিমিচি শুরু হচ্ছে জানলার ওপারের পৃথিবীতে। রাতও ফুরিয়ে আসছে জানান দিচ্ছে পাখির ডাক।

৫

ডিনার টেবিলে খাবার বাড়ছিল মিতা। কাল ফিরেছে সোহম। আজ একটু অন্যমনস্কও। পাতে চিকেন কারি মিতা ঢেলে দিতেই যেন চমক ভাঙল সোহম এর। গলা ঝাড়ল—

—'আচ্ছা আকাশ রায় নামে কি ছোটোবেলায় কোনো বন্ধু ছিল তোমার?'

—'মানে? কেন?' আমতা আমতা মিতার স্বর।

www.banglabookspdf.com

—'আরে লোকটা তপনদা-র রেফারেন্স নিয়ে এসেছিল চাকরির জন্য আমার কাছে। আমার একদম ঠিকঠাক লাগেনি। কিন্তু খুব নাছোড়বান্দা। আমি ওকে ভাগিয়েই দিয়েছিলাম। তাও আজ আবার এসেছিল। বলে তুমি নাকি ওর ছোটোবেলার বন্ধু। বাড়িতেও নাকি এসেছিল একদিন। তুমি নাকি ওকে বলেছ দেখবে ওর ব্যাপারটা। তুমি তো আগে জানাওনি আমায় তাই আমি... তা তুমি চাইলে আমি ছোটো খাটো কোনো একটা চাকরি দিয়ে দিতে পারি ওকে...।'

কথা শেষ হল না সোহমের। তার আগেই বেজে উঠল মোবাইল ফোন।

—'বলুন মি. দাশ...' টেবিল ছেড়ে উঠে গেল সোহম।

শরীরে একটা কাঁপুনি লাগল মিতার। হঠাৎ খুব শীত করল যেন। আচমকাই ঝন ঝন শব্দে হাত ফস্কে পড়ে গেল পোর্সিলিন এর দামি গ্লাসটা। মেঝেতে এলোমেলো ছড়িয়ে গেল একরাশ ভাঙা কাচের টুকরো।

চেয়ার ছেড়ে উঠল মিতা ধীরে ধীরে। পা দুটো হঠাৎ কাঁপছে খুব। ছড়িয়ে থাকা কাঁচের টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিতে গিয়েই চমকে উঠল মিতা। যেন হাই ভোল্টেজ শক ধাক্কা দিল ওকে। ছড়িয়ে পড়া ভাঙা কাঁচের টুকরোগুলোর প্রতিটা থেকে বিচ্ছুরিত এক একটা আলাদা আলাদা দৃশ্য।

বারো বছর আগের মিতা, আর অপমানে কুঁচকে যাওয়া মুখের সেই মেয়েটার ছবি ফুটে উঠেছে একটা টুকরোয়। ঠিক তার পাশের টুকরোতেই আবার অন্য ছবি। জিনিয়া আর সেই পুরোনো দিনের আকাশের একটা ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত। জীবন সংগ্রামে বিধ্বস্ত আকাশ আর তার অসুস্থ অসহায় বৃদ্ধা মা জেগে রয়েছে অপর আর এক টুকরোয়। উফফফ! কী করুন ওই বয়স্কা মানুষটার চোখ দুটো। একটা সুস্থ জীবন পাবার অনাবিল আকুতি ঝরে পড়েছে ওই দু-চোখ থেকে। অনেক আশা নিয়ে শুধু মিতার দিকেই যেন তাকিয়ে আছে ওই দুটো চোখ।

—'কী হল মিতা? এ বাবা! গ্লাসটা ভাঙলো কী করে? আরে! তুমি তুলছো কেন? মানুকে ডাক। ওই পরিষ্কার করে দেবে।' ফোনে কথা সেরে আবার ডিনার টেবিলে ফিরে এসেছে সোহম।

—'হ্যাঁ মানে না...' কেমন যেন থতমত খাচ্ছে মিতা।

—'মানু... কাঁচগুলো তুলে নিয়ে যা তো।' হাঁক ছাড়ল জোরে ও। গুটি গুটি পায়ে উঠে আবার বসলো ডিনার টেবিলে।

—'তা যেটা বলছিলাম, ওই আকাশ রায়ের কেসটা কী বল তো? তুমি কি সত্যি চাও যে ওকে কোনো কাজ দিই আমি?' জিজ্ঞাসু দুটো চোখ মেলে বউয়ের দিকেই তাকিয়ে আছে সোহম।

বুকের ভিতর কেউ যেন হাতুড়ি পিটাচ্ছে মিতার। উফফফ ভগবান! এ কেমন মুহূর্ত! তবে কি সত্যি এবার মিতাকে দিতেই হবে কোনো একটা রায়!

না মিতা পিশাচ নয় যে নিষ্ঠুর দানবের মতো কেড়ে নেবে একজন অসহায় মানুষের এক টুকরো বাঁচার আশা। শুধু অতীতের কয়েকটা কথা ভেবে অনেকগুলো অসহায় মানুষকে এক ধাক্কায় এভাবে আরও বেশি অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া কি আদৌ উচিত হবে?

www.banglabookspdf.com

তবে এটাও তো ঠিক যে মিতা কোনো ভগবান নয়। ও একজন রক্ত মাংসের সাধারণ মানুষ। আর সব মানুষই চায় নিজের অপমান আর অসম্মান এর বদলা নিতে। মিতাও তাই চেয়ে এসেছে এতদিন। আর আজ অপ্রত্যাশিত ভাবে পরিস্থিতি ওকে দিয়েছে সেই সুযোগ। এই সুবর্ণ সুযোগ হারানোটা কি আদৌ বোকামো হবে না? জীবন তো আর বারবার সুযোগ দেয় না। না আর ভাবতে পারছে না মিতা। মাথাটা বনবন ঘুরছে ওর প্রচন্ড বমি পাচ্ছে। নিঃশ্বাসটা বন্ধ হয়ে আসছে...

—'সোহম!' অস্ফুটে একটা গোঙানি শুধু বেরিয়ে এলো ওর মুখ থেকে।

—'মিতা, এই কী হয়েছে তোমার?' সোহম ছুটে আসছে ওর দিকে।

একচাপ কালো অন্ধকার নেমে আসছে মিতার চোখের সামনে। মিতা বুঝতে পারছে, জ্ঞান হারাচ্ছে ও।

৬

—'বউদি... বউদি... তুমি কি ঘুমাচ্ছ?'

মানুর ডাকে ঘুমটা ভাঙল মিতার।

—'ডাকছিস কেন? বিকেল হয়ে গেছে বুঝি?' জড়ানো গলায় বলল ও।

—'হ্যাঁ গো দুপুর গড়িয়ে তো বিকেল হয়ে গেছে। তাই তো ডাকছি তোমায়। ফলের রস করে এনেছি, খেয়ে নাও।'

—'দূর আমার ইচ্ছে করছে না।' নাক কুঁচকে বলল মিতা।

—'তা বললে হবে নাকি? দাদা খুব রাগ করবে কিন্তু। এই আমি রেখে গেলুম, তুমি খেয়ে নিও।' জোর করে গ্লাসটা রেখে গেল মানু।

উফফ! এই হয়েছে জ্বালা এখন মিতার। যবে থেকে জানাজানি হয়েছে যে সন্তান আসছে ওদের, তবে থেকেই সোহম পাগল করে দিচ্ছে ওকে ফল, ফলের রস, হেলথ ড্রিংক এসব খাইয়ে। মিতার পাগলের মতো এখন খেয়াল করছে সোহম।

ঢক করে রসটুকু শেষ করা মাত্রই বেজে উঠল মিতার মোবাইল। স্ক্রিনে ভাসছে অচেনা নম্বর।

—'হ্যালো...' ফোন কানে চেপে বলল মিতা।

—'মিতা, আমি আকাশ বলছি...'

আরে! আবার কী চায় ও? একটু বিব্রত হল মিতা।

হ্যাঁ আকাশ এখন সোহমের কোম্পানিতেই চাকরি করে ছোটো একটা পোস্টে।

প্রতিশোধ আর মানবিকতার দোলাচলে মানবিকতা জিতেছিল শেষমেশ।

মিতাই বলেছিল সোহমকে—

—'হ্যাঁ সোহম আকাশ আর আমি স্কুল জীবনে একসাথে কোচিং-এ পড়তাম। ও এখন খুব বিপদের মধ্যে আছে শুনেছি। ওপেনিং থাকলে ওকে দিও কোনো ছোটো খাটো কাজ। ছেলেটা ভালো।'

—'হ্যালো মিতা, শুনতে পাচ্ছ?' মিতার নীরবতায় একটু অধৈর্য হয়েছে বোধ হয় আকাশ।

www.banglabookspdf.com

—'তুমি আমার মোবাইল নম্বর কোথায় পেলে?' গম্ভীর গলায় বলল মিতা।

—'শিউলির থেকে পেয়েছি। কোচিং-এ সেই যে আমাদের কমন ফ্রেন্ড ছিল'... একটু থতমত খেয়ে বলল আকাশ।

—'ফোন করেছ কেন?' আবার গম্ভীর গলা মিতার।

—'আসলে আজ আমার চাকরির তিন মাস পূর্ণ হল। আমি কনফার্মেশন পেয়ে গেলাম। আর আজকের এই দিনটা তো শুধু তোমার জন্যই আমি দেখতে পেয়েছি মিতা। তুমি যদি আমায় দয়া না করতে তবে আমার কোনোদিন এ চাকরি হত না আমি জানি। আমি মায়ের চিকিৎসাও করতে পারতাম না। তোমার কাছে যে ঋণের আমার শেষ রইলো না।' বড্ড আর্দ্র শোনাচ্ছে স্বর আকাশের।

—'এসব কথা ছাড়। তুমি মন দিয়ে কাজ করো।'

—'সে তো করবোই। তবে তোমায় ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার আজ সত্যি নেই। তোমাকেও অনেক অভিনন্দন। শুনলাম নতুন অতিথি আসছে। সেদিন সোহম স্যার অফিসের সবাইকে মিষ্টি খাওয়ালেন।'

—'হুমমম।' ছোটো করে বলল মিতা।

—'যদিও জানি আমি খুব তুচ্ছ মানুষ, তবুও বলছি আমার অনেক আশীর্বাদ আর ভালোবাসা রইলো মিতা নতুন মানুষটার জন্য। আমি জানি ও অনেক বড়ো হবে, জগৎ জোড়া নাম হবে ওর।

—'থ্যাংকস। তুমিও ভালো থেকো। আর প্লিজ আমায় এভাবে আর কখনো ফোন কোরো না। আশা করি বোঝাতে পারলাম।' একটু ভারী চালে বলল মিতা।

—'বেশ তাই হবে। ভালো থেকো।' বলে ফোন কেটে দিল আকাশ।

না আজ আর কোনো রাগ নেই মিতার আকাশের প্রতি। আকাশ ভালো থাকুক, শান্তিতে থাকুক এটাই আজ চায় ও। একটু আগে আকাশের সাথে কথা বলে মনে হল ভালোই আছে ও এখন আগের থেকে।

বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত শান্তি আজ টের পাচ্ছে মিতা। প্রতিশোধ নিয়ে যে আরামটা ও একদিন পাবে বলে ভেবেছিল, আজকের শান্তি আর ভালো লাগাটা তার থেকে অনেক অনেক গভীর।

না প্রতিশোধের বিষ নয়, মনুষ্যত্বের উষ্ণতাটাই একমাত্র নেভাতে পারে বুকের আগুন এটা আজ জীবন থেকে শিখেছে ও আর এই শিক্ষাটাই ও দেবে ওর আসন্ন সন্তানকেও।

ছেলে বা মেয়ে যাই হোক, মিতা তাকে তৈরি করবে একজন ক্ষমাশীল আর মানবিক মানুষ। কারণ প্রতিহিংসার আগুনকে জয় করে মানবিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়াতেই যে আসলে লুকিয়ে থাকে সত্যিকারের বিজয়ের সুখ।

—

www.banglabookspdf.com

বন্ধ দরজার ওপারে

অনেকদিনের আগে

বৃষ্টি ঝরানো একটা রাত। চারদিকে ব্যাঙ-এর ডাকে কান পাতাই দায়। আর তার মধ্যে গোটা গ্রাম জুড়ে চলছে লোডশেডিং। সময়টা প্রায় চল্লিশ বছর আগে। তাই সে সময়কার শহরতলি আজকের মতো এত উন্নতও ছিল না। সব মিলিয়ে একটা মারাত্মক দুর্যোগের রাত। এরকমই এক শহরতলির মেয়ে মৌ। সেই দুর্যোগের রাতে কেমন জ্বলন্ত চোখে সে বসে রয়েছে নিজের ঘরে। একটা মোমবাতির শিখার ক্ষীণ আলো সারা ঘরময় দোল খেয়ে বেড়াচ্ছে। মৌ একমনে নিবিড় ভাবে কী যেন ভেবেই চলেছে। আর আগুন ঠিকরে বেড়াচ্ছে তার দু-চোখের তারা থেকে। হঠাৎ কী যেন একটা হল। মেয়েটার দু-চোখের সেই আগুন নিভে একরাশ মেঘ এসে ভিড় করল সেখানে। আর শুরু হল দু-চোখের বৃষ্টি। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একলা শূন্য ঘরে কাঁদছে মৌ। ঢং ঢং করে বারোটা বাজল বড়োলোক বাড়ির গ্র্যান্ড ফাদার ক্লকটায়।

হঠাৎ ঘরের দরজা খুলে ঢুকে এল ভিতরে আর একজন। একটু সংকুচিত তার ভাব। পরনের কাপড়ও তুলনামূলক মলিন। তবে বেশ সুন্দরী সে।

—'আমায় এভাবে হঠাৎ কেন ডাকলি? আমি জানি আমি তোর অপরাধী। কিন্তু বিশ্বাস কর আমি কিছু জেনে বুঝে করিনি। যা হয়েছে তার সবটাই...'

—'চুপ কর রে মিনু। আর আমায় দোষী করিস না।' এবার ওই মেয়েটাকে থামিয়ে কেঁদে ফেলল মৌ।

—'যা যা অন্যায় আমি করে গেছি এতদিন ধরে তোর ওপর তা মহাপাপ আমি বুঝে গেছি। আমি আমার সবটুকু ভুল বুঝতে পেরেছি। আমায় তুই ক্ষমা কর। তুই ভাগ্যবতী তাই তুই...। আমি কে বলতো এসবের মাঝে আসার! কাল তুই কোথাও যাবি না এ বাড়ি ছেড়ে। কথা দে আমায়।' মলিন বসনা মেয়েটার হাত ধরে শিশুর মতো কাঁদছে এবার মৌ।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেছে মেয়েটা। নিজেকে অল্প সামলে নিয়ে বলল— 'না রে আর আমায় আটকাস না। যেতে দে রে আমায়।'

—'না না না। তুই যেতে পারবি না মিনু। যেতে দেবো না। আর যদি তুই সত্যি আমায় ক্ষমা না করে চলে যাস তাহলে আত্মহত্যা করব আমি। শেষ করে দেব নিজেকে।'

—'মৌ! এসব কি বলছিস তুই! ঠিক আছে। ঠিক আছে। তুই শান্ত হ। আমি যাব না। কোথাও যাব না।'

—'তুই বল তবে আমায় ক্ষমা করেছিস!' ভাঙা গলায় বলল মৌ।

www.banglabookspdf.com

—'হ্যাঁরে করেছি। অনেক আগেই করেছি।'

—'তাহলে আমার হাতে বানানো এই পায়েস খা। কালই তো তোর জন্মদিন। নিজে হাতে বানিয়েছি আমি। তুই যদি মন থেকে আমায় ক্ষমা করে থাকিস তবেই খাবি। নইলে নয়।' কান্নাভেজা গলা তখনও মৌয়ের।

পায়েসের বাটিতে চুমুক দিল মেয়েটা। মৌয়ের মুখে ফুটে উঠল একটা তৃপ্তির হাসি। ও জড়িয়ে ধরল মেয়েটাকে।

—'তোকে আমি খুব ভালোবাসি রে। সবার থেকে বেশি। তুই ছাড়া কে আর আমায় আপন করেছে বল তো! তোর সব ভালোবাসার প্রতিদান আমি দিতে পারব কিনা জানি না, কিন্তু তোকে কোনোদিন ছেড়ে যাব না। বারবার তোর কাছেই ফিরে ফিরে আসব রে।' মেয়েটা মৌয়ের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল।

পরম শান্তিতে মৌ দু-চোখ বন্ধ করল এবার।

১

ইদানীং শরীরটা একদম ভালো যাচ্ছে না মৃত্তিকা চৌধুরীর। তবুও আসব না আসব না করে শেষ পর্যন্ত চলেই এলেন এখানে। না সাধু সন্ন্যাসী বা এই সব 'বাবা'দের প্রতি কোনোদিনই তেমন আস্থা নেই মৃত্তিকার। সারাজীবন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করার পর এসব তো নিশ্চয় উনি মানতে পারেন না, কিন্তু আজ কতকটা শিখা মানে নিজের ছোটো ননদের মন রাখতেই এখানে এসেছেন। শিখার গুরুদেব এসেছেন। উনি এবার শিখার বাড়িতেই উঠছেন। তার নাকি অসীম ক্ষমতা। মানুষের চোখ আর হাতের রেখা দেখেই বলে দিতে পারেন সব অতীত আর ভবিষ্যৎ। না সেই ক্ষমতাবান পুরুষের দর্শন পাবার ইচ্ছা ছিল না মৃত্তিকার। কিন্তু শিখা যখন ফোন করে বারবার জোর করতে লাগল এখানে আসার জন্য গুরুদেবের সাথে দেখা করতে, তখন আর না টা বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারলেন না মৃত্তিকা। আসলে সেই বহুদিন আগেই যখন বিয়ে হয়ে প্রথম নতুন পরিবারে এসেছিলেন মৃত্তিকা, তখন থেকেই শিখা কখন যেন বড্ড নিজের হয়ে গেছিল। তা ছাড়া এই বছর দুয়েক আগে যখন মারা গেলেন মিস্টার চৌধুরী তবে থেকে যেন একটু একটু করে মানসিক ভাবেও দুর্বল হয়ে পড়ছেন মৃত্তিকা চৌধুরী। আর গত দু-মাস ধরে যেটা তার সাথে হচ্ছে সেটা কাকেই বা বোঝাবেন তিনি! দিন নেই, রাত নেই যখনি দু-চোখের পাতা এক হচ্ছে, ব্যস সেই একই স্বপ্ন। গলা কেটে কে যেন খুন করছে দুঁদে অধ্যাপিকা মৃত্তিকা চৌধুরীকে। না মুখ দেখা যাচ্ছে না তার, শুধু দেখা যাচ্ছে পরনে তার ফুল ছাপা ফ্রক। এই স্বপ্নটা যখন আসে তখন দমটা কেমন যেন বন্ধ হয়ে আসে মৃত্তিকার, স্বপ্নের মধ্যেই যখন অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ী গলায় ছুরি বসায় তার, কেমন ধারালো যন্ত্রণায় যেন বিদ্ধ হয়ে ওঠে ওর শরীর। ফাঁকা বাড়িটায় সারাক্ষণ কে যেন একটা অদৃশ্য চোখ দিয়ে জরিপ করে মৃত্তিকাকে। হাওয়া যেন ফিসফিসিয়ে বলে কানে কানে— 'মৃত্তিকা এবার যে সময় হয়ে এল রে তোর। এবার যে দরজাটা খুলে যাবে।'

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

—'বউদি চল একবার গুরুদেবকে প্রণাম করে আসবে।' শিখার ডাকে বিছানা ছেড়ে উঠে গেলে ওর গুরুদেবের ঘরে। খুব সাধারণ চেহারার একজন ভদ্রলোক। সাদা পোশাক পরা। বেশ শান্ত আর সৌম্য চেহারা। তবে মৃত্তিকার দিকে চোখ পড়তেই কেমন যেন হঠাৎ চঞ্চল হয়ে গেল ওনার দৃষ্টি।

—'শিখা বেটি... ইনকো কউন লায়া রে?' বজ্র কঠিন স্বরে এবার প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন ভদ্রলোক।

—'বাবা, ইনি আমার বউদি। খুব ভালো মানুষ। আপনাকে প্রনাম করতে...'

—'কউন ভালা হ্যায়, কউন বুরা হ্যায় ইসকা বিচার ভগওয়ান করতে হ্যায়। ইনসান নেহি। তু ইনকো ইসহি ওয়াক্ত লে যা মেরা সামনে সে।'

—'কিন্তু বাবা...'

'বোল দিয়া না ম্যায়নে'... শিখাকে থামিয়ে এবার হুংকার করে উঠলেন ওর গুরুদেব। আর সাথে মৃত্তিকার দিকে ছুঁড়ে দিলেন একদলা ঘৃণাভরা দৃষ্টি।

এবার নিদারুন অপমান লাগল মৃত্তিকার। দীর্ঘদিন সম্মানের সাথে অধ্যাপনা করে এসেছেন উনি। কেউ কোনোদিন সামনে অসম্মান করতে সাহস পায়নি। আর সেখানে কিনা কোথাকার একটা বুড়ো...

—'আপনি আমার সম্বন্ধে এভাবে কথা বলছেন কেন? আমাকে আপনার অপছন্দ হতেই পারে, তার মানে এই নয় যে আপনি আমায় অসম্মান করবেন। শুনুন, আপনাদের মতো লোকদের প্রতি আমারও কোনো ভরসা নেই। নেহাতই শিখার কথায়... শুনুন আমি কে, আর কি আমার সামাজিক পরিচয় সেটা সম্বন্ধে কি আদৌ কোনো ধারণা করার ক্ষমতা আছে আপনার? না নেই। আর সেই জন্যই এভাবে আমার সম্বন্ধে কথা বলার সাহস পাচ্ছেন আপনি।' এক নিঃশ্বাসে ইস্পাতের মতো দৃঢ় স্বরে কথাগুলো বলে গেলেন মৃত্তিকা। এদিকে শিখার মুখে ততক্ষণে ফুটে উঠেছে তীব্র কাঁচু মাচু ভাব। মৃত্তিকার ধারালো কথাগুলোর তক্ষুনি কোনো উত্তর দিলেন না গুরুদেব। কয়েক মুহূর্ত ঠান্ডা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মৃত্তিকার দিকে। তারপর খুব আস্তে আস্তে কেটে কেটে বললেন— 'বহত গুরুর হ্যায় না তুঝে আপনে আপ পে...। করলে... থোরি দিন আউর করলে তেরা ইয়ে ঝুটা ঘমন্ড...। লেকিন আউর জাদা দিন নেহি চলেগা ইয়ে... কিউকি উয়ও আ গেয়ি। আ গেয়ি উয়ও। আব সারি বন্ধ দরওয়াজা খুল জায়েগা, খুল জায়েগা...।

পলকে মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল মৃত্তিকা চৌধুরীর। কে এই গুরুদেব? কি বলছেন উনি এসব? ঠিক সেই মুহূর্তেই ঝপ করে নিভে গেল ঘরের আলোটা।

—'এই রে! আবার লোডশেডিং। আমি এখুনি নিয়ে আসছি একটা বাতি।' শিখার গলা শুনতে পেলেন মৃত্তিকা। শিখা বেরিয়ে যেতেই উনি নিজেও ওই ঘরটা ছেড়ে বেরোবার জন্য পা বাড়ালেন। কিন্তু ঠিক তখনি অন্ধকার জমাট বাঁধা সন্ধ্যাটা কাঁপিয়ে কর্কশ স্বরে বাজ পড়ল কোথাও আর হুড়মুড় করে খোলা জানালার কপাট দিয়ে ঢুকে এল একটা পাগলাটে ক্ষ্যাপা বাতাস। সেই বাতাসটাই যেন কানে কানে বলল মৃত্তিকাকে।

—'আমি এসে গেছি রে। ফিরে এসেছি আমি আবার তোর কাছে। বন্ধ দরজার ওপারে থাকা সব অন্ধকার যে এবার আমার মতো তোরও হবে।'

www.banglabookspdf.com

'না না না'... চিৎকার করতে চাইলেন মৃত্তিকা। কিন্তু গলাটা আটকে এল তার। বুঝতে পারলেন তিনি যে অন্ধকারটা আরও গাঢ় হচ্ছে। ক্রমশ আরও গাঢ় হচ্ছে।

২

না, অন্ধকারটা সত্যি আরও যেন বড়ো বেশি নিকষ কালো লাগছে। এত বেশি গাঢ় লাগছে যে মনে হচ্ছে যেন হিংস্র নখ বের করে আঁচড়ে দেবে এক্ষনি এই অন্ধকারটা। উফফ! আবার আজও লোডশেডিং। না, মৃত্তিকার আজ রাতেও ঘুম আসছে না। এই নিয়ে দিন সাতেক হল মেয়ের বাড়িতে এসে রয়েছেন উনি, কিন্তু না। নিজের মানসিক অস্থিরতা কমার বদলে দিনে দিনে শুধু বেড়েই চলেছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে এখানে থাকতে এসে কি তাহলে মস্ত বড়ো ভুল হয়ে গেল! কিন্তু না। তাই বা বলা চলে কি করে। মা হিসাবেও তো মৃত্তিকার একটা দায়িত্ব আছে। আজ প্রায় সাত বছর পর বিদেশ থেকে দেশে ফিরেছে রত্না আর জামাই। আর তারা যখন বারবার করে এত অনুরোধ উপরোধ করছে এখানে এসে কটা দিন থেকে যাবার জন্য তখন মৃত্তিকার পক্ষে কি আর বারবার না বলা সম্ভব। তা ছাড়া মৃত্তিকার একা একা ও বাড়িতে থাকতে বেশ কিছুদিন যাবত কি ভীষণ অসুবিধা যে হচ্ছিল সেটা তো আর ভোলার নয়। সবচেয়ে বড়ো কথা হল জেরি মানে রত্নার মেয়ের শরীর এখনও একদম ঠিক নেই। তাই এ অবস্থায় কীভাবেই বা মৃত্তিকা ওদের এড়িয়ে যেতে পারতেন! ওদের আর কেই বা আছে এই দুনিয়ায়। জামাইয়ের তো আর বাবা মা নেই। তাই এখন মৃত্তিকার দায়িত্ব তো অনেকটাই বেশি। কিন্তু সমস্যাটা তো অন্য জায়গায়। প্রথম যখন রত্না জানাল যে ওরা যে নতুন ফ্ল্যাটটা কিনে আসছে সেটা বারাসাতের দিকে তখনই বুকের ভিতরটা অল্প কেঁপে উঠেছিল মৃত্তিকার। সেই এলাকা! আর কেন যেন মনে পড়ে গেছিল প্রায় সাত বছর আগে লাস্ট এয়ারপোর্টে দেখা জেরির মুখটা। ওর সেই জ্বলন্ত দৃষ্টিটা। জেরি জন্মেছিল ১০ আগস্ট। ঠিক সেই তারিখ। অথচ রত্নার ডেলিভারি ডেট কিন্তু ছিল সেপ্টেম্বরে। তবুও যখন জেরি বেছে বেছে ১০ আগস্টই জন্ম নিল তখন বিজ্ঞানের অধ্যাপিকা হওয়ার পরেও কি সব আজগুবি ভাবনা যেন সেদিন ভর করেছিল মৃত্তিকাকে। কড়া শাসনে তাদের দমন করেছিলেন সেদিন। কিন্তু কিছু ঘটনা তার শাসনের শৃঙ্খলকে দুর্বল করে দিত বারবার। জেরি অন্য বাচচাদের মতো নয়। সে বেশি কাঁদে না। বেশি খায়ও না। আর সবচেয়ে বড়ো কথা হল মৃত্তিকা যখনই কোলে নিতেন নিজের একমাত্র নাতনিকে তখনই কি সাংঘাতিক চিৎকার করে কাঁদত জেরি। যেন কি এক অজানা আতঙ্ক গ্রাস করছে ওকে। জেরি যত বড়ো হতে থাকল তত নিজের দিদিমার প্রতি তার বিরাগ প্রদর্শন যেন বাড়তে লাগল। আর যখন ঘরে কেউ থাকত না, যখন মৃত্তিকা একলা কোনো সময়ে আদর করতে যেতেন জেরিকে ও যেন কি ভীষণ জ্বলন্ত চোখে দেখত মৃত্তিকার দিকে। অত ছোটো শিশুর পক্ষে ওভাবে তাকানো যে অসম্ভব তা তো জানাই মৃত্তিকার। তবে ও কি চোখের ভুল? তাই হবে নিশ্চয় এই বলেই নিজের মনকে বোঝাতেন উনি। কারণ জেরির ওই খর দৃষ্টি ঘরে অন্য কেউ ঢুকলেই তো গায়েব হয়ে যেত। তবে দিন যাবার সাথে সাথে রত্নারাও বুঝতে পারছিল যে জেরি ঠিক স্বাভাবিক নয়। ও অসংলগ্ন কথা বলে, ব্যবহার করে। তবে ওর এক অদ্ভুত প্রতিভা ছিল। ওই বয়সেই নিদারুণ ছবি আঁকত মেয়েটা। রত্নারা বলত

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

এটাও অস্বাভাবিক। কী সব মাথা মুণ্ডুহীন ঘর বাড়ি আর মানুষ আঁকে জেরি। কিন্তু মৃত্তিকার কেন যেন খুব চেনা চেনা লাগত জেরির সব ছবিগুলোকে। খুব চেনা চেনা। জেরির স্বাভাবিক হবার লক্ষণ খুব একটা দেখা যাচ্ছিল না। সেই সময়েই রত্না আর মানস বিদেশ পাড়ি দেয় ওকে নিয়ে। মাঝে আর বিশেষ আসেওনি ওরা। কিন্তু আজ যখন সাত বছর পর ফিরল ওরা জেরি তো কিচ্ছু বদলায়নি। উল্টে মৃত্তিকার প্রতি ওর সেই জ্বলন্ত দৃষ্টির ধার যেন আরও বেড়েছে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে এসব ভাবতে ভাবতে চোখটা অল্প ঘুমে জড়িয়ে এসেছিল মৃত্তিকার। ঠিক তখনই খুট করে একটা শব্দ হল। খুব কাছেই যেন। চোখ মেললেন মৃত্তিকা। ওর ঘরে কেউ ঢুকেছে। কিন্তু সেটা কী করেই বা সম্ভব। দরজা তো নিজের হাতে বন্ধ করে শুয়েছেন মৃত্তিকা। ঘরে ঢোকা ব্যক্তি এবার আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে মৃত্তিকার দিকে। ঘরের ঘোলাটে অন্ধকারে তার মুখ দেখতে পাচ্ছেন না মৃত্তিকা। সে চকিতে এগিয়ে এল মৃত্তিকার খাটের কাছে আর মুহূর্তের মাঝে তার দুই হাতে সাঁড়াশির মতো চেপে ধরল মৃত্তিকার গলা। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই জ্বলে উঠল ঘরের আবছা রাত বাতি। আততায়ির মুখ ঝলসে উঠল তাতে। উফফ! এ কি করে সম্ভব! —'না, মিনু না...' কীভাবে যেন মৃত্তিকার গলা ঠিকরে বেরিয়ে এল চিৎকারটা।

—'কী হয়েছে মা?' এটা রত্নার গলা। মায়ের চিৎকার শুনে এ ঘরে এসেছে ও।

—'একী জেরি? এ ঘরে কি করছ তুমি এত রাতে? আর মা তুমি দরজা লাগিয়ে কেন শুতে যাওনি?' নিজেকে একটু সামলে কোনো মতে এবার তাকালেন মৃত্তিকা। না, মিনু নেই ঘরে দাঁড়িয়ে আছে মানস আর রত্না। আর রত্নার ঠিক পাশেই জেরি। তবে জেরির চোখে সেই ভয়ানক দৃষ্টি আর নেই এবার। বদলে ঠোঁটের কোণায় অদ্ভুত একটা হাসি। এই হাসিটা খুব চেনা মৃত্তিকার। বহু বছর আগের একটা মুখ যেন ফুটে উঠেছে জেরির মুখে। না, আর পারলেন না মৃত্তিকা। বুজে নিলেন আবার নিজের দু-চোখ।

banglabookspdf.com

বন্ধ দরজার ওপারে

কাল রাতে... কাল রাতে আমার সব প্রশ্ন আর সন্দেহ শেষ হয়ে গেছে। সব কিছু একদম স্পষ্ট হয়ে গেছে কাল রাতে। হ্যাঁ সে ফিরে এসেছে। সে তো বলেইছিল সে আসবে ফিরে বারবার আমার কাছে। তাই আবার ফিরে এসেছে সে। কাল রাতে আমি তাকে দেখেছি একদম আমার চোখের সামনে। না, জেরি নয় ও আসলে মিনু। কিংবা মিনুই হয়তো জন্ম নিয়েছে জেরি রূপে, কিংবা মিনুর অতৃপ্ত আত্মা হয়তো জন্মক্ষণ থেকেই ভর করেছে মিনুকে।

জানি না সবটাই হয়তো আমার মনের ভুল এমন হতে পারে। কারণ এসব ঘটনার কোনো সঠিক ব্যাখ্যা তো সত্যি হয় না। আর আমার মতো একজন কট্টর যুক্তিবাদী আর বিজ্ঞানপন্থী মানুষ কি করেই বা বিশ্বাস করতে পারে এসব। কিন্তু এটাও তো ঠিক যে যা আমি দেখেছি, যা অনুভব করেছি সেটা মিথ্যা হতে পারে না। অনেক সময় যুক্তি আর বিজ্ঞানের বাইরেও তো কিছু কিছু থাকে। তাই না? আচ্ছা আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি না তো?

www.banglabookspdf.com

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

কী চায় সে? আমার মৃত্যু আর তার প্রতিশোধ নাকি আমার জীবনের মাঝে লুকিয়ে থাকা রহস্যটা ফাঁস করতে চায়? না আমি সেটা হতে দেব না। আমি অপরাধী হয়ে, সবার চেখে ছোটো হয়ে বাঁচতে পারব না। জানি না আমার সিদ্ধান্ত ঠিক কিনা। জানি না এতে সে শান্তি পাবে কি না। জানি না এতে জেরি সুস্থ হবে কিনা। তবে এটা ঠিক এই মানসিক যাতনা আর আতঙ্ক ঘেরা জীবনে হাঁপিয়ে উঠেছি আমি। তাই এবার মুক্তি দরকার।

আমি আজ সব সত্যি লিখে রেখে যেতে চাই। কারণ হয়তো আমি আর বেশিদিন বাঁচতে পারব না। হয়তো আমি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হব বা সেই হয়তো নিয়ে নেবে আমার জীবন। সে মানে মিনু। যে আজ থেকে বহু বছর আগে প্রথম থাকতে এসেছিল আমার বাবা মায়ের কাছে নিজের সব হারিয়ে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আর সেই রাজনৈতিক অশান্তির সময়ে নিজের ভিটে মাটি আর পরিজনদের হারিয়ে ওপার বাংলা থেকে সে এসেছিল এপার বাংলায় এক চিলতে আশ্রয়ের খোঁজে। সে ছিল আমাদের দুঃসম্পর্কের আত্মীয়। সে সময় এখানে আমাদের বেশ বর্ধিষ্ণু অবস্থা। বারাসাত সংলগ্ন অঞ্চলে আমাদের তখন বড়ো বাড়ি, জমিজমা, লোকজন সব মিলিয়ে বেশ বড়োলোকই ছিলাম আমরা। বাবার তখন ওই এলাকায় বেশ নামডাক, লোকজন মানে গোনে ভালোই। সেই সময় মিনুর ঠিকানা হল আমাদের বাড়ি। তার অবস্থানটা সেদিন আমাদের বাড়িতে আশ্রিতার হলেও আমি তাকে কোনোদিনই সে নজরে দেখতাম না। আমারই বয়সি একটা সর্বহারা মেয়ে। আমি তাকে বন্ধুর মতোই ভালোবাসতাম। সে বেশ আপনার হয়ে উঠেছিল আমার। আমার বাবা মাও তাকে স্নেহের চোখেই দেখতেন।

একসাথেই দুজনে বড়ো হচ্ছিলাম আমরা। বড়ো হবার সাথে সাথে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে ভালোলাগা আর ভালোবাসা সেদিন আছড়ে পড়েছিল আমার জীবনেও। হীরকদা। আমার ভালোলাগার সেই মানুষ ছিল হীরক চৌধুরী। আমার বাবার প্রিয় বন্ধুর বড়ো ছেলে। হীরকদা খাস কলকাতার ছেলে। যেমন স্মার্ট, তেমনই সুন্দর। ডাক্তারি পড়ছে। আমাদের বাড়িতে বেশ যাতায়াতও ছিল ওদের। কখন যে নিজের মন হারিয়ে ফেলেছিলাম নিজেও বোধ হয় বুঝতে পারিনি। তাই আর কাউকে বলাও হয়নি সে কথা।

কিন্তু হঠাৎ একদিন পড়ল বিনা মেঘে বাজ। একদিন হঠাৎই আমি আবিষ্কার করলাম হীরকদা-কে আমাদেরই বাড়ি সংলগ্ন বাগানটায় খুব নিবিড় অবস্থায় মিনুর সাথে। আমার চোখের সামনে পুরো পৃথিবীটা দুলে উঠেছিল। দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে সেই মুহূর্তেই ওদের মাঝে ঢুকে ঠাস করে একটা চড় কসিয়ে দিয়েছিলাম মিনুর গালে।

—'আমাদের আশ্রিতা হয়ে আমার বাবার বন্ধুর ছেলের সাথে তুই... এত স্পর্ধা তোর? দেখ আমি বাবাকে বলে তোর কী হাল করি।'

—'মৌ বিশ্বাস কর...' খুব ভয় পেয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল মিনু, তার আগেই হীরকদা বলল —

www.banglabookspdf.com

'তুমি কাউকে কিছু বলেই কিছু করতে পারবে না। আমি ওকে ভালোবাসি। আর তাই ওর কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমি সব সময় ওকে আগলে রাখব।' বলেই হীরকদা চলে গেল, তারপর আবার ফিরে এসে মিনুকে বলল— 'সামনের মাসে ডাক্তারি পাশ করে যাব আমি। আর তারপরই বিয়ে করব আমরা। সেই কটা দিন একটু কষ্ট কর তুমি মিনু।' আবার চলে গেল হীরকদা আর কান্নায় ভেঙে পড়লাম আমি। মিনু আস্তিনের সাপ হয়ে আমাকেই ছোবল মারল। কি আছে ওর। রূপ ছাড়া কিছুই নেই। তবুই হীরকদা ওকেই... না সহ্য করতে পারছিলাম না আমি। মিনুর প্রতি আক্রোশে আমি অন্ধ হয়ে গেছিলাম। আমার গয়না ওর ঘরে লুকিয়ে রেখে ওকে সবার সামনে চোর সাজালাম। তারপর বিধান এল যে মিনুকে ছেড়ে চলে যেতে হবে আমাদের বাড়ি। মিনু মেনেও নিল সেই বিধান। ও কলকাতায় চলে যাবে। অন্য এক আত্মীয়ের বাড়ি। তবুও শান্তি পাচ্ছিলাম না আমি। সামনের মাসে যদি সত্যি বিয়ে করে ওরা। তারপর আমি বানিয়ে ফেললাম সেই সর্বনাশা প্ল্যান। দিনটা ছিল ১০ আগস্ট। বাড়ির সকলে বেশ দূরে এক আত্মীয়ের বিয়েতে গেছিলেন। আমি গেলাম না। অজুহাতটা ছিল অসুস্থতার। এদিকে তার পরের দিনই মিনুর বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার কথা। ১১ আগস্ট আবার মিনুর জন্মদিনও। সেই ১০ আগস্ট বাড়িতে আমি, মিনু আর কয়েকজন ঝি চাকর ছাড়া বাড়িতে কেউ ছিল না। ভয়ানক দুর্যোগের রাত ছিল সেটা। মিনুকে আমি ডেকে পাঠালাম নিজের ঘরে। ক্ষমা চাইলাম নিজের বিগত ক-দিনের কৃতকর্মের জন্য। খুব কাঁদলাম। তারপর নিজের হাতে বানান পায়েসের বাটি তুলে দিলাম ওর হাতে। না, মিনু বুঝতেও পারেনি ওই পায়েসে বিষ মিশিয়েছি আমি। পায়েস খাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমারই চোখের সামনে মরণের কোলে ঢলে পড়ল ও। তবে বুঝতে পেরেছিল ও মড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে নিজের মরণের কারণ। একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি আর এক অদ্ভুত হাসি মেশানো সেই মুখ মিনুর আমি কোনোদিন ভুলিনি। সেই হাসি মুখ আমি যে আজও দেখি জেরির মধ্যে। মিনুর সেই হাসি যেন বলতে চেয়েছিল তুই জিততে পারবি না। আমি ফিরে আসবই। হ্যাঁ। ও ফিরে এসেছে। জেরি হয়ে ফিরে এসেছে মিনু। জানি না আমার কি কি ক্ষতি করে প্রতিশোধ নেবে ও। সেদিন আমি আইনের হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেছিলাম। আমার বাবা অনেক ক্ষমতাশালী মানুষ ছিলেন। নিজের অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে পুরো ব্যাপারটা ধামা চাপা দিয়েছিলেন। মিনুর মৃত্যুর কোনো সুবিচার সেদিন তাই আর হয়নি। আমরা ওই ঘটনার পর ছেড়ে দিই ওই এলাকা। চলে আসি কলকাতায়। আমিও পড়াশুনায় মন দি। তারও বেশ কিছু বছর পর পাকে চক্রে আমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই সেই হীরক চৌধুরীর সাথেই।

আমার জেতার কথা ছিল না। তবুও জিতেছি আমি, মিনুকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিয়ে। তাই হয়তো ও আজ জেরি হয়ে ফিরে এসেছে। হীরকের মৃত্যুর পর থেকে প্রতিদিন, প্রতি ক্ষণে আমার মনে হয়েছে মিনু যেন আমার পাশে পাশেই রয়েছে, শুধু ঠিক মুহূর্তের অপেক্ষা করছে প্রতিশোধের জন্য। কিন্তু জেরিই মিনু... সেটা আমি জানতাম না। দু একটা খটকা থাকলেও আমি সেগুলো কোনোদিন আমল দিইনি। কিন্তু জানি না আর কেন উড়িয়ে দিতে পারছি না সেদিন রাতের নিজের দেখা আর

www.banglabookspdf.com

বোঝা টুকু। না আমি চলে যাব। তবেই হয়তো বাঁচবে আমার মেয়ের জীবন, সুস্থ হবে আমার একমাত্র নাতনিটা।

নাঃ, এর পর আর কিছু লেখা নেই। এর পর থেকে শুধুই সাদা পাতা। সেই সাদা পাতা গুলোর দিকেই বেবাক ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল রত্না। আজ জেরির জন্মদিন, মায়ের মৃত্যুদিন, আরও অনেক কিছুর দিন। আজ ১০ আগস্ট। দু-বছর আগে ঠিক এই দিনে আত্মহত্যা করেছিলেন মৃত্তিকা চৌধুরী আর ঠিক দু-বছর আগেই এই দিন হারিয়ে গেছিল জেরি। নিজের দশ বছরের জন্মদিনের দিনই। একই সাথে এত বড়ো দুটো বিপর্যয়ের অভিঘাত সহ্য করতে পারেনি রত্না। অনেকটাই মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছিল ও। তবে আজ ও কিছুটা সুস্থ। মানসের ভালোবাসা আর চিকিৎসায়। কিন্তু এক মুহূর্ত ও শান্তি পায় না। কোথায় হারিয়ে গেল ওর জেরি? কেন আর ও ফিরে এল না? কীভাবে হারিয়ে গেল ও? কেনই বা ও বলত ওসব অদ্ভুত কথা? জন্মের পর থেকেই খুব অন্যরকম ছিল মেয়েটা। বেশি খেত না, ঘুমাত না এমনকী কাঁদতও না। শুধু স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। সবাই বলত— 'রত্না, তুই কি লাকি রে! কি শান্ত বেবি তোর।' কিন্তু রত্না খুশি হত না। জেরির দিকে তাকালেই কেমন যেন গা ছমছম করত ওর। না ও কাউকে বলেনি সে কথা। কিন্তু সেই জেরি রত্নার মায়ের কোলে গেলে পরিত্রাহি কাঁদত। বুঝত না রত্না। কেন হচ্ছে এমন। একটু বড়ো হবার সাথে সাথেই জেরি ছবি আঁকতে শুরু করল। একটা ১৭/ ১৮ বছরের মেয়ের ছবি আঁকত বারবার, যাকে কোনোদিনই কেউ দেখেনি ওরা। আর আঁকত একটা বড়ো বাড়ির ছবি। বারবার বলত— 'বন্ধ দরজাটা খুলতে হবে। ওখানে যে একটু একটু করে জমা হয়েছে অনেক অন্ধকার।' জেরির আধো আধো বুলিতে এসব আবোল তাবোল কথা শুনে প্রথমে মজা পেলেও পরে ভয় করত রত্নার। কেন বারবার একই প্রলাপ বকে ও। জেরির অবস্থার উন্নতি হচ্ছিল না দেখে ওকে নিয়ে তো বিদেশই চলে গেছিল ওরা। কিন্তু তবুও খুব একটা বদলায়নি পরিস্থিতি। উল্টে এখানে আসার আগের বছর থেকে তো জেরি পাগলের মতো জেদ ধরেছিল দেশে ফেরার। কিছুটা জেরির জেদের জন্যই তো ওরা... কেন এমন ছিল ওর একমাত্র সন্তান? কেন কোনো সায়াকায়াট্রিক ভালো করতে পারেনি জেরিকে? এই সব রহস্যই কি আজ খুঁজে পেল রত্না মা এর লেখায়? সত্যি জেরিই কি সেই মিনু যাকে কিনা দুঁদে অধ্যাপিকা মৃত্তিকা চৌধুরী নিজের হাতে খুন করেছিলেন? চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে রত্নার। জেরি কি তবে আর ফিরে আসবে না? মৃত্তিকা চৌধুরী আত্মহত্যা করলেও তার মৃতদেহ দেখে মনে হয়েছিল শেষ সময়ে নিদারুন ভয় পেয়েছিলেন তিনি কিছু দেখে। কিন্তু কী দেখে? জেরি বরাবরই আলাদা ঘরে শুত। সেদিনও তাই শুয়েছিল। সেই রাত ভোর হতেই যেমন পাওয়া গেছিল মৃত্তিকা চৌধুরীকে মৃত অবস্থায়, তেমনি আর পাওয়া যায়নি জেরিকেও। কোথায় যেন মিলিয়ে গেল মেয়েটা। মাঝ রাতে কোথায় উবে গেল ও? অনেক তদন্ত হয়েছে, অনেক খোঁজাখুঁজি হয়েছে। কিন্তু না। জেরি ফিরে আসেনি। এই দু-বছরে হাহাকার আর একরাশ প্রশ্ন নিয়ে উন্মাদিনির মতো প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত কাটিয়ে গেছে রত্না। বারবার চোখে ওর নেমে এসেছে অদ্ভুত সব স্বপ্ন। কিন্তু গতরাতের স্বপ্নটা? জেরিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল রত্না। স্বপ্ন নয়। ঠিক যেন সত্যি।

www.banglabookspdf.com

—'মা তুমি আর কেঁদো না। আমার আর ফেরা হবে না গো। আমার যে ওখানকার সব কাজ শেষ।' জেরির কথা শুনে স্বপ্নেই আর্তনাদ করে উঠেছিল রত্না।

—'এসব কি বলছিস মা। ফিরে আয় আমার কাছে। তুই জানিস না, আমি সব সময় অপেক্ষা করি তোর জন্য। কেন এভাবে আমায় ছেড়ে চলে গেলি তুই? কি আমার দোষ? তুই সব আমায় বল। আমি যে শান্তি পাচ্ছি না।'

হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল জেরি। কাঁদতে কাঁদতে যেন একটু একটু করে বড়ো হয়ে যাচ্ছিল ও। রত্না দেখল জেরির মতো জামা পরে দাঁড়িয়ে আছে একটা বছর আঠারোর মেয়ে। তাকে দেখে স্বপ্নেও চমকে উঠল রত্না। আরে, এর ছবিই তো আঁকত জেরি ছোটোবেলায়। মেয়েটা বলল—

—'মা তোমার সব প্রশ্নের উত্তর তোমার ঘরেই আছে মা। মৃত্তিকা চৌধুরী যে ঘরে মরেছিল সেই ঘরের বাম দিকের বড়ো কাঠের আলমারির নীচের ড্রয়ারে সব উত্তর আছে।' ঠিক তখনই ভেঙে গেল স্বপ্নটা। রত্না আজ সেই মতোই এসে খুঁজছিল এই ঘরে। নির্ধারিত জায়গাতেই পেয়ে গেল এই নোটপ্যাড। হাত পা কেমন কাঁপছে রত্নার। মাথা ঝিমঝিম করছে। কিছুই যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।

—'ম্যাডাম আপনার ওষুধের সময় হয়ে গেছে। টেবিলে জলখাবার আর ওষুধ একসাথে রেখেছি। স্যার ওয়েট করছেন।' আয়ার ডাকে সম্বিৎ ফিরল রত্নার।

—'আসছি' বলেই নোটপ্যাডটা লুকিয়ে দিল বিছানার গদির তলায়। কোনোমতে জলখাবার শেষ করে, মানসকে অফিসে রওনা করিয়ে দিয়েই দৌড়ে ফিরে এসে আবার হাতড়াল বিছানার গদির তলা। হাতে ঠেকল নোটপ্যাড। কিন্তু কই? এখানে তো সাদা পাতা শুধু। মায়ের লেখাটা কোথায় গেল? রত্না পাগলের মতো হাতরাচ্ছে এই ড্রয়ার ওই ড্রয়ার, গদির তলা। কিন্তু না সেই নোটপ্যাডটা।

—'কী হয়েছে ম্যাডাম?' আবার এল আয়া রত্নাকে অস্থির দেখে।

—'একটা নোটপ্যাড... তুমি যখন ডাকলে আমায়, আমার হাতে ছিল। পাচ্ছি না সেটা।'

—'সেটা তো আপনি তখন বিছানার গদির তলায় রাখলেন। আমি তো দেখলাম।'

—'হ্যাঁ কিন্তু এটায় কিছু লেখা নেই। ওটায় লেখা ছিল। আমার মায়ের লেখা। তুমি বিশ্বাস কর'...

এবার ঠোঁট উল্টাল আয়া। উফফ! আবার পাগলি বউটা হ্যালুসিনেট করেছে নির্ঘাত। এর এই ভুল দেখার ব্যামোটা এত ডাক্তার ওষুধেও কেন যে কমছে না।

—'আসুন ম্যাডাম। মনে হয় আপনার শরীরটা আবার খারাপ লাগছে। আসুন তো আমার সাথে। শোবেন একটু।'

—'না না। ওটা খুঁজে পেতে হবে আমায়। প্লিজ। আমায় ছাড়।' নিজেকে জোর করে ছাড়াতে চাইল রত্না। কিন্তু পারল না। ওর শরীরটা যে সত্যি আজকাল জোরবিহীন হয়ে পড়েছে। আয়া এনে শুইয়ে দিল রত্নাকে। চোখ জলে ভরে গেল রত্নার। ও বুঝতে পারছে আয়া ভাবছে আবার ও পাগলামি করছে। কিন্তু ও কী করে বোঝাবে ও সত্যি খুঁজে পেয়েছে ওর জেরির রহস্য। কিন্তু কোথায় গেল লেখাটা? লেখাটাও কি তবে হারিয়ে গেল কোনো অজানা দরজার ওপারে? না না না। আর কিছু হারাতে দেবে না রত্না। ও সুস্থ হবেই। সেদিন ও ঠিক খুঁজে আনবে ওর হারিয়ে যাওয়া জেরিকে,

www.banglabookspdf.com

সেদিন ও ঠিক খুঁজে আনবে মায়ের লেখাটাও। সেদিন সবাই বুঝবে রত্না পাগল নয়। ও জেরির মা, শুধু জেরির মা।

—

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

শিল্পী

অনুভার কথা

—'বলো দুগগা মাইকি জয়... বলো দুগগা মাইকি জয়... আসছে বছর আবার হবে... আসছে বছর আবার হবে'... চিৎকারটা আবছা হতে হতে এবার মিলিয়ে গেল দূরে। বুঝলাম এই বছরের মতো বিদায় নিলেন মা দুর্গা। আমি মানে আমি অনুভা দাস যথারীতি পূজার বাকি দিনগুলোর মতোই পুজোর শেষ দিনেও বিছানায় শুয়ে। অবশ্য অন্য বছরগুলোতেও যে আমি বাকি পৃথিবীটার মতো আনন্দের সমুদ্রে ঢেউ তুলে ভেসে যাই তা মোটেই নয়, কিন্তু হ্যাঁ পাড়ার মণ্ডপে টুকটাক কাজে কাকিমাদের সাহায্য করা, একটা মাত্র যে নতুন সালোয়ার পাই সেটা পরে অষ্টমীর সকালে অঞ্জলি দেওয়া বা আমার বয়সি আমার পাড়ার অন্য দু-একটা মেয়ের সাথে একটু আধটু গল্প করা এসব করে থাকি। অন্তত গত বারো বছর তাই করছি। বারো বছর বলছি কারণ আমার বয়স এখন ষোল আর প্রথম চার বছরের স্মৃতি আমার মোটা মগজে খুব একটা চকচকে শান নিয়ে বেঁচে নেই।

না, এবছর সে সব কিছুই করতে পারিনি। কারণ পুরো পুজোটাতেই আমি ছিলাম বিছানায় বন্দি। আর আমি জানি এটাই এই পৃথিবীতে আমার শেষ পুজো। কারণ আমি আর বাঁচব না সেটা আমি জেনে গেছি। অবশ্য আমার মতো একটা নিষ্প্রয়োজন প্রাণ এই পৃথিবীতে আর বেঁচেই বা কি করবে? কবেই বা কার কোন উপকারে লেগেছি আমি? আমি দেখতেও সুন্দর নই। বয়সের ধর্ম অনুযায়ী যখন কোনো যৌবন পেরনো ছেলে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যখন আমার চোখ ছুঁয়ে যায় কোনো পুরুষের চিবুক; লক্ষ্য করেছি কেমন একটা অব্যক্ত ঘৃণায় যেন শিউরে ওঠে সে। লজ্জায় তখন কেমন সিঁটিয়ে যাই আমি, বুঝতে পারি আমি এবং আমার দৃষ্টি বা সান্নিধ্য খুব আপাংক্তেয় সবার কাছে। হ্যাঁ পড়াশুনায় বোধ হয় আমি মন্দ না। তবে তাতেই বা কি? আমার মতো হত দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা গল্পেই পড়া লেখা শিখে জজ ব্যারিস্টার হয়। বাস্তবে নয়। তবে আমি জানি আমি মরে যাবার পর একটা মানুষ একদম নিঃস্ব হয়ে পড়বে। আমার চলে যাবার পর আর সে বেশিদিন বাঁচবেই না হয়তো। সেই মানুষটা হল আমার দাদু। আমিই যে দাদুর সবটুকু পৃথিবী আর দাদু আমার। আমায় জন্ম দিতে গিয়ে চলে যান আমার মা। তাই স্বাভাবিকভাবেই তার সাথে পরিচয়ের সৌভাগ্য থেকে আমি বঞ্চিত সেই জন্মলগ্ন থেকেই। তার বাবা? তিনি তো ইহলোকের মায়া কাটিয়েছিলেন আমার জন্মেরও মাস চারেক আগেই। তাই আমার ছোটোবেলা থেকে ওই একটা লোকই আমার বাবা, মা, ভাই বোন, বন্ধু সব কিছু। আমার দাদু। আমার দাদু একটা খুব ছোটো কারখানায় কাজ করতেন। সেই ছোট্টবেলার দিনগুলোতে দেখতাম দাদু সকালবেলা আমার দুধ বানিয়ে দিদার কাছে রেখে ভোঁ বাজলেই দৌড় লাগাত। দিদাও তখন বড্ড আগলে রাখত আমায়। মনে পড়ে দাদু মাঝে মাঝে

www.banglabookspdf.com

কারখানা থেকে ফিরে বেত, শোলা, রঙিন কাগজ, চকচকে সোনালী জরি, চুমকি এসব দিয়ে কি যেন বানাত। তখন আমি একটু বড়ো। আধো আধো স্বরে জিজ্ঞাসা করতাম— 'এগুলো কী দাদু?'

—'এগুলো খেলনা গো দিদিভাই। আমি তোমায় খেলনা বানিয়ে দেব গো।' হেসে হেসে বলত দাদু। সত্যি হতও তাই। কী সুন্দর সুন্দর হাতের কাজের পুতুল বানাত দাদু। কিন্তু দিদা রেগে যেত। বলতো— 'আবার ওসব পাগলামো নিয়ে পড়লে তুমি? আবার এসবের জন্য গাদা পয়সা খরচা করেছ তো?' তখন আমি বুঝতাম না ব্যাপারখানা ঠিক কি? দাদু যেদিনই আমার জন্য খেলনা বানায় কেন দিদা অমন রাগ করে? আরও খানিক বড়ো হবার পর খানিকটা দিদার থেকে শুনে আর নিজের মগজ খাটিয়ে ধরেছিলাম ব্যাপারটা। দাদুর মধ্যে নাকি বহুকাল থেকেই বাসা বেঁধে আছে এক পাগলামি বা ছেলেমানুষি। শিল্পী হবার পাগলামি। দাদু নাকি বরাবরই নিজে নিজে এসব সরঞ্জাম কিনে এনে পুতুল টুতুল বানায়। একে তো অভাবের সংসার। তাইতে কি দিদার আর এসব পাগলামো ধাতে সয়। ইশশ! সেদিন কি আর দিদা জানত যে একদিন এই হাতের কাজই বাঁচিয়ে রাখবে দাদুকে।

দাদুর ভাগ্যটাও আমার মতোই পোড়া। তাই কারখানার চাকরি থেকে দাদুর অবসরের পরপরই ধরা পড়ল দিদার ক্যান্সার। খারাপ সময় আসলে কাকে বলে তখনই বুঝেছিলাম আমি। প্রায় ছ-মাস নিজের সাধ্যমতো দাদু আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল দিদাকে বাঁচানোর। কিন্তু তবুও শেষ রক্ষা আর হল না। চলে গেল দিদা। এদিকে ততদিনে আমাদের অভাবের সংসার ফুটিফাটা হয়ে গেছে আরও শতগুণ। জমানো শেষ কপর্দকটাও আর নেই। এটা এই বছর তিন চারেক আগের কথা বলছি। তখন থেকে আমাদের রোজগারের উপায় শুধুমাত্র এই বাড়িটার সামনের ফালি অংশটুকুর ভাড়া আর দাদুর হাতের কাজের বানানো পুতুল আর খেলনা। পাগলের মতো পরিশ্রম করে বুড়ো মানুষটা। সারা বিকাল আর সন্ধ্যা বানায় এসব, তারপর রোদ জল সব উপেক্ষা করে স্কুল গুলোর দোরে দারে ঘোরে, যদি বাচচারা কেনে এসব। যে কোনো মেলায় দৌড়ে যায়। না স্টল দেবার ক্ষমতা তো আমার দাদুর নেই, কিন্তু যদি ওই মেলার বাইরে একচিলতে জায়গায় দাঁড়িয়ে বেচা যায়! প্রতি বছর পুজোর সময় বড়ো বড়ো প্যান্ডেলের বাইরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে সারাদিন, যদি বিক্রি বাটা করে লাভ করা যায়! কিন্তু হায় রে! বোকা ওই বুড়ো মানুষটা বোঝেই না যে আজকালকার সেলফি, মোবাইল, ভিডিয়ো গেমস আর ঝাঁ চকচকে ডিজিটাল দুনিয়ার যুগে দাদুর প্রাণ ঢেলে বানানো ওই হাতের কাজের পুতুল আর খেলনা যে পিছিয়ে পরার নিশানা। কেতাদুরস্ত কর্পোরেট বাবা মায়েরা কি কখনো চাইতে পারে যে তাদের স্মার্ট আর চকচকে বাচচারা হাতে ট্যাব-এর বদলে দাদুর বানানো ওই পুতুল নিক! ওগুলো যে তাদের কাছে বাড়তি আবর্জনার মতো। দাদুর মুখটা দেখে কষ্টে আমার বুকটা জ্বলে যায়। আমি জানি আমার দাদু অসাধারণ একজন শিল্পী। শুধু আমি কেন আমাদের পাড়ার সবাই বলে দাদুর হাতের বানানো পুতুল যেন বিশ্বকর্মার তৈরি। কিন্তু এই পোড়া দেশে এমন হাজার হাজার শিল্পী যে শুধুই ব্যর্থ ফেরিওয়ালা হয়ে বেঁচে থাকে। যাদের থেকে কিছু সামগ্রী কেনা তো দূর, যাদের কে বোধ হয় অনেক তথাকথিত উচচবিত্ত মানুষ ভিখারির চোখে দেখে। যেখানে তেরো চোদ্দো কোটি টাকা দিয়ে থিম পুজোর প্যান্ডেল তৈরি হয়, সেই প্যান্ডেল এর বাইরে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকে আমার দাদুর তিরিশ

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

টাকার পুতুলও বিক্রি হয় না। যে শহরে উৎসবের আনন্দের নামে এক একদিনে হাজার হাজার টাকা রেস্তোরার বিল মেটায় মানুষ, সেই শহরেই আমার দাদু সারাদিন না খেয়ে থেকে চেষ্টা করে যায় দু-একটা 'মাল' বেশি বিক্রি করার। হ্যাঁ 'মাল'ই বললাম। কারণ আমার দাদুর মতো শিল্পীদের প্রতিভা 'মাল' হয়েই ফেরি হয় বাজারে প্রতিদিন নিতান্ত জলের দরে। দাদুর এই সংগ্রাম দেখে আমি দাঁতে দাঁত ঘষে প্রতিজ্ঞা করেছি বহুবার যে দাদুর সব কষ্ট মিটিয়ে দেব আমি। শত অভাবেও দাদু আমার লেখাপড়া কোনোদিন বন্ধ হতে দেয়নি। তাই ভেবেছিলাম পড়াশুনা শিখে বড়ো মানুষ হয়ে একদিন দাদুর জন্য যোগ্য সম্মান ঠিক ছিনিয়ে আনব আমি। কিন্তু ওই যে তখন বললাম। ওসব গল্প বা সিনেমায় শুধু হয়, বাস্তবে নয়। বাস্তবে আমার মতো অনুভারা মুখ থুবড়ে পড়ে, মরে যায়। এই যেমন আমি মরতে চলেছি। আসলে আমি জন্মের সময়তেই আমার হৃৎপিণ্ডে একটা ফুটো নিয়ে জন্মেছিলাম। তাই নিয়ে নানা সময়ে নানা ভাবে টুকটাক ভুগেছি। কিন্তু না, ব্যাপারটা এবার অনেক জটিল হয়ে গেছে। গত কয়েক মাস পুরো বিছানায় বন্দি আমি। ডাক্তাররা বলেছেন অনেক খরচ সাপেক্ষ কি সব অপারেশন না করালে আমি নাকি বাঁচব না। আর এটা শোনার পর থেকেই একদম পাগলা হয়ে গেছে দাদু। জানি না কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে টাকা জোগাড়ের জন্য, কি সব করছে কিছু বুঝতে পারছি না। শুধু এটুকু জানি ও খরচ জোগাবার সাধ্য ওই বুড়ো মানুষটার নেই। হঠাৎ কি হয়েছে দু-দিন হল জানি না। এই দেবীপক্ষ পরার পর থেকেই দেখছি দাদু যেন কেমন বদলে গেছে। চোখে মুখে চিক চিক করছে খুশি। শুধু বলছে— 'বুঝলি দিদি, তোকে এ যাত্রায় বাঁচিয়ে দেবই আমি। সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। মা দুগগা যে আমায় শুধু হাতে ফেরাবেন না।'

জানি না দাদু কি ভাবছে। কোনো ভাবেই মুখ খোলাতে পারছি না লোকটাকে। দাদু কি তবে এই বসত বাড়িটার এক ফালি ছাদটুকু বেচে দিয়ে চিকিৎসা করাতে চাইছে আমার? হে ভগবান! এমনটা হওয়ার আগে যেন নিঃশ্বাসটা থেমে যায় আমার। শেষ বয়সে কি তবে পথে বসবে মানুষটা? হে ঈশ্বর আমারও তবে বিসর্জন হয়ে যাক, হয়ে যাক এই দশমীতেই।

banglabookspdf.com

সুপ্রিয়ার কথা

পুজোর জন্য ছুটি ছিল আমাদের স্টুডিয়ো পাড়ায় লাস্ট কয়েকটা দিন। গতকাল দশমীর পর আবার ছন্দে ফিরেছে সব। আমি মানে সুপ্রিয়া লাহিড়ী রোজকার মতোই গাড়ি থেকে নেমে গটমট করে হেঁটে এগিয়ে গেলাম নিজের ফ্লোরের দিকে। আমি যে এই টলি পাড়ার বেশ নামকরা শিল্পী সবাই তা এক কথায় স্বীকার করে নেবে সে নিয়ে কোনো দ্বিধা নেই আমার। যদিও আমার উত্থানটা ঘটেছিল মেগা সিরিয়ালের হাত ধরেই, কিন্তু এখন আমি বাংলা আর্ট ফিল্মের জগতেও নিজের বেশ একটা আলাদা জায়গা করে নিয়েছি। এমনকী বলিউড থেকেও টুকটাক কাজের অফার পাচ্ছি। তবে বাংলা ছবিতে আমার ব্যস্ততা এখন বাড়লেও মেগা সিরিয়ালের কাজ আমি এখনও ছাড়িনি। 'রূপকুমারী' সিরিয়ালটায় বিশেষ একটা ডাকসাইটে রোলে আছি। আরে! আমরা হচ্ছি শিল্পী মানুষ। দর্শকদের কাছাকাছি থাকা নিয়েই কাজ। মাধ্যম সে ছবি হোক বা ছোটো পর্দা। এ বছর তো 'অন্য আকাশ' ছবিটার জন্য ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড এর নমিনেশনেও আছি আমি। পেয়েও যাব জানি। কারণ ভালো

www.banglabookspdf.com

কেরিয়ার বানাতে গেলে মন দিয়ে কাজ করার পাশাপাশি যেটা দরকার তার সবটাই আমি করি। ওপর মহলে যাতায়াত, তেল টেল বেশ ভালোই মারা এই আর কি। সব কিছু মিলিয়ে আমার কেরিয়ার গ্রাফটা যে বেশ ভালো তা আমি জানি। অনেকেই সে জন্য বেশ ঈর্ষার চোখে দেখে আমায়। কিন্তু এর সবটাই মাটি হতে বসেছিল শুভেন্দুর জ্বালায়। শুভেন্দু মানে আমার তথাকথিত বর। উফফ! কী কুক্ষণেই যে বিয়ে করেছিলাম ওই অপদার্থটাকে। আসলে তখন কম বয়স ছিল লোকটার, সবে আর্ট কলেজ থেকে পাশ দিয়েছে। স্টুডিয়ো পাড়ায় ভালোই যাতায়াত আর্ট ডিরেক্টরের সহকারী হিসাবে। আর আমিও তো আর সেদিন আজকের মতো হনু ছিলাম না। ছিলাম মাটি কামড়ে পড়ে থাকা একজন উঠতি অভিনেত্রী। যাই হোক সেই সময়ই আমাদের প্রেম, তারপর বিয়ে। আর এই বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই আমি টের পেলাম এই লোকটা অপদার্থ। অসহ্য রকমের মাতাল আর কুঁড়ে। তখন থেকেই সম্পর্ক শিথিল হতে শুরু করে আমাদের। কি মায়ায় যে আটকে আছি এখনও ওর সাথে কে জানে! নিজেই বুঝি না মাঝে মাঝে। নইলে গত বছরই তো ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল আমার ওকে। ওর জন্যই তো আমার নিন্দুক আর শত্রুগুলো এত কথা বলার সুযোগ পেল আমার বিরুদ্ধে। কথা নেই, বার্তা নেই ড্রাগ কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ে নিজের নাক কাটল আর সাথে আমারও।

—'দিদি, শুভদা তো ফাটিয়ে দিয়েছে গো। এই পার্টিটা কবে দিচ্ছ গো?' শেলি মানে 'রূপকুমারী'র লিড অ্যাকট্রেসের ডাকে চমকে তাকালাম। দেঁতো হাসি হেসে বললাম— 'এনি ডে রে। যবে একটু ফাঁকা পাব আমরা সবাই।' কথা শেষ হতে না হতেই ঢুকে এল প্রমা মানে আমাদের ডিরেক্টর।

—'হাই প্রিয়া, কনগ্র্যাচুলেশনস। শুভর সাকসেস এর পার্টিটা কবে পাচ্ছি?' আবার যথারীতি মেকি হেসে একই জবাব দিলাম আমি। বুঝতেই পারছি যে আজ মানে আপাতত কিছুদিন চলবে এই আদিখ্যেতাটা। আসলে শুভঙ্করের ডিজাইন করা থিমের পুজো এবার আঠারোটা শারদ সম্মান পেয়েছে। সব পুজো উদ্যোক্তারা শুধুই ওকে চাইছে নেক্সট ইয়ারে। এমনকী ও দিল্লি যাচ্ছে একটা বিশেষ কনফারেন্সে এই সূত্রেই। বিদেশেও ডাক পেয়েছে। এতদিনে চাপা পড়ল ওর ড্রাগ কেচ্ছাটা। হ্যাঁ, এটা ঠিক যা কিছু আজ পাচ্ছে শুভ তা আমার প্রভাব প্রতিপত্তি ছাড়া হত না। যা হচ্ছে তার সবটাই তো... কিন্তু আমিই বা কি করব। নিজের সম্মান বাঁচাতে এটুকু যে বড়ো দরকার ছিল। আর হাজার হোক আমার বর তো। না, আগামী দিনেও সব রকম পরিস্থিতি সামাল দিতে আমারও যা যা করণীয় তা করে আমাকে ওর পাশে থাকতেই হবে। শুভর সম্মান বাড়া মানে তো আসলে সুপ্রিয়া লাহিড়ীর বরেরই স্ট্যাটাস বাড়া। লাভটা যে আমারই।

নাম তার নিকুঞ্জ দাস

বুড়ো লোকটা একটু ঘাবড়েই গেছে বোধ হয় এত বড়ো ঝাঁ চকচকে বাড়িটা দেখে। তবু ধীর পায়ে এগিয়ে গেল। পকেট থেকে একবার বের করে দেখে নিল ঠিকানা লেখা ভাঁজ করা কাগজটা। হ্যাঁ এটাই তো। কলিং বেল এর ওপর আঙুল ছোঁয়াতেই দরজা খুলে দিল বাড়ির চাকর।

www.banglabookspdf.com

—'আজ্ঞে আমার নাম নিকুঞ্জ দাস। মিত্তির বাবু আমায় আসতে বলেছিলেন।' খুব সংকুচিত ভাবে বলল বুড়ো মানুষটা।

—'অ আপনি সেই...। ঠিক আছে বসুন।' চাকর চলে গেল ভিতরে। কিছুই বুঝতে পারছে না নিকুঞ্জ দাস। কেন তার ডাক পড়ল এখানে। এখনও তো সবটাই ধোঁয়াশায় ঢাকা। এখন তো এমনিতেই নিকুঞ্জ দাসের মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল অবস্থা। অনেক অনেক টাকার দরকার। দিদিভাই এর অপারেশন করে ওকে বাঁচাতেই হবে। হাতে সময়ও কম। এদিকে এখনও তেমন কিছুই হল না। বাড়িটা বেচা ছাড়া আর তো কিছু উপায় নেই। যেভাবেই হোক বেচতে হবে। তার পরে কী হবে সে পরে দেখা যাবে। কিন্তু গতকাল হঠাৎ সব যেন এলোমেলো হয়ে গেল। উত্তর কলকাতার লেকটাউন চত্বরে বড়ো ফুট ব্রিজটায় সকালের দিকে বসে পুতুল ফেরি করে নিকুঞ্জ। সল্টলেকে গুচ্ছের বাচচাদের স্কুল হয়েছে এখন। ওদের সিংহভাগ যাতায়াত করে ওই সময়টায়। ওরাই ওই সময়টার টার্গেট খরিদ্দার।

—'দাদু তুমি এখানে রোজ বিক্রি কর তো। তাই না? তোমার সাথে একটু দরকার ছিল কথা বলতে পারবে?' একটা অপরিচিত গম্ভীর স্বরে কাল হঠাৎ চমকে তাকিয়েছিল নিকুঞ্জ। একটা ঢ্যাঙা মতো কোট প্যান্ট পরা ভদ্দরবাবু।

—'আমার সাথে দরকার কি বাবু? পুতুল নেবে নাকি ছেলের জন্য?' থতমত খেয়ে কাল বলেছিল বুড়োটা।

—'হ্যাঁ পুতুল নেব। অনেক পুতুল। অত পুতুল হয়তো তুমি এ জীবনেও বিক্রি করনি। অনেক টাকার ব্যাপার। এই নাও ঠিকানা কাল সকালে চলে যেও।'

সেই মতোই তো এসেছে আজ নিকুঞ্জ দাস। কিন্তু এখনও তো মাথায় ঢুকছে না কিছুই।

—'ও তুমি এসে গেছ!' একটু ব্যস্ত ভাবে এবার সিনে এল সেই ঢ্যাঙা বাবুটা। নিকুঞ্জের উল্টো দিকের চেয়ারটায় বসে বলল— 'শোনো তোমায় আমাদের জন্য কাজ করতে হবে। তাই ডেকেছি তোমায়। কিছু কঠিন কাজ না। পুতুল বানানো আর খেলনা বানানোর কাজ। তোমার বানানো পুতুল দিয়ে সেজে উঠবে দক্ষিণ কলকাতার নাম করা পুজো মণ্ডপ।' ফ্যালফ্যাল করে তাকাল নিকুঞ্জ দাস।

—'মানে বাবু? এসব কি বলছেন আপনি? আমার মতো একটা অনামি শিল্পী যে কিনা আসলে একটা রাস্তার হকার তার কাজ গিয়ে কিনা...'

—'আঃ তুমি এত কেন ভাবছ? তুমি এসে কাজ করবে আমাদের ওয়ার্কশপে মানে আমাদের অফিসে বসে বানাবে তুমি। সব মাল আমরা দেব তোমায়। তুমি শুধু বানাবে। আর টাকা পাবে তুমি যথেষ্ট। মন খুশি হয়ে যাবে তোমার। নাম ধাম নিয়ে এত ভেবো না তুমি। তুমি কাজ করবে অন্য একজনের হয়ে। একজন নাম করা শিল্পীর হয়ে। তিনি নিজেই সব করতে পারেন, নেহাতই তিনি ব্যস্ত মানুষ তাই...'

—'বুঝতে পেরেছি বাবু।' ধরা গলায় বলল বুড়োটা।

www.banglabookspdf.com

—'বাঃ এই তো। তাহলে কাল থেকেই লেগে পড়। সময় তো আর বেশি নেই। পুজো তো এসেই গেল প্রায়। এই রাখ ওয়ার্কশপের ঠিকানা। চলে এসো কাল। তখন না হয় কিছু অগ্রিমও দেওয়া যাবে তোমায়।'

চলে গেল বুড়োটা আর হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম আমি মানে আমি অরূপ মিত্তির। এই দিদি কাম বস এই সুপ্রিয়া লাহিড়ীও হয়েছে তেমন। ওর পি এ কাম ভাই হয়েই তো এখন আমার সব ফুটানি। তাই ওর মন রেখে তো চলতেই হবে। জামাইবাবু মানে শুভদা দা গত বছর সেই কেচ্ছাটায় জড়িয়ে পড়ার পর থেকেই দিদি শুধু সুযোগ খুঁজছিল কীভাবে জামাইবাবুর ইমেজ ক্লিন করা যায়। আর সেই সুযোগ ওকে পেতে হল আমার ডেরা মানে বাসা থেকেই। তাতাই মানে আমার ছেলেটাকে দিদি খুব ভালোবাসে। হাজার ব্যস্ততা সত্ত্বেও সপ্তাহে একদিন চেষ্টা করে এখানে আসতে। সেদিন এসে হঠাৎ দেখল তাতাইয়ের কাছে কয়েকটা সস্তার হাতে বানানো খেলনা। কি পাগলামো ওকে ভর করল জানি না। ও বুঝেই গেল নাকি এই সব কাজ নিয়ে যদি কোনো পুজোর থিম সাজানো যায় তাহলে নাকি দারুণ হবে। আমার গিন্নি আনতে যায় ছেলেকে স্কুল থেকে। মেঘা বলল কোনো রাস্তার হকার নাকি এগুলো নিজে হাতে বানিয়ে রাস্তায় বসে বেচে। ব্যস! আর পায় কে দিদিকে। আমার প্রতি হুকুম হল যেভাবেই হোক ওই লোকটাকে খুঁজে আমায় ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তার কাজ চালানো যায় শুভদা-র আর্ট এর নামে।

আরে! দিদি ফোন করেছে যে।

—'হ্যাঁরে দিদি বল। হ্যাঁ সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। ও বুড়ো কাল থেকেই কাজে লেগে পড়বে। আমি এদিকটা সামলাচ্ছি তুই ওদিক দ্যাখ।'

—'কি বললি? হ্যাঁ হ্যাঁ সব হয়ে যাবে। তুই সামলে নে ওদিকটা। ব্যস।' দিদি ফোন কেটে দিল আর স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলাম আমি। সব ভালোয় ভালোয় উতরালে আমার জন্য বড়ো পুরস্কার নাচছে নির্ঘাত।

banglabookspdf.com

শিল্পীর কথা

আমার বয়স চৌষট্টি। নাম নিকুঞ্জ দাস। বয়স চৌষট্টি হলেও আমার আজ চার বছরের খোকার মতো নাচতে ইচ্ছে করছে আনন্দে। আনন্দ তো হবেই। আমার আদরের দিদিভাই এর অপারেশন যে ভালো ভাবে হয়ে গেছে। ডাক্তার বলেছে সব বিপদ কেটে গেছে। আর আমি সেই সুসংবাদটা নিয়ে এই সবে ঢুকছি আমার চিলতে ঘরে। গিন্নির জন্য জিলিপি কিনেছি আজ। বড়ো ভালোবাসে বুড়িটা। সেটা ওর ছবির সামনে সাজিয়ে দিতে গিয়েই দেখলাম মিটিমিটি হাসছে বুড়ি।

—'কি বুড়ি হাসছ কেন? খুব তো বলতে আমার হাতের কাজ ফালতু। ও সব আমার পাগলামো। আর আজ? কী বলবে? ধন্য ধন্য করছে সবাই সেই কাজের নামে। নাই বা বসল তাতে আমার নাম। কিন্তু কাজ যে আমারই গিন্নি। আমিই যে আসল শিল্পী। আজ আমার শিল্প সার্থক গিন্নি। সার্থক। আমার হাতের কাজের এত কদর যে মরণের মুখ থেকে কেড়ে এনেছে আমার দিদিভাইকে। একটা শিল্পীর এর থেকে বড়ো পাওনা আর কি হতে পারে বলতো?'

www.banglabookspdf.com

ইশশ! আমার গিন্নিটাকে দেখো। এখনও ভেংচি কাটছে ছবি থেকেই। কি বললে? কি বললে? আসলে আমি রাস্তার হকারই থেকে যাব। কেউ জানবে না আমার নাম।

—'ঠিক আছে। জানার দরকার নেই। আমার দিদিভাই তো আবার হেসে খেলে বেড়াবে আমার চোখের সামনে। শোনো আর রাস্তায় হকারি করব না আমি। আমার চাকরি ওই শুভেন্দু হালদারের কাছে পাকা হয়ে গেছে বুঝলে।

কিন্তু জান গিন্নি বুকের কাছটায় কেমন যেন একটা কষ্ট পাকিয়ে উঠছে। কেন বলতো গিন্নি? চোখে এত জল ঝরছে কেন বুঝতে পারছি না গো। আজ তো আমার খুশির দিন। তবুও কি যে কাঁটা ফুটছে বুঝতে পারছি নে।'

না গিন্নিকে বলছি না কিন্তু আমি জানি কি কাঁটা বিঁধছে আমার। আমি যে শিল্পী হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু... কিন্তু...। না না না। মন শক্ত করতে হবে আমায়। দিদিভাইকে অনেক বড়ো মানুষ করতে হবে যে। শিল্পী নিকুঞ্জ হেরে গেলেও, দাদু যে হারবে না। আর কে বলতে পারে হয়তো আমার দিদিভাইই একদিন মস্ত মানুষ হয়ে ঠিক কেড়ে আনবে ওই বড়ো মানুষগুলোর থেকে ওর দাদুর জন্য তার আসল সম্মানটা দিদিভাই যে আমায় কথা দিয়েছিল একবার। না, শিল্পী নিকুঞ্জ দাসের বিসর্জন হয়েছে কে বলেছে? বিসর্জনেই যে লুকিয়ে থাকে বোধন। আমার বুক ভাসা এই চোখের জল মুছে আমায় আবার বাঁচার স্বপ্ন দেখতেই হবে। সেই দিনটার জন্য যেদিন আমার দিদিভাইয়ের হাত ধরে আমিও প্রাইজ নেব শিল্পী নিকুঞ্জ দাস হয়ে। ফোকলা দাঁতে হেসে হেসে বলব বাবুরা আমি ফেরিওয়ালা নই গো। আমি যে শিল্পী।

—

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

বৃষ্টির রূপকথা

১

মেঘলা দুপুরের গন্ধ সারা গায়ে মাখতে মাখতে কোল বালিশ জাপটে ধরে বেশ করে বিছানায় গড়াগড়ি খাচ্ছিল বিজন। রবিবার দুপুর গুলোতে যেন দুনিয়ার আলসেমি এসে পেয়ে বসে ওকে। আর সে তো হবেই। সারা সপ্তাহ যা খাটুনি যায়! আই টি ইঞ্জিনিয়াররা তো এখন মোটা মাপের মাইনে পাওয়া আধুনিক শ্রমিক ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সবে মাস দুয়েক হল ব্যাঙ্গালোরের পাত্তারি গুটিয়ে কলকাতায় নিজের বাড়িতে ফিরেছে বিজন। এখন কলকাতাতেই চাকরি করছে ও। কিন্তু তবুও বাড়িতে আর থাকাই বা কতটুকু সময়!

গুরুগুরু করে মেঘ ডাকা শুরু হয়েছে। বৃষ্টিটা ঝেঁপে এবার নামল বলে। পরম আবেশে চোখটা বুজতেই যাচ্ছিল বিজন, ঠিক তখনই আছড়ে পড়ল কানে তীক্ষ্ণ ডাকটা...

—'কাকি, ও কাকি একবার দরজাটা খুলবে গো তাড়াতাড়ি? বড্ড বাদলা আসছে যে...'

ধাঁই করে যেন একটা হাই ভোল্টেজ শক খেল বিজন। রেখা! হ্যাঁ এটা তো রেখারই গলা। তার মানে... তার মানে রেখা এখনও আসে এই বাড়িতে! কিন্তু... কিন্তু মা যে বলেছিল রেখার কোনো খবর আজ জানে না কেউ। ওরা নাকি এ তল্লাট ছেড়ে চলে গেছে। তবে কি সেদিন মিথ্যা বলেছিল মা? কিন্তু কেন? মা তো কিছু কোনোদিন জেনেছিল বলে মনে হয় না। নাকি কিছু আন্দাজ করেছিল বলেই...? কিন্তু কি করেই বা আন্দাজ করবে? বিজন তো কোনোদিন কিছু ভুল করেও বুঝতে দেয়নি। তবে কি রেখা নিজেই...?

তড়াক করে বিছানায় উঠে বসল বিজন। খামচে ধরল বিছানার চাদর। কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল বাইরের ঘরে ঠিক কী কথা বার্তা চলছে।

—'কিরে এনেছিস ওই নতুন ডিজাইনের ব্লাউজটা? সুমি কিন্তু বেশ কয়খানা নেবে?

—'হ্যাঁ গো কাকি এনেছি।'

এবার ঠোঁট কামড়ে ধরল বিজন। এখনও সেই একই কাজ করে চলেছে রেখা, লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ব্লাউজ আর সায়া ফেরি। লেখা মাসি কি এখনও আছে? নাকি রেখা একাই করে এখন এই কাজ?

অনেক সাহস করে শেষবারের মতো যখন বিজন রেখার কথাটা মা-কে জিজ্ঞাসা করেছিল সেটা প্রায় বছর তিন আগে তো হবেই। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ফাইনাল সেমিস্টার তখন সব চুকেছে। ব্যাঙ্গালোরে চাকরি জয়েন করার আর অল্প দিনই বাকি।

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

—'কেন রে বিজু রেখার খবর জিজ্ঞাস করছিস কেন হঠাৎ?' মায়ের প্রশ্নটায় বেশ থতমত খেয়েই গেছিল সেদিন বিজন।

—'না মানে এমনি, এই যে তুমি বললে বিকালে সায়া ব্লাউজ কিনতে বেরোবে তাই আর কি...। আগে তো ওরা বাড়ি এসেই দিয়ে যেত।'

—'না না, ওরা তো এ তল্লাট ছেড়ে অনেকদিনই হল চলে গেছে। কে জানে কোথায় গেছে।'

ব্যস! এর পর আর কোনোদিন রেখার নামটাও উচচারণ করেনি ও, আর কারোর মুখেও শোনেনি ও নাম। কিন্তু মনের ভাঁজে যে আজও একটা চিনচিনে ব্যাথা হয় ওর সেই মুখটা মনে পড়লে। ওই বৃষ্টি ভেজা বিকালটা যে আজও মাঝে মাঝে ঝাপসা ছবির মতো ফুটে ওঠে ওর অবচেতন মনের ক্যানভাসে।

তবে কি তখন রেখা চলে গেলেও আজকাল আবার এই পুরোনো তল্লাটে ফিরে এসেছে ও? লক্ষ প্রশ্ন এসে ঘিরে ধরছে বিজনকে। অল্প অল্প কাঁপছে বিজন বিছানায় বসে বসেই। ঝম ঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে আর সাথে গুমগুমে মেঘের ডাক। প্রকৃতি যেন তুলি দিয়ে আঁকতে চাইছে একটা বৃষ্টি ভেজা রূপকথা আবার, ঠিক সেই দিনের মতো... সেই বিকেলটার মতো।

২

—'বিজু বাবা,' ...ডাকটায় থমকে দাঁড়াল বিজন। ও বেরচ্ছিল বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে। আর তো কটা দিনই হবে এই আড্ডা। এর পর তো ও চলেই যাবে দিল্লিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে নামজাদা কলেজে।

banglabookspdf.com

বিজন কে ডেকেছে লেখা মাসি। এই ভদ্রমহিলা ওদের বাড়িতে আসে মাঝে মাঝেই। মা-কে সায়া ব্লাউজ এসব এসে দিয়ে যায় মায়ের অর্ডার মতো।

—'হ্যাঁ মাসি বলুন' একটু ভারিক্কি চালেই বলল বিজন। হ্যাঁ বিজন ওর বয়সি অন্য ছেলেদের তুলনায় একটু গম্ভীর প্রকৃতির। সে তো হবেই। ছোটো থেকেই বিজন ক্লাসের টপার। সব স্যারদের চোখের মণি ও। তা ছাড়া বিজন নামকরা হার্ট স্পেশালিস্ট সৃজন রায়ের ছেলে। ওর মা'ও কলেজের অধ্যাপিকা। এ হেন ছেলে যে অন্য পাঁচটা ছেলের থেকে বেশ কিছুটা আলাদা হবে সে তো বলাই বাহুল্য।

যদিও বিজন কিন্তু ছোটো থেকে এমন আলাদা হতে চায়নি। কিন্তু সেই শৈশব থেকেই বাবা মা মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন ওর মাথায় ভালোভাবে যে বাকি পাঁচটা ছেলের মতো চলতি স্রোতে গা ভাসাতে ও আসেনি। ওকে সবার থেকে আলাদা হয়ে নিজের পরিচয় বানাতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি... এসব শুনতে শুনতে আর বাবা মা'র কথা মেনে চলতে চলতে কখন যেন ওর বয়সি ছেলেদের থেকে সত্যি বেশ খানিকটা আলাদা হয়ে পড়েছে ও।

—'বিজু বাবা আমি খুব আনন্দ পেয়েছি বউদিদের মুখে কথা শুনে। তুমি কত্ত ভালো রেজাল্ট করেছ। কত্ত বড়ো কলেজে পড়তে যাচ্ছ। তুমি অনেক বড়ো হও বাবা।' লেখা মাসি বড্ড সরল ভাবে বলল কথাগুলো। অল্প হাসল বিজন।

www.banglabookspdf.com

—'দ্যাখ দ্যাখ এই বিজু দাদাকে দেখ, জানিস কত্ত ভালো পড়াশুনায়। পায়ের ধূলা নে গে যা।' এবার কথাগুলো মাসি বলল নিজের মেয়েকে। হ্যাঁ লেখা মাসির মেয়েটাও এ বাড়িতে মাঝে মাঝেই চলে আসে মায়ের সাথে। এমনিতে নাকি মেয়েটা পড়াশুনা করছে। ক্লাস এইটে পড়ছে। আবার তার পাশাপাশি মা-কে কাজে সাহায্যও করে। বড্ড গরিব ওরা। তবুও বিধবা লেখা মাসি পড়াচ্ছে ওকে।

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

বিজন তাকাল মেয়েটার দিকে। আর অমনি কেমন যেন শিরশির করে উঠল ওর শরীরটা। মেয়েটা মিটিমিটি হাসছে বিজনের দিকে তাকিয়ে। বিজন তাকাতেই চোখ নামিয়ে নিল ও। সেই হাসি, সেই দৃষ্টি, শ্রদ্ধা, বিস্ময়, ভালো লাগা সব কিছু মেশানো ওই দৃষ্টি।

বিজন চিরকাল পড়াশুনা নিয়েই থেকেছে। মেয়েদের দিকে তেমন লক্ষ্য করেনি সেভাবে। তবুও যে অনেক মেয়ের ভালো লাগার পাত্রই নানা সময়ে হয়েছে ও তা বিজন ভালোই জানে। কিন্তু তাদের কারোর চোখেই বিজন নিজের জন্য অমন বিস্ময় মিশ্রিত ভালো লাগা দেখেনি। মুগ্ধতা দেখেনি নিজের জন্য। তাদের চোখে বিজন পেয়েছে কখনো শুধুই চটুল আবেদন আর নয়তো অতি সাধারণ তাৎক্ষণিক আকর্ষণের ভাষা।

আর প্রতিবার যখনই বিজন এই দৃষ্টিটা মেয়েটার চোখে দেখে তখনই শরীরে কেমন যেন একটা ঝিমঝিম ভাব লাগে ওর। ও আর বেশিক্ষণ যেন ধরে রাখতে পারে না নিজের আবেগকে। পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে মেয়েটার সামনে থেকে।

আজও তার অন্যথা হল না। ঘিয়ে সালোয়ার আর রেখার এলোমেলো উড়ন্ত চুলগুলো যে আস্তে আস্তে বিজনকে অবশ করে দিচ্ছে সেটা বেশ বুঝতে পারল ও।

—'মা, আমি আসছি...' জোরে একটা হাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল বিজন। না, না, না। বিজন কোনোদিন এসব নিয়ে ভাবেনি আর আজও ভাববে না। সামনে চূড়ান্ত অধ্যাবসায়ের দিন আসছে ওর। ওকে বড়ো হতে হবে। অনেক উপরে উঠতে হবে। এসব বিজনের জন্য নয়, আর রেখার মতো মেয়ে তো নয়ই।

banglabookspdf.com

৩

সেই বহু বছর আগে রেখার গলা পেলে বা ওকে চোখের সামনে দেখলে যে ঝিমঝিমে ভাবটা জাগত বিজনের শরীরে আজও সেটাই যেন জাগছে।

আজ তবে এত্ত গুলো বছর পরে যদি রেখা ওকে চোখের সামনে দেখে তাহলে কি করবে? ঘৃণা ভরা কোনো দৃষ্টি ছুঁড়ে দেবে কি? নাকি আজও ওর চোখের ভাষায় খেলা করবে কোনো বিস্ময়?

আচ্ছা কেমন দেখতে হয়েছে এখন রেখাকে? সেই ভাসা ভাসা গভীর চোখ আর সেই ঠোঁট... আর ঠোঁটের পাশের তিলটা? সেটাও নিশ্চয় একই আছে এখনও? রেখার কি আদৌ মনে আছে বিজনকে?

হ্যাঁ নিশ্চয় আছে। সেই সন্ধ্যাটা যখন বিজন ভুলতে পারেনি তেমন রেখাও কি ভুলতে পেরেছে? আচ্ছা রেখা কি বিয়ে করেছে? এখন কি সংসারী ও?

ধুপ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল আবার বিজন। বুকের ভিতর উথাল পাথাল করছে। জোর করে কানে গুঁজে দিল হেডফোন।

চারপাশের সবটুকু থেকে এই মুহূর্তে নিজেকে সরিয়ে নিতে চায় ও। কিন্তু হচ্ছে না। কিছুতেই হচ্ছে না। মনটাকে নিজের বশে বন্দি কিছুতেই করতে পারছে না বিজন।

—'এই তুমি কি ঘুমাচ্ছ?' বিজনের মনের মতোই আঁধার ছড়ানো ঘরটায় ঢুকেই সাদা ফ্যাটফ্যাটে টিউব লাইট জ্বালাল সুমি, মানে সম্বন্ধ করে বিয়ে করা বিজনের ছয় মাসের পুরোনো স্ত্রী।

www.banglabookspdf.com

—'না মানে হ্যাঁ ওই'... খাপছাড়া জবাব দিল বিজন।

—'এই চল না একবার। একজন মহিলা এসেছেন। কী সুন্দর সুন্দর ব্লাউজ এনেছেন আর সাথে কুর্তিও। আমি তো বুঝতেই পারছি না কোনটা ছেড়ে কোনটা নেব। প্লিজ চল না একবার। মা শুধু মানা করছিল তোমায় ডাকতে... কিন্তু আমিই বললাম যে বিজুই বেছে দেবে আমায়। চল না চল না প্লিজ।' নিজের স্বভাব সিদ্ধ আহ্লাদী চালে আব্দার জুড়েছে সুমি।

সুমি মেয়েটা বড্ড সরল। বিয়ের প্রথম রাতেই বিজনকে বলেছিল নিজের এক বছর টিকে থাকা প্রেম আর সেই প্রেমিকের সাথে ও প্রথম আর শেষ চুম্বনের গল্পটা।

এই সুমিই এখন বিজনের বুক জুড়ে। কিন্তু তবুও কেন যে অবাধ্য ফ্ল্যাশব্যাকের মতো মাঝে মাঝেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই মুখটা...

না, সুমি নিজের প্রথম প্রেমের কথা বললে বিজন ওকে বলতে পারেনি রেখার ব্যাপারে। কিই বা বলত! রেখা তো আর বিজনের প্রেমিকা ছিল না। বন্ধুও ছিল না। তাহলে কে ছিল রেখা ওর? কেউ ছিল না তো। নামহীন সম্পর্ক? না তাই বা কোথায়? সম্পর্ক তো অনেক গভীর শব্দ। ওদের মধ্যে অত ব্যাপ্তি কোনোদিন ছিল কি?

—'এই কি হল? চল না... চল না'... এবার বিজনের হাত ধরে টানছে সুমি।

—'না সুমি প্লিজ, প্লিজ আমায় ছাড়'... গলাটা শুকিয়ে আসছে বিজনের। রেখার সামনে বউয়ের হাত ধরে যাবে ও? কী ভাববে রেখা? মাথা উঁচু করে চলা প্রথম সারির ইঞ্জিনিয়ার বিজন রায় কি আরও এক ধাপ নীচু হয়ে যাবে না তাতে ওই সাধারণ মহিলার কাছে? অবশ্য এমনিতেই কি রেখার চোখে উঁচু আছে ও? কিন্তু... কিন্তু রেখা কি জানে, ও কি মানবে যে সত্যি আজও একটু হলেও ও বেঁচে আছে বিজনের স্মৃতিতে?

আস্তে আস্তে সুমির হাত ধরে এগোচ্ছে বিজন। এগোচ্ছে অতীতের দিকে, এগোচ্ছে অনেক বছর আগের বৃষ্টি ভেজা একটা বিকেলের দিকে।

banglabookspdf.com

৪

দুমদুম করে জানলার পাল্লাগুলো এলোমেলো লাফালাফি করছে শুনেই বিজন বুঝতে পারল ঝড় উঠেছে নির্ঘাত।

দ্রুত পায়ে জানালাগুলো বন্ধ করার জন্য এগোল ও।

—'আঃ.... উফ!' ককিয়ে উঠল ছেলেটা। জানালা বন্ধ করতে যেই যাবে অমনি ঝড়ের দাপটে অবাধ্য একটা পাল্লা এসে আছড়ে পড়ল বিজনের কপালের উপর।

কেটে গেছে কপালের বেশ কিছুটা। কোনোমতে খোলা জানালা দুটো বন্ধ করে বাথরুমে ছুটল বিজন, ডেটল লাগাতে হবে কপালে।

ধুর! কোথায় যে গেল ডেটলের শিশিটা! অন্ধকারে হাতড়াচ্ছে বিজন। ঝড়ের প্রকোপে আলো নিভে গেছে যে। ডেটল খুঁজে না পেয়ে বাথরুম ছেড়ে বেরিয়ে এল ও।

www.banglabookspdf.com

বাইরে বসার ঘরে একলা বসে রয়েছে ও ভূতের মতো। একটা মোমবাতির ফিকে হলুদ শিখা আলো ছড়াচ্ছে ঘরে।

আসলে বাড়িতে আজ কেউ নেই। বাবা মা গেছেন খড়গপুরে দিদার বাড়ি। দিদার শরীরটা হঠাৎ বেশ খারাপ করেছে কিনা। ওরা গেছে আজ সকালে আর ফিরবে কাল। বিজনের জন্য সব রান্না সেরে রেখে গেছে রান্না দিদি। এমনিতে তো আজ রাতে ওদের বাবার বন্ধুর মেয়ে শিলা দিদির বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে যাবার কথা ছিল। কিন্তু দিদার শরীর খারাপ হওয়াতেই ভেস্তে গেল সব। আজ রাতে বাড়িতে একাই থাকতে হবে বিজনকে।

আর তো মাত্র কটাই দিন এই বাড়িতে। পাঁচ দিন পরেই তো বিজন চলে যাচ্ছে দিল্লি। নতুন জীবনের আহরণে।

ঠুক ঠুক ঠুক... দরজায় কড়া নাড়ছে কেউ। শুনতে পেল বিজন। কে এল এই বৃষ্টির মধ্যে?

—'কে? কে?' দু-বার হাঁক ছাড়ল বিজন।

—'আমি। আমি রেখা।' পলকে রিনরিনে স্বরটা ঝংকার তুলল বিজনের বুকে।

—'না মা বাড়িতে নেই। দিদার বাড়ি গেছে। খড়গপুরে গেছে। কাল ফিরবে।' দরজা খুলে বলল বিজন।

—'ও। আসলে মা এই ব্লাউজ দিয়ে যেতে বলল। মায়ের শরীরটা ভালো নেই তো। আর কাকি অর্ডার দিয়েছিল আজ বিয়ে বাড়ি যাবার জন্য।' কেমন মায়াবী স্বরে যেন বলল মেয়েটা কথাগুলো।

ভিজে গেছে রেখা। ওর সারা চোখে মুখে এলোমেলো বৃষ্টির ফোঁটা। আকাশি সালোয়ার ভিজে গেছে। চুল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল। আর চোখে সেই দৃষ্টি। মুগ্ধ নয়নে আজও মেয়েটা যথারীতি জরিপ করছে বিজনকে।

আবার... আবার যেন নিজের স্নায়ুর ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে বিজন।

—'এমা একি! আপনার কপালে যে রক্ত? কী করে হল?' কাঁপা স্বরে বলে উঠল রেখা।

—'না ও কিছু না।' বলে আবার পালাতে চাইল বিজন।

—'কিছু না বললেই হল?' বিজনকে ঠেলেই এবার ভিতরে ঢুকে এল রেখা।

ফ্যাচ করে নিজের ওড়না ছিঁড়ে অপটু হাতে বেঁধে দিচ্ছে বিজনের ক্ষতস্থান। উফফ! কী সাংঘাতিক মায়াবী স্পর্শ। বিজন বুঝতে পারল ওর শরীরের ঝিমঝিমানিটা বেড়ে চলেছে আরও শতগুণ।

—'এমন হল কী করে? ইশশ! অনেকটা কেটে গেছে যে।' অনেক কথা বলে চলেছে রেখা। সব ঠিক মতো কানে ঢুকছে না বিজনের। ও আস্তে আস্তে কাবু হয়ে যাচ্ছে রেখার গা থেকে ভেসে আসা অদ্ভুত গন্ধটায়। জীবনে প্রথমবার... প্রথমবার কোনো মেয়ে ওর এত্তটা কাছে।

হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল বিজনের মাথার মধ্যে। খপ করে চেপে ধরল ও রেখার একটা হাত। চমকে উঠল রেখা।

—'রেখা, রেখা ভালোবাসবে আমায়? প্লিজ। আমি... আমি...' ঘোর লাগা স্বরে বলে উঠল বিজন।

www.banglabookspdf.com

—'এসব কী বলছেন? কোথায় আপনি আর কোথায় আমি? আমার যে কোনো যোগ্যতাই নেই আপনার পাশে দাঁড়ানোর। আমি যে খুব সাধারণ।'

—'না না আমি জানি না। এসব আমি মানি না...' বলতে বলতেই ঝপ করে নিজের ঠোঁটটা ডুবিয়ে দিল বিজন রেখার ঠোঁটে। বুঝতে পারল রেখা কাঁপছে এক অদ্ভুত ভালো লাগায়। বৃষ্টি ভেজা একটা সন্ধ্যা আর মোমের দুলন্ত শিখাকে সাক্ষী করে বিজনের ঠোঁট আস্তে আস্তে নামছে রেখার শরীর ছুঁয়ে। গলায়, কাঁধে আর তারপর বুকে। ভীষণ বেপরোয়া আজ বিজন। আর রেখাও যেন সমর্পিত হরিণী।

বিজনের হাত আস্তে আস্তে প্রবেশ করছে রেখার ভিজে যাওয়া কুর্তির একদম গভীরে। প্রথমবার ও অনুভব করছে নারী শরীর, পাগল করে দিচ্ছে ওকে রেখার প্রস্ফুটিত যৌবনের স্পর্শ।

—'আমি আসি আজ...' হঠাৎ ঝপ করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রেখা। বিজন কিছু বলার আগেই দৌড়ে বেরিয়ে গেল বৃষ্টি ভেজা অন্ধকারের মধ্যেই।

কয়েক মুহূর্ত স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বিজন। কেমন যেন একটা ঘোর লাগা ভাব। কিন্তু ঘোরটা কাটতেই ওকে পেয়ে বসল একটা মারাত্মক ভয়।

ছি ছি ছি! এটা কি করতে যাচ্ছিল ও? আর কি করেই বা ফেলল? রেখা যদি কাউকে কিছু বলে দেয়? ভালো ছেলে হিসাবে যে সুনামটা অর্জন করেছে ও সেটা তো নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। আর বাবা মা?

মা তো বোধ হয় আত্মহত্যাই করে নেবে। আর বাবা? বাবা তো নির্ঘাত তাড়িয়ে দেবে ওকে। শেষে কিনা ডক্টর সৃজন রায়ের ছেলের সাথে একটা ফেরিওয়ালার মেয়ের... ছি ছি! ঘেন্না ঘেন্না। কাউকে যে আর মুখ দেখাবার যো থাকবে না ওর।

পা কাঁপছে এবার বিজনের। নাঃ বেমালুম চেপে যেতে হবে সবটা। কিন্তু রেখা যদি ব্ল্যাক মেল করে? কিন্তু কি প্রমাণ আছে এসবের? কোনো প্রমাণ নেই। কাজেই রেখা যদি কাউকে কিছু বলেও দেয়ে ওকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করা এমন কিছু কঠিন হবেই না বিজনের জন্য। হ্যাঁ ভুলে যেতে হবে বেমালুম এই সন্ধেটা। আর তো মাত্র পাঁচ দিন পরেই ও চলে যাচ্ছে দিল্লি। তারপর আর রেখা ওকে চাইলেই বা পাচ্ছে কোথায় ব্ল্যাকমেল করার জন্য!

৫

—'এই আমায় বেছে দেবে কিন্তু কুর্তি।' হিড়হিড় করে বিজনকে টানছে সুমি।

টিপটিপ করছে বিজনের বুকের ভিতর। না সেই সন্ধ্যার পর আর কোনোদিন রেখার সাথে সেভাবে দেখা হয়নি ওর। দিল্লি যাবার পর প্রায় গোটা দু-বছর নানা ছলে এড়িয়ে গেছে ও কলকাতায় আসা, শুধু রেখার সাথে মুখোমুখি হবার ভয়ে। তবে রেখাও যে ওসব কথা কাউকে বলেনি সেটা দিল্লিতে বসেও বুঝেছিল বিজন।

দু-বছর পরে দিল্লি থেকে সাতদিনের জন্য কলকাতায় ফিরে মায়ের কাছে শুনেছিল লেখা মাসি এখন খুব কম আসে মায়ের কাছে। আর রেখা তো একদমই আসে না।

www.banglabookspdf.com

তবুও সেই বারেই রাস্তায় কীভাবে যেন একদিন দেখা হয়েই গেছিল রেখার সাথে। না ওর মুখের দিকে ভালো করে তাকাতেও সাহস হয়নি সেদিন বিজনের। কোনো মতে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল ও। রেখাও ওর দিকে তাকিয়েছিল কিনা সেদিন লক্ষ্য করা হয়নি। তবে রেখা ওর একদম পাশ ঘেঁষে চলে গেছিল।

সেদিন ফিরে নিজের পকেট থেকেই একটা চিরকুট খুঁজে পেয়েছিল বিজন। সাদা কাগজে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—

'বৃষ্টির ফোঁটা দিয়ে রূপকথা লেখা হলেও সেটা মুছে যায়
আমি জানি। বৃষ্টির রূপকথা যে বড়োই মায়াবী, বড়োই ক্ষণিক।'

ভাল থাকবেন।

চিরকুটটা পরে সেদিন বুকের ভেতর মুচড়ে উঠেছিল বিজনের। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার ফিরে এসেছিল সেই ভয়টা। সামাজিক স্টেটাস হারানোর ভয়, খারাপ ছেলের বদনাম কুড়ানোর ভয়। সেই শেষ। আর কোনোদিন দেখা হয়নি তার সাথে। তারা তো নাকি চলেই গেছিল এই তল্লাট ছেড়ে।

হ্যাঁ রেখা ঠিক বলেছিল বৃষ্টির রূপকথা বোধ হয় সত্যি মুছে যায়, কিন্তু তার দাগটুকু যে মুছে গিয়েও মোছে না। তাই তো আজও মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে বিজন দেখতে পায় অনেক পুরোনো সেই বৃষ্টি বিকেলটাকে আবছা ভাবে।

—'দিদি এই যে আমার বর। ওর পছন্দ খুব ভালো। ওই বেছে দেবে কুর্তি।' পিছন করে বসে আছে রেখা বিজনের দিকে। আর বিজনের বুকে একসাথে লক্ষ দামামা বাজছে। এত বছর পর আবার রেখার মুখোমুখি ও। আবার রেখার চোখে চোখ পড়বে। মিলিয়ে যাওয়া রূপকথার মতো হারিয়ে যাওয়া কয়েকটা মুহূর্ত আবার ভাসবে ওদের দুজনের মাঝে।

—'এই এসো না এদিকে।' ...বিজনের হাত ধরে টেনে নিয়ে এল মহিলার সামনে সুমি।

চমকে উঠল বিজন। না। এ তো রেখা নয়। এ তো অন্য একজন মহিলা।

—'বিজু, এটাই তপু দিদি। ইনিই ব্লাউজ দিয়ে যান মা-কে। তপু দিদি ইনি আমার পতিদেব।' হি হি হাসছে সুমি।

চোয়াল ফাঁক করল বিজনও। হঠাৎ যেন কেমন বেবাক ফাঁকা লাগছে বুকের ভিতরটা। না এটা রেখা নয়। হবেই বা কী করে? রেখা তো অজানা কোনো এক ঠিকানায় হারিয়ে গেছে। নাঃ, রেখার সাথে আর কোনোদিন দেখা হয়তো এ জীবনে হবে না। ও নিজেই হয়তো আর হতে দেবে না। কারণ মায়াবী চোখের মেয়েটা যে জানত বৃষ্টির রূপকথা হারিয়ে যায়, ধুয়ে যায় তার গল্প।

সুমি হাসছে আর কুর্তি দেখছে। ওর দিকে অপলক তাকিয়ে রইল বিজন কয়েকটা মুহূর্ত। না, আজ সুমিকে রেখার ব্যাপারে বলবে বিজন। যেমন সুমি জানিয়েছিল নিজের প্রথম প্রেমের কথা, তেমন বিজনও জানাবে আজ সুমিকে। হ্যাঁ রেখাই বিজনের প্রথম প্রেম। সেই স্বীকৃতি আজ দেবে ও সেই সন্ধ্যার মুহূর্তটাকে। নিজের জীবনের বৃষ্টির রূপকথার জলপরীর এই সম্মানটুকু সযত্নে ও বাঁচিয়ে রাখবে এবার থেকে সারা জীবন।

www.banglabookspdf.com

—

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

অর্ধাঙ্গিনী

ইরার কথা

দু-চোখ ভর্তি আগুন নিয়ে ইরাবতী তাকিয়ে রইল সংগ্রাম চৌধুরীর চলে যাওয়াটার দিকে। কী সাঙ্ঘাতিক অপমান! দীর্ঘ চার বছর বিবাহিত জীবন পার করার পর লোকটা এভাবে প্রত্যাখ্যান করল আজ ইরাকে! শুধু ইরা সন্তানের জন্ম দিতে অক্ষম বলে! না, কষ্ট হচ্ছে না ইরার। বরঞ্চ একটা কালো অপমানের জ্বালায় ছেয়ে যাচ্ছে বুকের ভিতরটা। এখনও কানে বাজছে কথাগুলো।

—'না ইরা না। এভাবে নিষ্ফল এই জীবনে আমি আর বাঁচতে চাই না। বাবা ডাক আমি শুনবোই। তাই আমি যমুনাকে বিয়ে করব। তোমায় চলে যেতে আমি বলছি না। তুমি যেমন আছ থাক। আমি নতুন ঠিকানা খুঁজে নেব আমার আর যমুনার জন্য।'

হ্যাঁ কেন চলে যাবে ইরা? না ও যাবে না। এই সংসার ওর নিজের হাতে সাজানো। তাই চলে যাবার কোনো প্রশ্নই নেই। আর সংগ্রাম চৌধুরীকেও এত সহজে ওকে ঠকাতে দেবে না ইরা। যে অপমান আজ ওকে পেতে হল সেই অপমানের জ্বালায় জ্বলবে ওই লোকটাও। হ্যাঁ প্রতিশোধ নেবে ইরা। প্রতিশোধ। এমন প্রতিশোধ নেবে যাতে জীবনেও আর কোনোদিন কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে এভাবে ছেড়ে চলে যেতে না পারে। হ্যাঁ, ইরা এমন শাস্তি দেবে সংগ্রামকে যাতে সেটা যুগযুগ ধরে নজির হয়ে থাকে সংগ্রামের মতো আরও অনেক ভালোবাসাবিহীন, নির্দয়, লম্পট স্বামীর জন্য।

সুলেখার কথা

বিছানা খামচে বালিশে মুখ গুঁজে হাপুস নয়নে কাঁদছে সুলেখা। ওর যে সব শেষ হয়ে গেল। দীপ এভাবে পারল ওকে ছেড়ে চলে যেত? হ্যাঁ, এটা ঠিক যে এক বছরের এই বিবাহিত জীবনে দীপ যে ওকে কখনোই সেভাবে নিবিড় করে ভালোবাসেনি সেটা বুঝতে পারত সুলেখা। কিন্তু তবুও মুখে কিছু বলত না। বরঞ্চ সব সময় চেষ্টা করত দীপের মন বুঝে চলার, ওকে খুশি করার। কিন্তু, তবুও কোনো মেয়ে কি পারে নিজের স্বামী অন্য মহিলার প্রতি আসক্ত এটা জেনেও মুখ বুজে থাকতে।

সন্দেহটা সুলেখার মাস খানেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। আর আজ সিলমোহর পড়ল তাতে। আর নিজের কদর্য চেহারাটা এভাবে সামনে চলে আসাতেই বোধ হয় এত হিংস্র হয়ে উঠল আজ দীপ।

রোজকার মতোই স্কুল থেকে ফিরে এসে আজ বাথরুমে গেছিল দীপ ফ্রেশ হতে। আর ওর মোবাইলটা পড়ে ছিল খাটের ওপর। হঠাৎ পরপর অনেক বার ম্যাসেজ টোন বেজে উঠল। আলো জ্বলে উঠল ফোনের। কি যে একটা সন্দেহ হল আজ সুলেখার। ফোনটা তাই হাতে টেনে নিয়েছিল।

www.banglabookspdf.com

ফোনটার স্ক্রিন লক নেই দেখে ম্যাসেজগুলো দেখার কৌতূহলটা আজ আর সামলাতে পারেনি সুলেখা।

অনেক ম্যাসেজ এসেছে হোয়াটসঅ্যাপে। যে ম্যাসেজ করেছে তার নাম অনুরিমা। নামটা চেনা সুলেখার। মেয়েটা নাকি দীপের সাথেই কলেজে পড়ত। মেয়েটা অনেকগুলো নগ্ন নারীর দেহের ছবি পাঠিয়েছে দীপকে। তার সাথে খুব কুরুচিকর কিছু জোকস। চোখ ফেটে জল এসে গেছিল সুলেখার সবটা দেখে। এত নোংরা ওর ঘরের মানুষটা! ব্যস্ত হাতে স্ক্রল করে দেখছিল কিছু আগের ম্যাসেজও। হ্যাঁ সবটা দেখে বুঝতে পারছিল সুলেখা যে দীপ আর ওই মহিলার নির্ঘাত কোনো অবৈধ খারাপ সম্পর্ক চলছে। দুঃখে অপমানে ফোনটা হাতে নিয়ে পাথরের মতো দাঁড়িয়েছিল সুলেখা।

—'কী ব্যাপার? আমার ফোন হাতে নিয়ে কী করছ তুমি?' দীপের তীব্র চিৎকারে চমকে উঠে বুঝেছিল সুলেখা কখন যেন বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে সে।

—'এত নোংরা তুমি? ছি! এভাবে দিনের পর দিন প্রতারণা করে চলেছ আমার সাথে? লজ্জা করে না তোমার নিজের স্ত্রী-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে?' নিজের মেজাজ আর ধরে রাখতে পারেনি সুলেখা।

দু-এক মুহূর্ত চুপ ছিল দীপ। তাই পরই ফেটে পড়েছিল তীব্র আস্ফালনে।

—'তোমার স্পর্ধা হয় কী করে আমার মোবাইল চেক করার? আমার দিকে আঙুল তোলার আগে দেখেছ তুমি নিজে কি? কুৎসিত মহিলা একটা। স্বামীকে সুখী করার কোনো ক্ষমতাই নেই তোমার। না আছে রূপ। না আছে কোনো গুন।'

—'কি বললে তুমি? আমি কুৎসিত? লজ্জা করে না তোমার এই কুৎসিত মহিলার বাবার বাড়িতে থাকতে, তার বাবার পয়সায় খেতে?'

সুলেখার শেষ কথাগুলোর পর আর দাঁড়ায়নি দীপ এক মিনিটও। দড়াম করে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেছে বাড়ি ছেড়ে। আর যাবার সময় বলে গেছে—

—'আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না তোমার আমার এর পরে। ডিভোর্স এর নোটিশ পাঠিয়ে দেব আমি।'

আজ চলে গেল দীপ। সুলেখা জানে আর ও ফিরবে না। প্রচণ্ড জেদি ও। হ্যাঁ সুলেখা এবার মামলা, কেস, কোর্ট অনেক কিছুই করতে পারে। কিন্তু লাভ কি তাতে? মানুষটা তো আর ফিরবে না।

সুলেখা যে থাকতে পারবে না দীপকে ছাড়া। ও যে ওকে বড্ড ভালোবেসে ফেলেছে। বাড়িতে কী বলবে বাকিদের? সবাই যে দীপকে বড্ড ভালো বলে জানে।

এবার কি তাহলে সুখেলাকে সারাজীবন ডিভোর্সি মেয়ে হয়ে বাঁচতে হবে আর সবাই বাঁকা চোখে দেখবে ওকে? ফিসফাস করবে ওর আড়ালে? না না না। এগুলো সহ্য করতে পারবে না ও।

সুলেখা আর একবার ডায়াল করল দীপের মোবাইল নম্বর। না এখনও সুইচ অফ বলছে। না, আর বাঁচতে ইচ্ছে করছে না সুলেখার। হ্যাঁ শেষ করে ফেলবে ও নিজেকে। এই একটাই পথ জীবনের

www.banglabookspdf.com

আসন্ন যন্ত্রণাগুলো থেকে মুক্তি পাবার। সুলেখা মরবে। মরে ভূত হয়ে ও ঠিক টাইট করবে ওই অনুরিমাকে, আর সাথে দীপকেও।

১

ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরটায় ভূতের মতো বসে আছে দীপ। সারাদিনের ক্লান্তি আর ঘুমে দু-চোখের পাতা ভারী হয়ে এসেছে, কিন্তু তবুও আজ ও ঘুমাবে না কিছুতেই। আজ ওকে সব রহস্য ভেদ করতেই হবে।

সব, সব হয়েছে ওই মেয়েটার জন্য। সুলেখাই দায়ী সব কিছুর জন্য।

দীপ খুব নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। কলকাতায় বাড়িও নয় ওদের। বাড়ি মেদিনীপুর জেলার একটা অখ্যাত গ্রামে। বাবা মার যান খুব ছোটোবেলায়। তারপর থেকে মা খুব কষ্ট করে মানুষ করেছেন ওদের। তবে বাকি সব ভাই বোনদের মধ্যে ওর আদর যত্নটাই সবচেয়ে বেশি ছিল মায়ের কাছে। কারণ দীপেরই পড়াশুনার মাথা সবচেয়ে ভালো সবার মধ্যে।

মা ওকে ভালো রাখার সবটা চেষ্টা সর্বদা করতেন ঠিকই কিন্তু তাতে মন ভরত না দীপের। ওর সব সময় ইচ্ছে করত অনেকটা বেশি কিছু পেতে। ওদেরই গ্রামের ছেলে সমর, প্রায়ই কলকাতায় আসত মামা বাড়িতে। আর ফিরে যেত যখন তখন ওর হাতে থাকত কলকাতার দামি জামা প্যান্ট, ঘড়ি, পারফিউম আরও কত কিছু। দীপেরও ইচ্ছে করত ওগুলো পেতে। কিন্তু কে দেবে ওকে? তাই মনের ইচ্ছে মনেই গুমরে মরে যেত।

এভাবেই আস্তে আস্তে বড়ো হচ্ছিল দীপ। শৈশব শেষ হয়ে গেল। এল কৈশোর। আর বদলাটা শুরু হল তখন থেকেই। দীপের অনেক বন্ধুই প্রেম করতে শুরু করল। অনেকে প্রেমে পড়তে শুরু করল। কিন্তু দীপের ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। না বিশেষ কোনো মেয়েকে দেখে মানসিক পরিবর্তন, ভালো লাগা এসব হত না দীপের। দীপকে শুধু টানত মেয়েদের শরীরটা। যে কোনো মেয়ের শরীর নয়, সুন্দরী আর যৌন আবেদন পূর্ণ নারী শরীর। সুডৌল স্তন, ভরা নিতম্ব সম্পন্ন মেয়েদেরকে একদম কাছ থেকে পেতে ভীষণ ইচ্ছে করত দীপের। ইচ্ছে করত যৌনতা মাখানো শরীরগুলো ছিঁড়ে খুঁড়ে ভোগ করতে।

কিন্তু দীপ খুব সাধারণ একটা গ্রামের একটা নিম্ন মধ্যবিত্ত ছেলে। তাই এই ধরনের নিষিদ্ধ ইচ্ছে যে ওর পূরণ হাতে পারে না তা বলাই বাহুল্য।

শেষ হয়ে গেল দীপের স্কুল জীবন। পা রাখল ও কলেজের দোরগোড়ায়। কলেজে পড়তে শহরে চলে এল। শহরের মেয়েগুলো অনেক আলাদা। এরা সবাই অনেক মডার্ন, স্মার্ট, ঝকঝকে। দীপের মনে হত যেন মনি মুক্ত খচিত খোলা সিন্দুক ওর সামনে পড়ে, শুধু দু-হাত ভরে সবটুকু নিজের করে নেবার অপেক্ষা।

কিন্তু মনে হওয়া আর বাস্তবের মধ্যে অনেক তফাৎ থাকে। দীপের যাই মনে হোক না কেন, আসলে দীপ একটা গ্রামের সাধারণ ছেলে, বেশ গরিব। আর দেখতেও নেহাতই সাদা মাঠা। তাই দীপের প্রতি আকৃষ্ট হবেই বা কেন কেউ। না কোনো মেয়েই পাত্তা দিত না তেমন দীপকে। মাথার

www.banglabookspdf.com

মধ্যে তখন কেমন যেন আগুন জ্বলত দীপের। ইচ্ছে হত ঝাঁপিয়ে পড়ে সব মেয়েগুলোকে ছিঁড়ে খুঁড়ে নিতে।

কিন্তু সবার দিন তো আর সব সময় খারাপ একই ভাবে চলে না। তাই দীপের জীবনেও এল অনুরিমা। দীপের কলেজেরই মেয়ে। পড়াশুনায় বেশ খারাপ, কিন্তু যৌন আবেদন বেশ ভালোই। না দীপের ঠিক মনের মতো না হলেও, খুব মন্দ নয়। দীপের খরার জীবনে একমাত্র মরূদ্যান। অনুরিমার সাথে সম্পর্ক হয়েছিল দীপের। শরীরী বিভঙ্গে মাতাতে, আর শরীরী রহস্য জালে খেলাতে মেয়েটা নেহাত কম জানে না। অনুরিমাতে বেশ ভালোই বুঁদ ছিল দীপ। শরীর এর পরিবর্তে মেয়েটাকেও খুশি রাখতে হত দীপকে। মেয়েটা গরিব ঘরের। কিন্তু স্বপ্ন তার আকাশ ছোঁয়া। দামি জমা কাপড়, মেক আপ, জুতো সর্বদা চায় সে। তার সে সব চাহিদা মিটিয়ে তাকে খুশি রাখত দীপ। আর অনুরিমাকে খুশি করতে করতে যে আসলে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছিল দীপ, যেটা ও বুঝতেই পারেনি। মায়ের পাঠান টাকা, নিজের টিউশনির টাকা সব কিছু খুইয়েও অনুরিমাকে খুশি রাখতে দীপ তখন মত্ত। এদিকে পড়াশুনায় ঢিলে, রেজাল্টও খারাপ হতে শুরু করল দীপের।

গ্র্যাজুয়েশন এ চরম খারাপ রেজাল্ট হল। আর তার সাথেই খবর এল মায়ের মৃত্যুর। মাথায় তখন আকাশ ভেঙে পড়ল ওর। এদিকে অনুরিমাও আস্তে আস্তে তখন পাত্তারি গোটাচ্ছে দীপের থেকে। কারণ বিরাট সাইজের একটা রাঘব বোয়াল তখন ধরা পড়েছে তার জালে।

দীপের পকেটের হাল এতই খারাপ যে সামনের মাসে মেসের ভাড়া ঠিক ভাবে দেবার সংগতি নেই, আর ঝুলিতে সংগ্রহ বলতে একটা চরম খারাপ রেজাল্ট। এই সব কিছুর কামড়ে যখন দীপের প্রায় আধ পাগল অবস্থা, তখন কীভাবে যেন একদিন দেখা হয়ে গেছিল রাস্তায় তপন কাকুর সাথে। তপন কাকু, যে কিনা এককালে ওর বাবার বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল। ছোটোবেলার বন্ধু।

—'আরে দীপ, তুই কলকাতায়? কবে এসেছিস? কি করছিস এখন? আমাকে একবার জানাসনি বাবা?'

দীপ বুঝে গেছিল এই তপন কাকুকে যদি কোনোভাবে এখন একবার পটিয়ে ফেলা যায় আর এই মালদার বড়োলোকটার বাড়িতে কোনোভাবে ঢুকে পড়া যায় তাহলে কলকাতায় ফ্রিতে থাকা খাবার একটা ডেরা জুটে যাবে।

হ্যাঁ তপন কাকুর সহানুভূতি সেদিন বেশ কৌশলে কুড়িয়ে নিয়েছিল দীপ। বাপ মা মরা ছেলে, কলকাতায় কীভাবে ঠগদের পাল্লায় পড়ে অনেক টাকা খুইয়েছে এই নিয়ে গল্পটা এত ভালো সেদিন শুনিয়েছিল দীপ, যে ইচ্ছে করছিল নিজেরই পিঠ চাপরে দিতে।

—'তুই এবার থেকে আমার বাড়িতেই থাকবি। ওখানে থেকে পড়াশুনা করবি। আমার এত বড়ো বাড়ি থাকতে বিজয়ের ছেলে মেসে থাকবে এ হয় নাকি?'

উফফ! সেদিন যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছিল দীপ। ওই বাড়িতে ব্যবস্থাটা পাকা হয়ে গেছিল। সবই ঠিকঠাক চলছিল। শুধু দীপের মাথাটা জ্বলে যেত তপন কাকুর ডিগডিগে রোগা কালো ন্যাকড়ার মতো মেয়েটাকে দেখলে। দীপকে দেখলেই দাঁত কেলিয়ে হাসত মেয়েটা। উফফ! বাবা! ঠিক যেন

www.banglabookspdf.com

ভাল্লুক শাঁকালু খাচ্ছে। যত সম্ভব দীপ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করত ওকে। এরকম মেয়ে ওর জাস্ট সহ্য হয় না।

আবার আস্তে আস্তে ভালো দিন ফিরতে শুরু করল দীপের। রেজাল্ট খারাপ হলেও বছর দুয়েকের মাথায় একটা চাকরি পেয়ে গেল দীপ। প্রাইমারি টিচারের চাকরি। মায়নে খুব মার কাটারি না হলেও সরকারি চাকরি তো বটে। আর সেই বীভৎস ঘটনাটা দীপের জীবনে ঘটল তখনি। চাকরি জয়েন করার দু-একদিন পর তপন কাকু ওকে ডাকলেন।

—'দীপু, আমি জানি তুই ভালো ছেলে। দু-বছর ধরে তো দেখছি তোকে। আর সব থেকে বড়ো কথা হল তুই হলি গিয়ে বিজয়ের ছেলে। আজ ভগবানের আশীর্বাদে তুই সরকারি চাকরিও পেয়েছিস। আমি জানি তুই আরও উন্নতি করবি। তা বাবা, এবার তো সংসারীও হতে হবে। শোন বাবা, আমার মেয়ে সুলেখা তোকে খুব পছন্দ করে আমি জানি। আমি এও বুঝি যে তুইও পছন্দ করিস ওকে। তাই আমি চাই তাড়াতাড়ি তোদের চার হাত এক করে দিতে।'

তপন কাকুর কথাগুলো শুনে সেদিন শরীরের সব কটা হাড় একসাথে রাগে জ্বলে গেছিল দীপের। ওই দোমড়ানো জিভে গজার মতো মেয়েটাকে বিয়ে করবে দীপ? ভাবে কি লোকটা? কারোর ঘাড়ে ওকে গছাতে পারছে না বলে শেষমেষ বলির পাঁঠা দীপ হবে? ইচ্ছে করছিল তপন কাকুর টাক মাথাটা সজোরে দেওয়ালে ঠুকে দিতে। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও তো আর সব হয় না। তাই সেদিনও তেমন কিছু করেনি দীপ।

—'আমি একটু ভেবে জানাব কাকু।' বলে সময় চেয়ে নিয়েছিল। সত্যি ভেবেওছিল অনেক। দীপের যা মাইনে, তাতে বাড়িতে ভাই বোনদের টাকা পাঠিয়ে নিজের মেসে থাকার আর খাওয়ার খরচ চালিয়ে হাতে যা বাঁচবে তাতে কোনোদিনই ওর খুব বিলাসপূর্ণ জীবন পাবে না। আর পকেটে রেস্ত না থাকলে কেউ যে পোঁছে না তা তো জানেই দীপ। কিন্তু সুলেখাকে বিয়ে করে নিলে এ বাড়িতে ফ্রিতে থাকা খাওয়া আর ফুটানি তো চলবেই আর বাড়িতে পাঠানোর পর হাতে ভালোই বাঁচবে টাকা।

banglabookspdf.com

তাই বুদ্ধিমানের মতো সুলেখাকে নিজের জীবনে মেনেই নিয়েছিল দীপ। ওর ওই ন্যাতানো কালো শরীরটা রোজ রাতে দেখেই গা গুলিয়ে উঠত দীপের, কিন্তু তবুও ওকে সহ্য করত দীপ। মাঝে মাঝে অন্ধকার ঘরে অনুরিমাকে কল্পনা করে ওর শরীরটা খুঁড়ে দেখার চেষ্টা করত দীপ, কিন্তু না। ন্যাকড়া মোচড়ানোর অনুভূতি ছাড়া আর কিছু অনুভূতি আসত না।

তবুও যা হোক চলছিল জীবন। কিন্তু হঠাৎই এমন সময়ে আবার দীপের জীবনে ফিরে এল অনুরিমা। তার জাল ছিঁড়ে সেই রাঘব বোয়াল পালিয়েছে। তাই আবার তার মনে পড়েছে দীপের কথা। আর দীপের পকেটে তো এখন পয়সাও আছে। আবার অনুরিমার সাথে শরীরী খেলায় মেতে উঠেছিল দীপ, তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছিল নিজের যৌবন। কিন্তু হুট করে সব নষ্ট করে দিল ওই শয়তান মেয়েছেলেটা। এত সাহস কিনা দীপের ফোন চেক করে! ওর কাছে কৈফিয়ত চায়! না,

www.banglabookspdf.com

আর দেরি করেনি দীপ। এক কাপড়ে ছেড়ে চলে এসেছে ওই বাড়ি। হয়তো হঠকারি সিদ্ধান্ত এটা, কিন্তু তবুও... আর সহ্য হচ্ছিল না ওই মেয়েটাকে?

এই বাড়িটায় দীপ থাকছে তা প্রায় দিন পনেরো হল। আর তার পর থেকেই আস্তে আস্তে নানা বদল শুরু হয়েছে ওর জীবনে। আর এর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো বদল হল তনয়া। হ্যাঁ এখন দীপের মনে সব সময়ই ঘোরা ফেরা করে চলেছে তনয়া। অনুরিমা, ওর শরীর, পর্ণ সিনেমা আর কিচ্ছু এখন ভালো লাগছে না দীপের। দীপ নিজেই বুঝতে পারছে না কি হল ওর? তনয়াকে তো ও চেনেই না। তবুও কেন ওর জন্যই এত পাগল পাগল লাগছে ওর।

এ বাড়িতে উঠে আসার পর দিনই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টটা পেয়েছিল দীপ ফেসবুকে। তনয়া সরকার। ভীষণ সেক্সি কতগুলো ছবি প্রোফাইলে। দীপ এক ঝটকায় এড করে নিয়েছিল। এরকম সেক্সি মেয়ে দেখলেই এড করে নেয় ও। সেদিন রাত থেকেই শুরু হল চ্যাট। মেয়েটা খুব স্মার্ট। বুঝতেই পারছিল দীপ। আর প্রথম দিনেই দীপের ফোন নম্বর নিয়ে ফোন করেছিল ও। দীপ বদলে ফেলেছে পুরোনো ফোন নম্বর। সুলেখা বা ওর পরিবারের ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আপাতত পড়তেই চায় না ও। যাক কটা দিন, তারপর না হয় পাঠান যাবে ডিভোর্সের নোটিশ।

যাই হোক, তনয়া মেয়েটার সাথে প্রথম কথা বলতে গিয়ে থমকে গেছিল দীপ। মেয়েটা যাকে বলে আর কি দারুণ বোল্ড। দু-একটা কথা বলার পরেই বলেছিল—

—'জান তোমায় কেন এড করলাম? কারণ তোমায় দেখেই বুঝেছিলাম তোমার মধ্যে সেক্সের একটা urge আছে, যেটা সবার থাকে না। আমি ঠিক এমন ছেলেই পছন্দ করি। জান, আমি ডিভোর্সি, আমার হাজব্যান্ডের থেকে সেক্সুয়ালি স্যাটিসফাই ছিলাম না তাই ডিভোর্স করেছি। দেখবে আমার ছবি?'

banglabookspdf.com

নিজের একটা স্বচ্ছ রাত পোশাক পড়া ছবি শেয়ার করেছিল তনয়া। তনয়া এভাবেই কথা বলে। বেশির ভাগই শরীর আর যৌনতার কথা, তবে মেয়েটা বড্ড রহস্যময়ী। আর রহস্যটাই পাগল করে দিয়েছে দীপকে। তনয়া রোজ রাত নটা থেকে এগারোটা কথা বলে ওর সাথে। ব্যস শুধু ওই দু-ঘণ্টাই। বাকি সময় কোনোভাবেই দীপ ধরতে পারবে না ওকে। ওর ফোন কিছুতেই কানেক্ট হয় না। ফেসবুকেও ওকে অনলাইন দেখা যায় না।

—'তনয়া আর কোনো নাম্বার নেই তোমার? কেন তোমায় আমি ধরতে পারি না ফোনে? আমার যে খুব পেতে ইচ্ছে করছে তোমায়?' দীপ এরকম কিচ্ছু বললেই অদ্ভুত রহস্য করে হাসে তনয়া, যেন দীপ খুব বোকাবোকা একটা কথা বলে ফেলেছে। তনয়া বলেছে খুব শিগগির ও দেখা করবে দীপের সাথে। আর প্রথম দিন এই বাড়িতে এসেই দেখা করবে। ফাঁকা বাড়িই সবচেয়ে ভালো। সেইদিনই ও চিনতে চায় দীপের শরীর, দীপকে চেনাতে চায় নিজের সবটুকু।

দীপ তো সেই অপেক্ষাতেই দিন গুনছিল। বুঁদ হয়েছিল তনয়া নেশায়। তনয়া মাঝে মাঝেই নিজের শরীরী বিভঙ্গের ছবি শেয়ার করে। একবার পাঠিয়েছিল উন্মুক্ত স্তনের ছবিও। কোথায় এখন নিজের মনের মতো একজনকে পাবার উল্লাস মানাবে দীপ, তা না এসব কি জালে ও পড়ল কে জানে!

www.banglabookspdf.com

অন্ধকার রাতে একলা এই ঘরটায় জেগে বসে থাকতে থাকতে এখন বেশ গা ছমছম করছে দীপের। কেন যেন মনে হচ্ছে খুব খারাপ কিছু ঘটতে চলেছে ওর সাথে। তনয়ার সাথে দেখা বুঝি আর হল না।

এই বাড়িটা মোটেই খাস কলকাতার বুকে নয়। শহর ছাড়িয়ে বেশ দূরে। শহরতলির দিকে। আসলে দীপের স্কুলও এইদিকেই কিনা। বাড়িটা ওকে ঠিক করে দিয়েছেন ওরই কলিগ সুজিতদা। বাড়ির মালিক সুজিতদা'র খুব চেনা জানা। তাই বেশ অনেকটা সস্তাতেই হয়েছে ব্যাপারটা।

বাড়িটা বেশ পুরোনো। তা প্রায় বছর পঞ্চাশেকের পুরোনো তো বটেই। বেশ অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ি ছিল এটা। বাড়ির মালিকের নাম ছিল সঞ্জীব চৌধুরী। সঞ্জীব চৌধুরীর বংশে আর কেউ বেঁচে নেই এখন। একটা দুর্ঘটনায় মারা যায় ওর ছেলে আর বউমা একসাথেই। তারপর বিপত্নীক সঞ্জীব চৌধুরীও আর বেশিদিন বাঁচেনি। তাই সঞ্জীবের দুঃসম্পর্কের ভাগ্নেই এখন বাড়ির মালিক। সে খাস কলকাতার লোক। তাই এই বাড়িটায় সে থাকে না। লিজে দেয় বাড়ি বা ভাড়া দেয়।

—'বাড়িটা বেচে না দিয়েই ফেলে রেখেছেন কেন?' জিজ্ঞাসা করেছিল দীপ। কিন্তু কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি বাড়ির মালিক। বরঞ্চ মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছিল তার প্রশ্নটা শুনে। সেই ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে তখন কিছু মাথা না ঘামালেও আজ যেন হৃৎপিণ্ডের রক্ত চলকে চলকে উঠছে দীপের।

এই বাড়িটা দোতলা। তবে দোতলার ফ্লোরটা পুরো বন্ধ থাকে। দীপের আধিপত্য একতলাতেই। এই বাড়িতে আসার পর পরই একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিল দীপ। রোজ রাত বারোটার পর পাওয়ার কাট হয় এখানে। পুরো ঘুটঘুটে অন্ধকারে ডুবে একলা জেগে থাকে দীপ। প্রথমদিকে ব্যাপারটা তেমন আমল দেয়নি। জায়গাটা তো ঠিক খাস কলকাতা নয়, শহরতলি। তাই হয়তো হচ্ছে এমন। এখন সময়টাও ডিসেম্বর; তাই ফ্যানের দরকার নেই বলে তেমন একটা মাথা ঘামায়নি দীপ বিষয়টা নিয়ে।

কিন্তু দিন দুয়েকের পর ব্যাপারটা সত্যি ভাবিয়ে তুলল ওকে। কারেন্ট চলে গেলে তো আর ভূতুড়ে অন্ধকারে বেশিক্ষণ জেগে থাকা যায় না, তাই শুয়ে পড়ত দীপ।

কিন্তু সেই ঘুম প্রতিদিনই ভেঙে যেত ঠিক রাত দুটোয়। একদম কাঁটায় কাঁটায় রাত দুটো। আর ঘুম ভাঙত এক অদ্ভুত কষ্টের অনুভব নিয়ে। যেন বন্ধ হয়ে আসছে দীপের নিশ্বাস। ঠিক যেন কেউ দীপের বুকের ওপর চেপে বসে আছে। ঠিক যেন কেউ অদৃশ্য সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরেছে দীপের গলা।

দমবন্ধ করা এই বিদঘুটে অনুভব নিয়ে পরপর তিনদিন পার হল দীপের, তারপর সত্যি নিদারুন ভয় পেয়েছিল ও। কিন্তু তবু কাউকে বলতে পারেনি নিজের এই ভয়ের কথা। এসব কি কাউকে বলা যায় নাকি! সবাই তো পাগল ভাববে ওকে। তবে তিনদিন পর দীপ আবিষ্কার করল আর এক ভয়াবহ ব্যাপার। রাতের ওই নিয়মিত পাওয়ার কাট শুধু এই বাড়িতেই হচ্ছে, এলাকার আর কোথাও কিন্তু নয়।

www.banglabookspdf.com

এই ব্যাপারটা বোঝার পর থেকেই আতঙ্কের একটা কালো দলা যেন গিলতে আসে দীপকে প্রতিরাতে। প্রতিরাতেই সেই এক ঘটনা, ভয়ানক ভাবে রাত দুটোয় ঘুম ভেঙে যাওয়া অন্ধকার ঘুটঘুটে ঘরে। আর প্রতিমুহূর্তেই এক অদ্ভুত অনুভূতি। যেন কোনো অদৃশ্য চোখ ক্রমাগত জরিপ করে চলেছে দীপকে, যেন কালো এই শূন্য ঘরে দীপ একা নয় আরও কেউ রয়েছে ওর সাথে। তার অদৃশ্য চাপা নিশ্বাস আর অশরীরী পদধ্বনি প্রতি মুহূর্তে জানান দিচ্ছে তার অপার্থিব অস্তিত্ব।

না আর পারছে না দীপ। উৎকণ্ঠায়, আতঙ্কে, অনিদ্রায় আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ছে ওর শরীর। কিন্তু তবুও কাউকে ও জানাতে পারছে না ওর জমাট বাঁধা আতঙ্কের কথা। কে বিশ্বাস করবে আজকের দিনে ওর এই সব প্রলাপ! তাই দীপ ঠিক করেছে, ও ঠিক করেছে যে আজ সব রহস্য নিজেই ভেদ করার চেষ্টা করবে ও। না, ও ঘুমাবে না। ও জেগে থাকবে। ও দেখতে চায়, ঠিক কি হয় রাত দুটোর সময়। কে আসে এখানে প্রতিদিন রাত দুটোর পর।

ক্লান্ত চোখে জেগে আছে দীপ, পাশে কাঁপা কাঁপা শরীরে জ্বলছে মোমের শিখা। নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দও যেন শুনতে পাচ্ছে ও, এতটা নৈঃশব্দ চতুর্দিকে।

ঢংঞং করে দূরে কোনো বাড়ির গ্র্যান্ডফাদার ঘড়িতে দুটোর ঘণ্টা পড়ল বোধ হয়। আর অমনি ভবলীলা সাঙ্গ হল মোমের।

দীপ উঠে হাতড়াল দেরাজ, নতুন মোমের খোঁজে। কিন্তু কি অদ্ভুত! মোম নেই! কিন্তু এ কি করে সম্ভব! দীপ যে নিজের হাতে মোম রেখেছিল ওখানেই। হ্যাঁ একটুও ভুল হচ্ছে না ওর। ডিসেম্বর এর শীতেও এবার দীপের কপালে জমে উঠল বিন্দু বিন্দু ঘাম।

ঘরের জানলার পাল্লাটা এবার অল্প ফাঁক করল দীপ। যদিও বাইরে ঠাণ্ডা, তবুও... বাইরের আবছা চাঁদের আলো অল্প হলেও ভিতরের জমাট বাঁধা অন্ধকারকে ভেদ করছে।

ঠুক ঠুক ঠুক... দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল এবার। আর সাথে সাথেই দীপের হৃৎপিণ্ডটা যেন একলাফে গলার কাছে চলে এল। কারণ কড়া নাড়া হচ্ছে দীপের দরজাতেই। এত রাতে! কে আসবে দীপের এই অচেনা নতুন ঠিকানায়।

ঠুক ঠুক ঠুক... আবার সেই একই শব্দ।

'কেএএ?' দীপের গলা শুকিয়ে কাঠ আতঙ্কের আক্রমণে। স্বর কাঁপছে।

—'দীপ, আমি... দীপ...' পরিচিত মেয়েলি কণ্ঠস্বর।

আতঙ্ক ছেড়ে এবার দীপের অবাক হবার পালা। এ তো তনয়ার স্বর! ফোনে তো বহুবার শুনেছে এ গলা দীপ।

—'দীপ প্লিজ দরজাটা খোল। আমি তনয়া...' ওপারের কণ্ঠস্বর আকুল।

একরাশ কৌতূহল আর বিস্ময় নিয়ে এবার দরজাটা খুলল দীপ। আর অমনি হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকে পড়ল তনয়া। মুখে ওর একরাশ উদ্বেগ।

—'তুমি? এত রাতে? এখানে? তুমি কীভাবে জানলে এ ঠিকানা?' দীপের বিস্ময় কাটেনি এখনও।

তনয়া হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতেই বলল—

www.banglabookspdf.com

—'সব বলছি দীপ। এই ঠিকানা তো তুমি আমায় দিয়েছিলে দীপ। আর আজ এভাবে আসা ছাড়া আর আমার উপায় ছিল না। আমার বর, মানে সেই অত্যাচারী শয়তান আজ হঠাৎ চড়াও হয়েছে আমার বাড়িতে। আমায় খুব মারধোর করেছে। বলেছে সে আবার আমায় বাধ্য করবে তার সাথে থাকতে। জোর করে সে আমার শরীর... আমি তাই পালিয়ে এসেছি। গভীর রাতে যখন যে ঘুমে মগ্ন, তখন আমি পালিয়ে এসেছি।' এবার কাঁদছে তনয়া। কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠছে ওর ভরা যৌবন আবিষ্ট শরীর।

দীপ একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে তনয়ার দিকে। আতঙ্ক কেটে এবার একটা ভালো লাগার ঘোর ঘিরে ধরেছে ওকে। এই সেই তনয়া। যাকে পাবার স্বপ্ন রাত দিন তাড়া করছে ওকে। তনয়ার পরনে পাতলা রাত পোশাক, সেই রাত পোশাকের আড়াল থেকে যেন হাতছানি দিয়ে দীপকে ডাকছে মেয়েটার যৌবন।

না, আর নিজেকে সামলাতে পারল না দীপ। তনয়ার শরীরটা চুম্বকের মতো টানছে ওকে।

দীপ গিয়ে বসল তনয়ার পাশে। আস্তে আস্তে নিজের ঠোঁট ঘষতে শুরু করল তনয়ার ঘাড়ে আর পিঠে। তনয়ার কান্নাও এবার কমছে। আস্তে আস্তে জেগে উঠছে ওর শরীরও। দীপকে জড়িয়ে ধরেছে তনয়া। দীপও ব্যস্ত হাতে খুলছে তনয়ার পোশাক। সম্পূর্ণ অনাবৃত তনয়াকে চাই আজ ওর। যেন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠেছে কোনো ক্ষুধার্ত চিতা।

এক ঝটকায় এবার দীপকে বিছানায় শুয়ে দিয়েছে তনয়া। নিজের ঠোঁট ঘষছে দীপের গলায়, বুকে, পেটে।

—'আআআআ'... দীপের একটা বীভৎস আর্ত চিৎকার মুহূর্তে বিষিয়ে তুলল চারদিকের বাতাস।

কণ্ঠনালীর কাছে একটা তীব্র যন্ত্রণা ছিন্নভিন্ন করছে দীপকে।

—'কী করলে তুমি তনয়া...' দীপের হাত অজান্তেই চলে গেছে এবার ওর হাত নিজের গলার কাছে। রক্তে মাখামাখি হাত। যেন একরাশ আক্রোশে কেউ ছিঁড়ে নিয়েছে এক খাবলা মাংস ওর গলার কাছ থেকে।

—'হি হি হি হি...' একটা হাড় হিম করা নারী কণ্ঠের হাসি শোনা গেল এবার দীপের আর্তনাদ ছাপিয়ে।

শনশন করে একটা খ্যাপাটে বাতাস হঠাৎ বইতে শুরু করেছে বাইরে। সেই বাতাসের দাপটে হঠাৎ দুম করে খুলে গেল গোটা জানলার পাল্লাটাই। হুশ করে ঘরে ঢুকে এল এক পশলা আবছা সাদাটে চাঁদের আলো। আর তাতেই আরও স্পষ্ট দেখল দীপ যে তনয়া হাসছে পাগলের মতো। আর দৃশ্যটা দেখা মাত্র যন্ত্রণা ছাপিয়ে আতঙ্ক গ্রাস করল দীপকে। এ কী দেখছে ও?

তনয়ার সারা মুখ রক্তে মাখামাখি। চুলগুলো এলোমেলো পাগলের মতো। আর চোখ? না চোখ নেই। সেই জায়গায় জেগে আছে শুধু বীভৎস অন্ধকার দুটো কোটর।

—'কে... কে তুমি?' শেষ অবস্থায় পৌঁছে গেছে দীপ।

www.banglabookspdf.com

—'চিনতে পারছিস না আমায়?' হ্যাঁ তনয়া বা সেই তনয়া রূপী সেই বীভৎস মূর্তি আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে যেন। এখন ওই জায়গায় এক অন্য নারী মূর্তি।

আরে! এ তো... এ তো... এর ছবি তো দেখেছে দীপ। এই বাড়ির দেওয়ালেই দেখেছে। এরই তো নাম নাকি ইরাবতী চৌধুরী। এর বিরাট বড়ো তৈলচিত্র এ বাড়ির দেওয়ালেই আছে। এই তো এ বাড়ির আসল মালিক মানে চৌধুরী বাড়ির দাপুটে পুত্রবধূ, যে কিনা পঞ্চাশ বছর আগে নিজের স্বামীর গলার নলি কেটে তাকে খুন করে, নিজে আত্মহত্যা করেছিল। এভাবেই নাকি সে শাস্তি দিয়েছিল তার চরিত্রহীন স্বামীকে। বদলা নিয়েছিল নিজের অকারণ অপমান আর প্রত্যাখানের। কিন্তু সে? সে এখানে কীভাবে? কোন সময়ে ফিরে গেছে দীপ?

—'কী ভেবেছিস? লাম্পট্য করে পার পেয়ে যাবি? নিজের নির্দোষ বউকে ঠকিয়ে, নিজের শরীরের খিদে মেটাবি অন্য মেয়ের শরীর খুঁজে? না আমি থাকবে হবে না সেটা? আমি হতে দেব না। আগেও দিইনি। আজও দেব না।'

কিচ্ছু বুঝতে পারছে না দীপ। ইরাবতী চৌধুরীর অতৃপ্ত আত্মাই কি তার মানে তনয়া সেজে এতদিন... কিন্তু কেন? কী দোষ করেছে দীপ ওনার দরবারে? না আর কিচ্ছু ভাবতে পারছে না দীপ। ওর চোখের সামনে আস্তে আস্তে নেমে আসছে অন্ধকার। শেষ হয়ে আসছে ওর প্রাণশক্তি, শেষ হয়ে যাচ্ছে দীপ। সাজা পাচ্ছে নিজের সকল জঘন্য কাজের। আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসছে বিদেহী আত্মার ফিসফাস, চিৎকার আর পদধ্বনি।

* * *

banglabookspdf.com

অনেকগুলো চিৎকার, কথাবার্তা আর উদ্বিগ্ন গলার স্বর শুনতে পাচ্ছে দীপ। সঠিক বুঝতেও পারছে না ও মরে গেছে না বেঁচে আছে, কোথায় আছে এই মুহূর্তে সেটাও বুঝতে পারছে না একদমই। সারা গায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। চোখ মেলার ক্ষমতা প্রায় নেই বললেই চলে, তবুও ভীষণ কষ্ট করে এবার তাকাল দীপ।

চোখ খুলতেই একরাশ সূর্যের আলো ঝাপটা মারল ওর চোখে মুখে। কয়েকটা মুহূর্ত লাগল ওর সবটা মনে করতে।

—'স্যার, স্যার কি হয়েছে আপনার? আপনি এখানে কীভাবে...?'

—'দীপ, তুমি এখানে... এভাবে? কী হয়েছে দীপ?'

একরাশ চেনা অচেনা মুখের সারি ওকে ঘিরে। হ্যাঁ দীপ বুঝে গেছে এতক্ষণে, ও এই মুহূর্তে পড়ে রয়েছে ওরই স্কুল চত্বরের বাইরের বড়ো মাঠটায়, প্রায় অর্ধ নগ্ন অবস্থায়। ওরই সব ছাত্ররা, সহকর্মীরা ওকে এভাবে দেখে এখানে স্তম্ভিত। তাই এত প্রশ্ন একনাগাড়ে করেই চলেছে। কিন্তু কী বা কি উত্তর দেবে? ওর তো কিছুই জানা নেই। ঠিক কতক্ষন এভাবে এখানে ও পড়েছিল, আর এখানে এলই বা কীভাবে কিছুই তো বুঝতে পারছে না দীপ। তাই ওর যে কিচ্ছু বলার নেই।

—'দীপ, কী হয়েছে? তুমি এখানে এভাবে? এই ওকে তোল তো। দীপ আর এখানে এভাবে এক মূহূর্তও নয়। তুমি এক্ষনি আমার সাথে আমার বাড়ি চল। ওখানে গিয়েই বাকি সব কথা হবে। আগে

www.banglabookspdf.com

একটু গরম দুধ আর শুশ্রূষা দরকার তোমার।' সুজিতদা এগিয়ে এসেছেন এবার ভিড় ঠেলে সামনে। মাথার ওপর এই স্নেহের পরশটুকুই যেন এখন দরকার ছিল দীপের।

—'সুজিতদা... সুজিতদা...' ছোট্ট শিশুর মতো এবার কান্নায় ভেঙে পড়ল দীপ।

২

বাসটা হুহু করে ছুটে চলেছে। আর দীপও চলেছে ওর নিজের গন্তব্যের দিকে। না, এখনও কোনো কিছুই বুঝতে পারছে না দীপ। তবে উত্তর না মেলা ওই প্রশ্নগুলো নিয়ে আর ও ভাবতেও চায় না। আর কেনই বা চাইবে। এই দীপ যে অন্য মানুষ।

সেদিন সুজিতদা'র বাড়িতে গিয়ে খানিক সেবা শুশ্রূষার পর আগাগোড়া সবটুকু খুলে বলেছিল দীপ। কিচ্ছু লুকায়নি। এমনকী নিজের চরিত্রের অন্ধকার দিকটাও না। প্রথমবারের মতো সেদিন নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কারো সামনে মুখ খুলেছিল দীপ।

সব শুনে ভুরুতে একরাশ অবিশ্বাস আর চিন্তার ভাঁজ নিয়ে সুজিতদা বলেছিলেন—

—'সবই তো শুনলাম। কিন্তু এসব কথা আর কেউ তোমার মুখে শুনলে তোমায় নির্ঘাত চরিত্রহীন, বিকার মস্তিষ্কের এক যুবক ভাববে। আমি নেহাত তোমায় স্নেহ করি তাই, তেমনটা না হয় ভাবতে চাইছি না। কিন্তু তা বলে এই একবিংশ শতকের একজন শিক্ষিত মানুষ হয়ে তো বলিউড কায়দার এই ভূতের গপ্পো বিশ্বাস করতে পারি না। তাহলে যে আমারই মস্তিষ্কের সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। তুমি নিজেই ভাব না, এমন সুন্দর দিনের আলোয় কেউ যে হুট করে এসে তোমায় এমন এক আজগুবি কাহিনি শোনাত, তুমি কি মেনে নিতে পারতে?

মাথা নীচু করে নিয়েছিল দীপ। কারণ সত্যিই দীপ নিজেও এটা বিশ্বাস করত না যদি অন্য কেউ এমন বলত।

—'শোন দীপ, এই এলাকায় আমি অনেক বছর আছি। সেই বাপ ঠাকুরদার আমল থেকে। তোমার আগেও ও বাড়িতে লোকজন থেকে গেছেন। কিন্তু কেউ কোনদিন ভূতের কথা বলেননি। আর ধুর! ভূত বলে কি কিছু হয় নাকি?

শোন এটা ঠিক যে, ইরাবতীদেবীর করা সেই খুন, আর তার মৃত্যু দুটোই ভয়াবহ। কিন্তু তা বলে তুমি ওনাকে ভূতই বানিয়ে দিলে ভায়া? শোন আমি বাপ কাকার কাছে শুনেছি, ইরাবতীদেবী এমনিতে খুব ভালো মহিলা ছিলেন। উনি গরিবদের খুব ভালোবাসতেন। অনেক দান ধ্যান করতেন। খুনটা হয়তো উনি ঝোঁকের মাথাতেই করেছিলেন। ওনার স্বামী সত্যি খুব খারাপ লোক ছিল। খুবই লম্পট। এই বাড়িতেই স্ত্রীর পাশাপাশি বাজারের মেয়ে এনে তুলেছিলেন। ইরাবতীদেবীর মতো দাপুটে মহিলার পক্ষে কি সেটা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল বল। আর তা ছাড়া শুধু ইরাদেবী কেন, এমন অবিচার কেই বা মানবে। কিন্তু তা বলে উনি মরে ভূত হয়েছেন এমন কথা কেউ কোনোদিন বলেননি। যদি সত্যি এমন হত তাহলে কি এতদিনে আর কেউ সে ভূতের দেখা পেত না?'

—'আমার মনে হয় ইরাদেবী সবাইকে দেখা দেন না, যেহেতু আমি খারাপ চরিত্রের ছেলে, যেহেতু আমিও ওনার স্বামীর মতোই যে নিজের স্ত্রীর বিশ্বাস ভঙ্গ করেছি, তাই হয়তো আমাকেই

www.banglabookspdf.com

এভাবে শিক্ষা দিলেন উনি।' কথাটা বোকার মতো সেদিন বলেই ফেলেছিল দীপ।

—'কী সব যা তা বলছ বল তো? ইরাদেবী কিনা ভূত সেজে এসে তোমায় শিক্ষা দেবেন! দেখ, এসব কথা বোলো না। লোকে তোমায় বদ্ধ পাগল ভাববে। তবে আসল ব্যাপারটা কী ঘটেছে আমি সেটা বুঝে গেছি।' সুজিতদার শেষ কথাটায় চমকে গেছিল দীপ?

—'আসল ব্যাপার মানে। আসল ব্যাপার কী সুজিতদা?'

—'শোন দীপ, তোমার কম বয়স। তাই ঝোঁকের মাথায় একটা ভুল করে ফেলে সুলেখাকে কষ্ট দিয়েছ ঠিকই, কিন্তু এমনিতে যে তুমি খারাপ ছেলে না সে তো আমরা সকলেই জানি। আর সেই জন্যই স্ত্রীকে কষ্ট দিয়ে, তাকে ছেড়ে এসে আসলে তুমি একদম ভালো নেই। তোমার মনের মধ্যে সবসময় উথাল পাথাল চলছে এই ক-দিন, আর তার থেকেই তোমার মনের মধ্যে তৈরি হয়েছে অদ্ভুত অদ্ভুত কিছু ধারণা। আর একা থাকতে থাকতে, সব সময় নেগেটিভ ব্যাপার ভাবতে ভাবতে তুমি নিজেই নানা রকম জিনিস হ্যালুসিনেট করেছ। আমার মনে হয় তোমার মানসিক অবস্থা ঠিক নেই দীপ। তোমার অবশ্যই একজন সাইক্রিয়াটিস্টের সাথে কথা বলা উচিত। তুমি নিশ্চয় কোনো মারাত্মক স্বপ্ন দেখেছিলে কাল রাতে আর তারপর ভয় পেয়ে ঘুমের ঘোরেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছিলে। তারপর সেই ঘোরের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে কোনোভাবে পৌঁছেছিলে ওই স্কুল চত্বরে। তুমি ভাবতে পারছ ওই চত্বরে না পৌঁছে অন্য কোথাও গেলে তোমার কি ভীষণ বিপদ হতে পারত!'

—'এসব আপনি কি বলছেন দাদা? আমি সাইক্রিয়াটিস্ট দেখাব? আমি কি পাগল নাকি?'

—'আরে পাগল হলেই লোকে সাইক্রিয়াটিস্ট দেখায় এসব ধারণা আজকাল ক্লিশে হয়ে গেছে ভাই। মনের যে কোনো সমস্যাতেই আজকাল লোকে ওনাদের সাথে কথা বলে। ওনারা কাউন্সেলিং করে অনেক মনের সমস্যা দূর করে দেন। আমার এক পরিচিতেরও হয়েছিল ঠিক তোমার মতোই। সাংসারিক গণ্ডগোল থেকে মনের চাপ আর তার থেকেই অনিদ্রা, ভুল ভাল হ্যালুসিনেশন। তারপর এখন সাইক্রিয়াটিস্ট-এর পরামর্শে দিব্য ভালো আছে।'

—'না দাদা আমি কিছু হ্যালুসিনেট করছি না বা কোনো মিথ্যাও বলছি না। আর তার প্রমাণ আমি এক্ষুনি দেখাচ্ছি। আমার মোবাইলেই আছে তনয়া সরকারের পাঠান ছবি আর ওর প্রোফাইলও ফেসবুকে দেখাচ্ছি আপনাকে।' সুজিতদাকে কথাগুলো খুব কনফিডেন্স নিয়ে বললেও শেষ পর্যন্ত আর সেই প্রত্যয় ধরে রাখতে পারেনি দীপ সেদিন। উল্টে নিজেই আবার মুখোমুখি হয়েছিল আর এক নাম না জানা আতঙ্কের।

প্যান্টের পকেট হাতড়ে ধকল সওয়া ফোনটাকে পেয়ে গেলেও পায় নি সেদিন আর কিছুই। মোবাইলে তনয়ার পাঠান কোনো ছবি আর নেই। দীপ পাগলের মতো খুঁজেছিল। কিন্তু না আর ও পায়নি মেয়েটার সেন্ড করা একটা ছবিও।

এমনকী তনয়ার ফেসবুক উধাও, দেখাচ্ছে না ওর হোয়াটসঅ্যাপও। কী এক যাদুবলে যেন উধাও হয়ে গেছে সব। ওর পাঠান সব ছবি, টেক্সট। এমনকী ফোন বুক বা কল লগে দেখাচ্ছে না ওর ফোন নম্বরটাও। যেন তনয়া সরকার নামের মানুষটার অস্তিত্ব ছিলই না পৃথিবীতে কোনোদিন।

www.banglabookspdf.com

—'সুজিতদা... সুজিতদা, বিশ্বাস করুন... আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। তনয়ার সব চিহ্ন এভাবে উধাও হয়ে গেল আমি একেবারেই বুঝতে পারছি না...' সব কথা হারিয়ে ফেলে দীপ যে এবার খাবি খাচ্ছে সেদিন বুঝেছিলেন সুজিতদা। তাই বলেছিলেন—

—'ছাড় ভাই। এসব নিয়ে আর ভেবো না। তুমি বলবে ভূত আর আমি বলব সবটাই তোমার মনের ভুল আর কল্পনা। তাই এসব তর্কের কোন শেষ নেই। তার চেয়ে বরঞ্চ কাজের কথা শোন। কাল অনেক রাতে সুলেখার ফোন এসেছিল। তোমায় ফোনে না পেয়ে বড়ো উতলা হয়ে গেছে বেচারি। এই পনেরো দিন পাগলের মতো টেনশন করেছে। তারপর অতি কষ্টে আমার এই নম্বর জোগাড় করে ফোন করেছিল কাল। তুমি একবার ওর সাথে কথা বলবে তো?' কথাটা বলে উত্তরের অপেক্ষা আর না করেই সুজিতদা কী একটা ফোন নম্বর ডায়াল করতে লেগে পড়েছিলেন মন দিয়ে। দু-এক মুহূর্তের মধ্যেই দীপ শুনেছিল কথা বলছেন সুজিতদা।

—'হ্যাঁ সুলেখা মা, দীপ এখানেই আছে। এই নাও কথা বল।' হাতে সেদিন ফোনটা ঠুসে দিয়েছিলেন সুজিতদা।

—'হ্যালো' ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলেছিল দীপ।

—'তুমি কোথায়? কীভাবে আছো? প্লিজ ফিরে এসো। আমি যে অপেক্ষা করছি তোমার জন্য।' ব্যাকুল স্বর সুলেখার। কোনো রাগ নেই স্বরে। কোনো অভিযোগও নেই। আছে শুধু উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা দীপের জন্য। অবাক হয়ে গেছিল দীপ। এত কিছুর পরেও আজও সুলেখা ওর জন্য অপেক্ষা করছে।

তাই মৃদু স্বরে বলেছিল—

—'কেন অপেক্ষা করছ সুলেখা? আমি তো খারাপ তুমি জানোই। তাই আমি বাঁচি কী মরি তাতে কার কী যায় আসে?'

—'তুমি ভালো কি খারাপ অত আমি জানি না। আমি শুধু জানি আমি তোমায় ভালোবাসি। তাই তোমায় নিয়েই আমি মরব, বাঁচব। সুখে দুখে সংসার করব। তুমি আজই ফিরে এসো প্লিজ।'

সুলেখা ফোনের লাইন কেটে দিলেও কেমন ভেবলে বসে ছিল দীপ সেদিন। বুকের মধ্যে কেমন একটা মিষ্টি ভালো লাগার স্রোত টের পাচ্ছিল, যেটা আগে কোনোদিনও পায়নি।

—'ভাই, স্ত্রী রত্ন বড়ো রত্ন। তাই তাকে কষ্ট দিয়ো না। সেই যে তোমার সংসারের লক্ষ্মী। তাই সেই লক্ষ্মীকে কষ্ট দিলে নিজেকেও জ্বলতে হয় আর সংসারও জ্বলে যায়। সুলেখা যে তোমার অর্ধাঙ্গিনী।'

দীপের কাঁধে আলতো হাত রেখে কথাগুলো বলছিলেন সুজিতদা, আর ও যেন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছিল সব কটা শব্দ। আর এই উপলব্ধিটা খুঁজে দিতেই ফিরে এসেছিলেন ইরাদেবী, তার নিজের পরিণতি হয়তো আর কারও হতে দিতে উনি চান না। হয়তো ওই বাড়িতে থাকতে না গেলে এত ভালো করে এটা বুঝতেই পারত না দীপ। যে যাই বলুক, ও জানে ইরাদেবীই এসেছিলেন। কখনো তনয়ার রূপ ধরে, তো কখনোও বীভৎস আকার ধরে।

www.banglabookspdf.com

না আর ভয় করছে না দীপের আজ সেই রাতের কথা ভেবে। ও যে ভীষণ ভাবে কৃতজ্ঞ ওই বাড়িটার কাছে। যদি সঠিক সময়ে ওর চোখ না খুলত তাহলে হয়তো ওর জীবনটাও শেষ হয়ে যেত ধীরে ধীরে অনুরিমার মতো কালনাগিনীদের বিষে। সংসার, দাম্পত্য, ভালোবাসা এগুলোর সুখ হয়তো বুঝতেই পারত না ও কোনোদিন। হ্যাঁ সুজিতদা ঠিকই বলেছিলেন, সব পুরুষই একটা আশ্রয় খোঁজ। ভরসার জায়গা খোঁজে, ভালোবাসার ঠিকানা খোঁজে। আর সেই ঠিকানাটাই হল স্ত্রী, অর্ধাঙ্গিনী।

হ্যাঁ সেই ঠিকানাটা আর হারাতে দেবে না দীপ। আর ও যাযাবরের মতো ঘুরে মরবে না। ও যে আজ চিরদিনের জন্য ফিরে যাচ্ছে ওর নিজের ঠিকানার কাছে, নিজের চূড়ান্ত গন্তব্যের কাছে, নিজের সত্যিকারের ভালোবাসার কাছে।

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

মায়ার বাঁধন

১

বিছানার ওপর আধশোয়া হয়ে বাংলা উপন্যাসের পাতা উল্টাছিল অনু। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে ঝিরঝির। আর অনুর মনেও আজ যেন একরাশ মেঘের আনাগোনা। আজ ছুটি। তাই দুপুরে বাড়িতেই রয়েছে ও। মনটা মোটে ভালো নেই আজ অনুর। আসলে দিনদিন সুখেনের সাথে কেমন যেন দূরত্ব তৈরি হয়ে যাচ্ছে। আর এটাই প্রতি মুহূর্তে যন্ত্রণা দিচ্ছে ওকে। ভালোবেসেই তো বিয়েটা হয়েছিল ওদের, কিন্তু তবুও আজ কেন যেন শিথিল থেকে শিথিলতর হয়ে যাচ্ছে ওদের সম্পর্কটা।

অনু জানে, সুখেনও ভালো নেই আজ ওদের সম্পর্কের এই অবনতিতে। যাই হোক না কেন অনুর প্রতি ভালোবাসায় যে সুখেনের কোনো ভেজাল নেই সেটা খুব ভালো জানে অনু। আজ পরিস্থিতির কারণে হয়তো সুখেন নানাভাবে ভুল বুঝছে ওকে। অশান্তি পাচ্ছে ওরা দুজনেই। সুখেনও ভালো নেই অনুর মতো।

আসলে রমাদেবী মানে সুখেনের মা-ই দায়ী আজ ওদের এই সম্পর্কের অবনতির জন্য। মানুষটা ছেলেকে নিয়ে অমানুষিক পজেসিভ। আর এই ব্যাপারটাই আজ মারাত্মক হয়ে দাঁড়াচ্ছে ওদের জন্য। সুখেনও মা-কে ভীষণ রকম ভালোবাসে। কিন্তু বিয়ের পর মায়ের সাথে সাথে বউকেও যে ছেলে অনেকখানি ভালোবাসবে সেটা তো স্বাভাবিক। কিন্তু এই ব্যাপারটাই মেনে নিতে পারছেন না রমাদেবী। উনি বোধ হয় চান বউকে কেবল একটা বাড়তি আসবাব হিসেবেই দেখুক ছেলে।

ছেলে বউয়ের মধ্যে অশান্তি লাগাবার জন্য সব সময় ছুতো খুঁজতে থাকেন রমাদেবী। আর আজকাল যেন উনি বড়ো বেশি সাফল্য পাচ্ছেন এই ব্যাপারে। ওনার বুদ্ধিতেই বোধ হয় ছোটো খাটো নানা ব্যাপারেই সুখেন ভুল বুঝছে অনুকে। ঝগড়া ঝাটি হচ্ছে নিয়মিত। অশান্তির কালো বাদল পিছু ছাড়ছেই না ওদের। আর সুখেন এমনিতে শান্ত ছেলে হলেও রাগলে ও চণ্ডাল। আর এই এত রাগ তো ওর শরীরের জন্যেও ভালো না। রমাদেবী কি বুঝতে পারছেন না যে অশান্তির বীজ বপনের ফলে সুখেনও একটুও ভালো নেই? উনি কি চান যে ছেলেটা একটু শান্তি পাক? নাকি নিজের ভাবনাই ওনার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ যে ছেলের দিকটা বোঝার চেষ্টাই করেন না উনি?

—'বউমা...' রমাদেবীর আচমকা হুংকারে চমকে উঠল অনু। কখন যেন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন ভদ্রমহিলা।

—'হ্যাঁ বলুন...' যথাসম্ভব স্বর শান্ত রাখার চেষ্টা করল অনু।

—'তুমি আজ যখন ল্যান্ডফোনে কথা বলছিলে তখন আমি শুনেছি তোমার কথা। তুমি নাকি সামনের মাসের পনেরো তারিখ মুর্শিদাবাদ যাবে?'

www.banglabookspdf.com

—'হ্যাঁ যেতে হবে। সে তো আমি আপনাকে তিন মাস আগেই বলেছিলাম।'

—'তিন মাস আগে কি বলেছিলে না বলেছিলে আমার অত মনে নেই। কিন্তু এখন আমি তোমায় সাফ জানিয়ে দিচ্ছি ওই সময় যাওয়া তোমার হবে না। ওই সময়ে কাশী থেকে আমার গুরুদেব আসছেন, তাই আমি চাই তুমি ওই সময় বাড়িতেই থাক। তোমাকে গুরুদেবের সেবায় নিয়োজিত থাকতে হবে ওই সময়।' আদেশের চালে নিজের বিধান শুনিয়ে দিলেন রমাদেবী।

—'সেটা সম্ভব নয় মা। আমাকে যেতেই হবে। সব ফাইনাল হয়ে গেছে। এখন আমি দায়িত্ব এড়াতে পারব না। মাত্র ১৭ দিন বাকি আছে আর। এই শেষ মুহূর্তে আমি কিছু বদলাতে পারব না। আর তা ছাড়া আপনি তো আগেই জানতেন তাহলে আগে কেন বলেননি আমায়? তাহলে না হয় কিছু চেষ্টা করা যেতে পারত।'

—'কী বললে? আমায় তুমি শিখাবে যে কোনটা আগে বলতে হবে আর কোনটা পরে? আর গুরুদেবের থেকে তোমার কাছে কিনা ওই স্ফূর্তি আর বেলেল্লাপনা আজ বেশি বড়ো হয়ে গেল? লজ্জা করে না তোমার বেহায়ার মতো আমার সামনে দাঁড়িয়ে এগুলো বলতে?'

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

—'ভদ্র ভাবে কথা বলুন মা। আমি কোনো বেলেল্লাপনা করতে যাচ্ছি না সেটা আপনিও জানেন। আমি একজন শিক্ষিকা। তাই নিজের ছাত্রীদের প্রতি আর নিজের কাজের প্রতি আমার একটা দায়বদ্ধতা আছে, সেটা আমি উপেক্ষা করতে পারি না। আমি ইতিহাস পড়াই তাই ছাত্রীদের নিয়ে এই এসকারশানের দায়িত্বটা আমি এড়াতে পারব না। আগে থেকে হলে না হয় তাও চেষ্টা করা যেত, কিন্তু এই শেষ মুহূর্তে সেটা সম্ভব নয়।' দৃঢ় স্বরে বলল অনু।

—'একদম মুখে মুখে কথা বলবে না। কে বলেছে তোমায় ওই চাকরি করতে? আমার ছেলে তোমার খাওয়া পরার কোন অভাবটা রেখেছে যে কাজ করতে হবে তোমায়? তুমি কি ভাব আমি বুঝি না? ওই চাকরিটা হল আসলে তোমার ছুতো বাইরে বেরিয়ে পর পুরুষদের সাথে গা ঘেষাঘেষি করার। আর এসকারশানের নাম করে যে তুমি আসলে নষ্টামি করতে যাবে তাও জানি আমি।'

—'ছি ছি মা। আপনি না একজন ভদ্রমহিলা। আর এই আপনার মুখের ভাষা? শুনুন মা আমি খাওয়া পরার জন্য চাকরি করি না। কেন করি সেটা আপনি বুঝবেন না। কারণ সেটা বোঝার জন্য যে বিবেক বা শিক্ষাটুকু দরকার সেটা আপনার আছে বলে মনে হয় না। অবশ্য আপনার সাথে আমি আর কথা বাড়াতেই চাই না আপনার এই সব নোংরা কথা শোনার পর। আমার সত্যি রুচিতে বাধছে আপনার সাথে বাক্যালাপ করতে।'

রমাদেবীর মুখের সামনেই দুম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল অনু এবার।

—'কী বললে তুমি? আমি অশিক্ষিত? আমার সাথে কথা বলতে রুচিতে বাধে তোমার? এত স্পর্ধা তোমার? এত বাড় বেড়েছে তোমার? তোমার সব বাড় আমি ছেঁটে দেব। আজ ফিরুক সুখেন। ফিরুক একবার। আজ তোমার একদিন কী আমার একদিন।'

রমাদেবীর হুংকারে যেন ঝনঝন করে উঠল গোটা বাড়িটা।

banglabookspdf.com

২

ঘরে বসে বেশ চাপা স্বরেই কথা বলছিল মিলি ওর বেস্ট ফ্রেন্ড রিমার সাথে। আজ শরীরটা সকাল থেকেই ম্যাজম্যাজ করছিল মিলির। তাই ও অফিস ডুব মেরেছে। নইলে কি আর ঘরে বসে দুপুর বেলায় বন্ধুর সাথে ফোনে আড্ডা দেবার সৌভাগ্য হয় ওর।

—'এই মিলি এত আস্তে আস্তে কথা বলছিস কেন রে?' রিমা একটু বিরক্তি স্বরেই বলল।

—'আর বলিস না। আজ আমার শাশুড়িটাও বাড়ি আছ। কে জানে আরি পাততেও পারে।'

—'দুর। কী করে আরি পাতবে? তুই তো মোবাইলে কথা বলছিস। নিজের ঘরে বসে। তাও কী করে...?'

—'ধুর জানি না। আমার একদম ভালো লাগে না মহিলাকে। কেমন যেন গুমরে মট মটে করছে। উফফ! কলেজের প্রফেসর যেন আর কেউ হয় না। সব সময় কেমন যেন ভারিক্কী ভাব।' গলায় একরাশ উষ্মা নিয়ে কথাগুলো বলল মিলি।

—'তুই এক কাজ কর মিলি। তুই শাম্বকে নিয়ে আলাদা কোনো ফ্ল্যাটে শিফট হয়ে যা। উনি থাকুক নিজের গুমোর আর ভারিক্কি চাল নিয়ে।'

www.banglabookspdf.com

—'হ্যাঁরে আমিও তো তাই চাই। কিন্তু আমি চাইলেও তো আর হল না। আমার ওই মাতৃভক্ত রামপ্রসাদ বর সেটা মানলে তো। উফফ! এই শাম্বটা যে এমন মাম্মাজ বয় সেটা প্রেম করার সময় আমি একদম বুঝিনি রে। তাহলে কিছুতেই ওর গলায় মালা দিতাম না। ওর মায়ের নামে তো ও কিছু শুনতেই চায় না। ওর খালি একটাই কথা মা তো তোমায় কোনো ব্যাপারেই কিছু বলে না, কিছুতে বাধা দেয় না তাহলে তোমার সমস্যা কোথায়? আরে ওকে আমি বোঝাতেই পারি না যে কথায় কথায় বাধা দিলে বা কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে এলেই যে শুধু প্রবলেম হয় তা তো নয়, অ্যাটিটিউড প্রবলেমও একটা বড়ো সমস্যা। আর ওই মহিলার অ্যাটিটিউডটাই আমার জাস্ট পোষায় না। জানিস রিমা, আজকাল আমার আর শাম্বর রিলেশনটাও খুব স্ট্রেসড চলছে শুধু ওই মহিলার জন্য। সব সময় শাম্বর ওর মা-কে অন্ধের মতো সাপোর্ট করাটা আর ওই মহিলার অতিরিক্ত ছাড়া ছাড়া ব্যবহার আমার প্রতিই তার জন্য দায়ী। যাই হোক আমি জানি না এভাবে চললে কতদিন আমি থাকত পারব শাম্বর সাথে। থাকুক শাম্ব ওর মা-কে নিয়ে।'

—'না না এভাবে বলিস না। শাম্ব রিয়েলি লাভস ইউ। সেই কলেজ লাইফ থেকেই তো দেখছি আমরা। তুই ওকে বোঝা। আমি শিওর তোর সাথে ঝামেলা বা ঝগড়া করে শাম্বও ভালো থাকে না।'

—'আমি জানি আমাদের রিলেশন এর টেনশনের জন্য শাম্ব খুব আপসেট থাকে আজকাল। কিন্তু আমি...' শেষ হল না মিলির কথাটা। ঠিক তখনই টোকা পড়ল দরজায়। টুক টুক টুক।

—'মিলি, তুমি কি ঘুমাচ্ছ?' মিলি শুনতে পেল দরজার বাইরে লেখা চৌধুরীর মানে শাশুড়ির গলা।

—'এই শোন আমি তোকে একটু পরে কল করছি। আমার শাশুড়ি ডাকছে।' ফোন কেটে নিজের ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল মিলি।

—'হ্যাঁ বলুন...' কেজো স্বর মিলির।

—'শোন আজ টুপু বাড়ি ফিরে এলে সন্ধ্যায় ওকে নিয়ে একবার আমার ঘরে এসো। তোমাদের দুজনের সাথে আমার কিছু জরুরি কথা আছে।'

—'কী কথা?' ভুরুতে ভাঁজ মিলির।

—'সেটা তখনই বলব বললাম তো।' গম্ভীর চালে প্রস্থান করলেন লেখাদেবী নিজের বক্তব্যটুকু শুনিয়ে।

মিলিও আবার ফিরে এল নিজের বিছানায়। আঙ্গুল মটকাচ্ছে মট মট করে। কী কথা থাকতে পারে ওই মহিলার যেটা উনি মিলির সামনেই শাম্বকে বলতে চাইছেন?

তাহলে কি মিলির নামে কোনো অভিযোগ করে শাম্বর কানে বিষ ঢাল চায়? কিন্তু গত দেড় বছরে তো কখনো এমন করেননি। তাহলে কি এটা নতুন গুন?

'উফ!' বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মিলির। কে জানে কি ভাবছেন মহিলা। তবে শাম্বকে নিজেকে বদলাতে হবে এত মা মা মা মা করতে থাকলে মিলি আর থাকতে পারবে না ওর সাথে। হ্যাঁ অনেক হয়েছে, আর না। এবার শক্ত হবে মিলি। হবেই হবে।

৩

www.banglabookspdf.com

রাস্তা দিয়ে এলোপাথারি বাইক চালাচ্ছে সুখেন। না, কিছুতেই মাথাটাকে বাগ মানাতে পারছে না ও। ইশশ! এটা কি করল আজ ও? শেষ পর্যন্ত কিনা ও আজ অনুর গায়ে হাত তুলল! ছি ছি। কিন্তু... কিন্তু অনুও তো চরম অন্যায় করেছে আজ। ও কিনা মা-কে বলেছে যে মা অশিক্ষিত। মা-র সাথে কথা বলতে ওর রুচিতে লাগে! এত জঘন্য ভাবে মায়ের সাথে ব্যবহার করার পরও কিনা মুখের উপর বলল মায়ের কাছে ক্ষমাও কোনো মতেই চাইবে না।

এই সব কথাগুলো শুনেই তো আর রাগটাকে নিজের বশে রাখতে পারল না সুখেন। অনুর জেদ সব ব্যাপারে আজকাল যেন বেড়েই চলেছে। আর মায়ের সাথে একফোঁটা মানিয়ে চলার ক্ষমতা নেই ওর। নিত্যদিনের এই অশান্তি যে সুখেনও আর নিতে পারছে না সেটা কি আদৌ বোঝে অনু? সব সময় মা অভিযোগ করে অনুর ব্যাপারে। হ্যাঁ মায়েরও বাড়াবাড়ি আছে সেটা আজকাল বুঝতে পারছে সুখেন। অনু কি এতটাও খারাপ নাকি? কিন্তু সুখেনই বা কি করবে? মা-কে কিছু বলতে গেলেই মা বলবে আমি সব ছেড়ে চলে যাব কাশীতে গুরুদেবের কাছে। আর অনুকে কিছু বলতে গেলেই ও অশান্তি করে। কোনদিকে যাবে সুখেন? ও যে দুজনকেই বড্ড ভালোবাসে।

কিন্তু আজ ও যেটা করল সেটা কোনোভাবেই মেনে নেবে না অনু সেটা সুখেন বুঝতে পারছে। অনুর আত্মসম্মান প্রবল। তাই আজ বরের হাতে শাশুড়ির সামনে চড় খাবার পরেও যে আর সে ওই বাড়িতে থাকবে না তা ষোল আনা জানে সুখেন।

কিন্তু সুখেন তাহলে কী করবে এবার? ও তো পারবে না অনুকে ছেড়ে থাকতে। উফ! না না আর ভাবতে পারছে না সুখেন। ক্ষমা চাইতে হবে অনুর কাছে। আটকাতেই হবে ওকে। কিন্তু মা? মা তো তাহলে ভয়ানক অসন্তুষ্ট হবে। তারপর মা যদি চলে যায়?

না না। কিচ্ছু বুঝতে পারছে না সুখেন। গোঁ গোঁ করে আরও স্পিড বাড়াল বাইকের। ঝড়ের গতিতে বাইক চালাচ্ছে, যেন চারপাশের কিছুই আর দেখতে পাচ্ছে না ও।

না ও আর নিজের মধ্যে নেই। তাই আর দেখতেও পেল না যে উল্টো দিক থেকে তীব্র বেগে ছুটে আসছে একটা লরি ওরই দিকে। না, সুখেন পারল না। পারল না পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে। বাইক শুদ্ধ পড়ল লরির সামনে। ঝটিতে ধাবমান লরির ধাক্কায় ছিটকে পড়ল উল্টো দিকের রাস্তায়। ঠং করে সজোরে ঠুকে গেল মাথাটা শক্ত পিচের রাস্তায়। হ্যাঁ, রাগ করে বেরিয়ে এসেছিল তাড়াহুড়ো করে ছেলেটা। না, আজ হেলমেট নিয়েও বেরোয়নি ও।

'আআআ' একটা তীব্র চিৎকারে অনেকগুলো লোক ছুটে এল ওর দিকে। অসহ্য যন্ত্রণায় তখন কাতরাচ্ছে সুখেন। তবে বেশিক্ষণ পেতে হল না যন্ত্রণা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই উবে গেল ওর সব কষ্ট আর চোখের সামনে নেমে এল একরাশ কালো দুর্ভেদ্য অন্ধকার।

—'এই বেঁচে আছে? বেঁচে আছে?' ভিড়ের মধ্যে থেকেই বলল যেন কারা।

—'না না স্পট ডেড। হেলমেট ছাড়াই চালাচ্ছিল তো' আবার কেউ বলল ভিড়ের থেকেই।

অনেকগুলো লোক দৌড়াল ঘাতক লরিটার সন্ধানে, ওটাকে আটক করতে। কিন্তু সুখেন ততক্ষনে মুক্তি পেয়ে গেছে জীবনের সব অশান্তির আগুন থেকে। পৃথিবীর মায়া ততক্ষণে কাটিয়ে ফেলেছে

www.banglabookspdf.com

অনুর স্বামী আর রমাদেবীর একমাত্র ছেলে।

৪

—'মা তুমি আমাদের কিছু বলবে বলে ডেকেছ?' মিলি আর শাম্ব অনেকগুলো প্রশ্ন চোখে নিয়ে মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে।

—'হ্যাঁ রে। দেখ টুপু তোর বাবা মারা যাবার পর পরই আমি চলে আসি এই বাড়িতে। এই বাড়িটা আমার বাবার তৈরি করা বাড়ি। আমার শৈশব, কৈশোর আর যৌবন যেমন কেটেছে এই বাড়িতে, তেমনি তোর জন্ম থেকে তোর বড়ো হওয়া, তোর চাকরি বিয়ে সেগুলোও এই বাড়িতে। তাই এই বাড়িটা আমার কাছে বড্ড আপনার রে। আর সেইজন্যই বোধ হয় আমি আমার জীবদ্দশায় এই বাড়ি ছাড়ার কথা ভাবতেও পারব না। তা ছাড়া আমার কলেজ যাতায়াতেরও সুবিধা হয় এখান থেকে।' এতটা বলে একটু থামলেন লেখা দেবী।

মিলির ভুরুতে ভাঁজ লেগে রয়েছে একই ভাবে।

—'এসবই তো জানি মা। তাহলে আজ হঠাৎ এসব নতুন করে বলছ কেন?' বলল শাম্ব।

—'বলছি তার কারণ আছে। আসলে আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি টুপু। দেখ টুপু তোর অফিস বানতলায়। আর তোর অফিসের গাড়ি তোকে অফিস পৌঁছে দেয় আবার বাড়িতেও ছেড়ে দেয়। কিন্তু মিলির অফিস সল্টলেকে। ওর অফিস থেকে ও কোনো গাড়ি পায় না। বাসে ট্রামে করেই যাতায়াত করতে হয় ওকে। আর এই এরিয়া থেকে অনেক দূরও হয় ওর অফিসটা। ওর বড্ড কষ্ট হয় যাতায়াতে। একদিন অফিসের গাড়ি মিস করলে তোরও অনেক সমস্যা হয় যাতায়াতে।

আর এসব দেখেই আমি তোদের না জানিয়েই একটা কাজ করেছি। আমি তোদের জন্য একটা ফ্ল্যাট বুক করেছি ওই নিউটাউনের দিকটায়। ওখান থেকে অফিস যাতায়াত করতে সুবিধা হবে তোদের। ধরে নে তোদের আগামী বিবাহবার্ষিকীর উপহার এটা আমার তরফ থেকে।'

—'মানে? এসব তুমি কি বলছ মা? আমরা ওখানে থাকব আর তুমি এখানে একা থাকবে? মানেটা কি এসবের? আমরা কি তোমায় বলেছি যে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে? এটা হতেই পারে না মা।' হাউমাউ করে উঠল শাম্ব।

'প্লিজ শাম্ব, মা যখন ভেবেছেন তখন উনি ঠিকই ভেবেছেন নিশ্চয়। আর মা তো ঠিক কথাই বলছেন।' এতক্ষণে মুখ খুলেছে মিলি। ওর দু-চোখে ঝিকমিক করছে একটা অপার খুশি।

—'হ্যাঁ টুপু আমি সত্যি তোদের ভালোর জন্যই বলছি রে। আর বিশ্বাস কর আমার কোনো অসুবিধা হবে না। আমি তো মাঝে মাঝেই যাব ওখানে। আর তোরাও আসবি প্রায়ই। মিলি তুমি একটু বুঝাও তো ছেলেটাকে।'

—'কিন্তু মা... না এমন হয় না। প্লিজ মা একটু বোঝো...' পাগলের মতো ছটফট করেই যাচ্ছে ছেলেটা। মিলি ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে গেল ঘরে।

লেখাদেবীও ঘরের আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন এবার। বুক চিরে বেরিয়ে এল একটা বড়ো নিঃশ্বাস।

www.banglabookspdf.com

৫

স্টাফ রুমে বেশ আনমনা হয়েই বসেছিলেন আজ অধ্যাপিকা অনুলেখা চৌধুরী। গত সপ্তাহেই মিলি আর শাম্ব শিফট হয়ে গেছে নতুন ফ্ল্যাটে।

হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন পিঠে পরিচিত হাতের ছোঁয়ায়। কখন যেন এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে দীর্ঘ দিনের সহকর্মী বনাম বন্ধু মিত্রা।

—'কিরে এত উদাস কেন? মন ভালো নেই নিশ্চয়?' চেয়ার টেনে বসতে বসতেই বললেন মিত্রা।

—'না না মন ভালো থাকবে না কেন? ধুত কি যে বলিস!' নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন অনুলেখা চৌধুরী।

—'কেন এমন করলি অনু? যে ছেলেকে নিজের সবটুকু দিয়ে বড়ো করলি আজ তাকে নিজের হাতে এভাবে দূরে করে দিলি! সুখেনদা মারা যাবার সময়ও তো জানতিসই না নিজের শরীরে বাসা বেঁধেছে আর একটা প্রাণ। প্রথম টের পেলি সুখেনদার কাজ টাজ মেটার পর...'

—'হ্যাঁরে সত্যি প্রথমে কিছু বুঝিনি। সুখেনের মৃত্যুর পর ওদের বাড়ির সবাই যাতা ব্যবহার করছিল আমার সাথে। বলেছিল আমার জন্যই নাকি চলে গেছে সুখেন। একে স্বামীর শোক, তাইতে সবার এমন নারকীয় ব্যবহার। কীভাবে যে আমি কাটিয়েছি তখন। তাই যখন টের পেলাম সে আসছে, আর দু-বার ভাবিনি। ও বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিলাম বাবার বাড়ি।' শুকনো গলায় বলল অনু মানে অনুলেখা চৌধুরী।

—'হ্যাঁ জানি তো। আর এও জানি কীভাবে শাম্বকে বুকের এক এক ফোঁটা রক্ত দিয়ে মানুষ করেছিস তুই। ওই ছেলেই তো তোর জীবনের সব কিছু। তাহলে কেন করলি এমন অনু?'

—'মিত্রা তুই তো জানিস আমি সব সময় চেয়েছি আমার ছেলেটার যাতে কোনোরকম কষ্ট না হয়। যেন ও খুব ভালো থাকে। তাই জন্যই'...

—'মানে? এটা কি বলছিস তুই?

—'ঠিক বলছি। মিলি মানে শাম্বর বউয়ের কোনোদিনই আমায় বিশেষ পছন্দ হয়নি রে। সেটা না হতেই পারে। ও মডার্ন মেয়ে। হয়তো মেলে না আমার সাথে মত। তবে আমি বুঝতে পারছিলাম ইদানীং আমায় নিয়ে শাম্ব আর মিলির মধ্যে বেশ অশান্তি লাগছিল। আর সেই অশান্তির জেরেই বড্ড কষ্ট পাচ্ছিল ছেলেটা। আসলে ও যে আমাদের দুজনকেই বড়ো ভালোবাসে। তাই রোজকার মা বউয়ের এই দ্বন্দ্বে ভালো ছিল না ও। আর তাই জন্যই বোধ হয় ইদানীং আমি খুব বেশি করে দেখতে পাচ্ছিলাম তিরিশ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া আমার সুখেনকে টুপুর মধ্যে।

আমার শাশুড়ি নিজের ছেলেকে নিজের সম্পত্তি ভাবতেন। উনি বলতেন প্রায়ই ছেলের সাথে আমার নাড়ির বন্ধন। আর এই বন্ধনের জন্যই ছেলে শুধু আমার। আমারই মত মেনে চলবে ও।

আসলে উনি বুঝতে পারেননি একটা সময় এলে বন্ধনকেও শিথিল করতে হয়, নইলে বন্ধন বেড়ি হয়ে যায়। ছেলে-মেয়ে বড়ো হবার পর তার পৃথিবীটা তাকে তার মতো করে সাজাতে দিতে হয়। নিজের স্বার্থ আর ইগো নিয়ে লড়াই করে সেখানে জোর করে ঢুকতে নেই। নাড়ির বন্ধনকে জোর

www.banglabookspdf.com

করে আঁকড়ে তাকে ফাঁস বানাতে নেই। আর উনি সেদিন এটা বোঝেননি বলেই একসাথে তছনছ হয়ে গেছিল অনেকগুলো জীবন।

কিন্তু আমি সেটা চাইনি রে। আমি চাইনি আমার জন্য কোনোভাবে আমার ছেলে কষ্ট পাক। আমার জন্য ওদের জীবনে সমস্যা আমি চাইনি। আমার নাড়ির বন্ধন কে ওর শেকল কি করে বানিয়ে তুলি বল? আর সেইজন্যই ওকে জোর করে হলেও পাঠিয়ে দিলাম ওদের নিজেদের পৃথিবীতে। নিজেদের মতো করে এবার বাঁচুক ওরা। নিজেরা ভালো থাকুক।'

—'জানি না বাবা তুই কি সব বলিস...' বিরক্তি নিয়েই এবার উঠে পড়লেন অধ্যাপিকা মিত্রা জানা।

কয়েক মূহূর্ত স্থির হয়ে বসে থাকলেন অনুলেখা। তারপর উঠে ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন স্টাফরুম ছেড়ে ক্লাসের দিকে। আজ কলেজের শেষে একবার যেতে হবে শাম্বর ফ্ল্যাটে। বারবার ডাকছে ছেলেটা। আর অনুও যে ওকে না দেখে বেশিদিন থাকতেই পারে না। তাই তো ছেলেটা চলে যাবার পর থেকেই বুকের কোণে ক্রমাগত চিনচিন করেই যাচ্ছে। কিন্তু না সেটা বুঝতে দেওয়া যাবে না ছেলেটাকে। অনু জানে এখন মিলি আর টুপুর মধ্যে গণ্ডগোল সব মিটে গেছে। বেশ শান্তিতে আছে এখন ওরা। ব্যস! আর কী চাই। এইটুকুই তো চেয়েছিল অনু।

বুকের মাঝে কষ্টের হুলটা খুঁচাতে থাকলেও আজ বেশ নির্ভার লাগছে অনুর, শাম্ব আর মিলির সম্পর্কটা সামলে গেছে এটা সত্যি বড্ড বড়ো পাওয়া। মা-রা তো শুধু এটাই চায়, সন্তানের হাসিমুখটা দেখতে। সন্তানের সমস্যাবিহীন, মসৃণ জীবনের সামনে যে নিজের সব কষ্টই ফিকে হয়ে যায় মায়ের। আর সেইজন্যই তো বুকের কষ্ট বুকে চেপেও আজ হাসছে অনু। নিখুঁত ভাবে করে চলেছে ভালো থাকার অভিনয়টা।

—

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

রাজপুত্র আসার পরে...

১

—'ওই যে দ্যাখ গুরু আসছে... এসে গেছে তোমার ক্যাটরিনা কাইফ... হলুদ টপ আর জিন্স এ তো পুরো...'

মুকুলের কথায় চমকে চায়ের দোকানের বাইরেটায় তাকাল অঞ্জন। হ্যাঁ সে তো আসছে। রোজকার মতোই বেলা দশটার সূর্যের সোনালী আলোটাকে আরও একটু বেশি উজ্জ্বল করে দিয়ে সে এবার সোজা এগিয়ে যাবে বাসস্ট্যান্ডের পথে। তারপর বাসে উঠে হুশ করে চলে যাবে কলেজে আর অনেকগুলো ছেলের হাঁ করা মুখ চেয়ে থাকবে তখনও সেই আবছা হতে হতে প্রায় মিলিয়ে আসা বাসটার দিকে।

সে আজও হনহন করে পার হয়ে চলে গেল চায়ের দোকানটাকে পাশ কাটিয়ে প্রতিদিনের মতোই। আর অঞ্জনও নিয়মমাফিক একরাশ মুগ্ধতা নিয়ে চেয়ে রইল তার স্বপ্নসুন্দরীর দিকে। তারপর একসময় সেই মনহরনী মিলিয়ে গেল অঞ্জনের দৃষ্টিসীমার ওপারে।

—'এই আজ উঠিরে। আবার একটা ক্লায়েন্ট মিটিং আছে আজ। অলরেডি বেশ দেরি হয়েছে। এরপরও যদি না উঠি তাহলে তো আজকেই বিদায় করে দেবে কোম্পানি।' ভাঁড়ে চায়ের শেষটুকু এক চুমুকে শেষ করে উঠে পড়ল অঞ্জন।

—'বিদায় তো তোকে এমনিতেও করবে তোর কোম্পানি। সেলসের চাকরিতে টিকে থাকা এত সস্তা নাকি? ইশশ! টার্গেট যে মিট করতে পারিস না, সে তো নিজেই বললি। আর তা ছাড়া যাকে পটানোর জন্য এত ঝক্কি নিচ্ছিস সে তো এমনিতেই অন্য বন্দরে নৌকা ভিড়িয়ে দিয়ে বসে আছে।' বলেই খ্যাক খ্যাক করে বিচ্ছিরি ভাবে হাসল সোমেন।

—'তুই সব জেনে বসে আছিস নাকি রে? তোর বোনের সাথে দুটো কথা বলে বলেই সব জেনে গেলি তুই?' এবার খেঁকিয়ে উঠল অঞ্জন।

আবার খ্যাক খ্যাক করে হাসল সোমেন। কোনো উত্তর দিল না।

মনে একরাশ তিক্ততা নিয়ে অফিসের পথে পা বাড়াল অঞ্জন। উফফ! কেন যে মাঝে মাঝে এমন করে সোমেন কে জানে! সকাল বিকাল দু-বেলা যাদের সাথে পাড়ায় বসে আড্ডা হচ্ছে, সেই বন্ধুগুলোই সব জেনে শুনে যদি এমন করে তাহলে মনটা কি দুমড়ে মুচড়ে যায় না! সোমেন, মুকুল, বাবলা এদের কাছে কি কিছুই অজানা!

মেয়েটাকে যে ঠিক কবে থেকে ভালো লাগতে শুরু করেছিল সেটা মনে পড়ে না অঞ্জনের। তবে এটা মনে আছে যে ওকে ভালো লাগতে শুরু করার পর থেকে আর কোনোদিন অন্য কোনো মেয়ের

www.banglabookspdf.com

দিকে তাকাতেও ইচ্ছে করেনি। অমন কালো গভীর দুটো চোখ তো আর এই পৃথিবীর কোনো মেয়ের থাকতেই পারে না। আর ওই লাখ টাকার হাসিটা? নাঃ। ওটা আর কারো হবে না। শুধু ওই চোখের দিকে তাকিয়ে বা ওই হাসির কথা ভেবেই তো কাটিয়ে দিতে পারে অঞ্জন প্রতিটা দিন। কিন্তু ও? না ও বোধ হয় ঘেন্না করে অঞ্জনকে কিংবা করুণা করে বা হয়তো কোনোদিন ভুল করেও ভাবেই না অঞ্জনের কথা। অবশ্য ওর মতো অমন ঝকঝকে সুন্দরী, স্মার্ট আর পড়াশুনা করা একটা মেয়ের অঞ্জনকে নিয়েই ভাবনা তো থাকারই কথা নয়।

কী আছে অঞ্জনের? সাধারণ কলেজ থেকে বি. কম. পাশ করা, পাড়ার মোড়ে চায়ের দোকানে বন্ধুদের সাথে বসে আড্ডা মারা, খুবই সাধারণ ছাপোষা বাবা মায়ের অতি মামুলি চাকরি করা সাদা মাঠা একটা ছেলে।

আর সে? না সে খুব বড়োলোকের দুলালী নয় ঠিকই, তবুও যে সে নিজের রূপে গুনেই আজ অসাধারণ। একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েও যে কীভাবে পাড়ার বেশির ভাগ ছেলের স্বপ্নচারিণী হয়ে উঠতে পারে সেটা এই মেয়েকে না দেখলে কেউ বিশ্বাসই করতে পারবে না।

অঞ্জন জানে সোমেনেরও বেশ দুর্বলতা আছে ওর ওপরে। সোমেনের বোন মঞ্জুরী ওর বেস্ট ফ্রেন্ড। বছর দুয়েক আগেও দুই বান্ধবী এক সাথেই কলেজ যেত। এখনও দু-জনের ভালোই বন্ধুত্ব আছে। সে প্রায়ই যায় মঞ্জরীর বাড়ি। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সোমেন নিজের জমিতে ইট পেতে দেবে ভেবেছিল। সুবিধা হয়নি বিশেষ তাই এসব হাবিজাবি বলে এখন। অঞ্জন দেখতেই তো পায় কীভাবে হাঁ করা মুখ নিয়ে সোমেন তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। কিন্তু ও কোনোদিন দৃকপাতও করে না এই সব পাড়ার ছোকরাদের প্রতি। কিন্তু অঞ্জন আশা ছাড়েনি আজও। কেন যেন মনে হয় একদিন ওর রাজকন্যা ঠিক ওর কাছে আসবে। এই সাধারণ সেলসের নতুন জোটা চাকরিটা তাই তো এত মন দিয়ে করছে ও। কোনো রোজগার ছাড়া কি আর স্বপ্ন দেখা যায়! তা সে হোক না কম রোজগার!

অঞ্জনের মা জানেন সবটা। মা বলেন—

—'পাগল ছেলে। রাজকন্যাদের জন্য তো রাজপুত্রই আসে। আর তুই যে রাজপুত্র নোস রে সোনা। তাই আর ওকে ভেবে কষ্ট পাস নে। ওকে ভুলে যা। নইলে দেখবি যেদিন এক ঘোড়ায় চড়া রাজপুত্র এসে ওকে তোর চোখের সামনে থেকে নিয়ে চলে যাবে নিজের রানি করে, সেদিন তুই যে আর সহ্য করতে পারবি নে রে বাবা।'

উফফ! সেই দিনটার কথা ভাবলেই যে অঞ্জন শিউরে ওঠে। সত্যি এমন কোনোদিন হলে তো ও মরেই যাবে। ধুর! কেন যে ও একটা রাজপুত্তর হল না!

২

'ঠাম্মা তারপর কী হল রাজকুমারীর? সেই বদমাশ রাক্ষসটা কি তাকে ধরে নিয়ে যেতে পারল?'

—'হ্যাঁ পারল তো। আসলে রাক্ষসটা তো ছদ্মবেশে এসেছিল। তাই রাজকুমারী বুঝতেও পারল না। তখন হল কি, সেই ছদ্মবেশী রাক্ষসটা রাজকন্যাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিজের ডেরায় ধরে নিয়ে গেল। তারপর যেই না, খসে পড়ল তার ছদ্মবেশ ওমনি তো রাজকন্যা তাকে দেখে খুব ভয় পেয়ে

www.banglabookspdf.com

গেল। আর রাক্ষস বলল আজ তোকে আমি জল দিয়ে গিলে খাব। তখন রাজকন্যার সে কি কান্না! আর তো সে পালাবার কোনো পথও খুঁজে পায় না।'

—'তাহলে কি হল? রাজকন্যা কি মরে গেল? রাক্ষসের পেটে চলে গেল?'

—'না গো দিদিভাই, রাজকন্যাদের কি মারা এত সহজ নাকি? রাজপুত্তর আছে না? তারপর তো রাজপুত্তর টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এল। তারপর তার রাক্ষসের সাথে লড়াই হল খুব। অবশেষে সে রাক্ষসকে মেরে ফেলে রাজকন্যাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল।'

—'ইশশ কী মজা! রাজকন্যা বেঁচে গেল? আচ্ছা ঠাম্মা সব রাজকন্যাদের জন্যই কি রাজপুত্তর থাকে?'

—'থাকে তো দিদিভাই। এই তো যেমন তুমি একটা রাজকন্যা তাই তোমার জন্যও একদিন একটা ফুটফুটে রাজপুত্তর আসবে।'

—'সত্যি? সত্যি আমায় কোনো রাক্ষস ধরে নিয়ে গেলে রাজপুত্তর এসে লড়াই করবে? সত্যি?'

—'হ্যাঁ গো দিদিভাই। সত্যি সত্যি সত্যি।'

ভলভো বাসের ঠাণ্ডা আমেজে হেডফোন কানে গুঁজে সিটে গা এলিয়ে বাড়ি ফিরছিল শাওন। গান বাজছে 'শুন মেরি হামসফর...'। গানটা শুনতে শুনতেই ওর মনটা হঠাৎ পৌঁছে গেছিল ছোটোবেলায় ঠাম্মার কাছে শোনা গল্পটার মাঝে।

ঠাম্মা সেই রূপকথা শুনিয়ে প্রতিবারই বলত ওর জন্যও নাকি ভগবান ঠিক করে রেখেছেন এক রাজকুমার, যে একদিন এসে সব রাক্ষস খোক্কসদের হাত থেকে ছাড়িয়ে আনবে ওকে।

আর আজ সত্যি তাই হয়েছে। না বাস্তবে সৌভাগ্যক্রমে কোনো রাক্ষসের দেখা মেলেনি ঠিকই কিন্তু রাজপুত্র সত্যি এসে ধরা দিয়েছে শাওনের আঁচলে।

দিব্যই যে আসলে ওর স্বপ্ন আর কল্পনায় মিশে থাকা সেই রাজকুমার সেটা তো প্রথমে বোঝেইনি শাওন। খুব সাধারণ ভাবেই সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট থেকে পরিচয় হয়েছিল ওদের। প্রথমে পরিচয়, তারপর আস্তে আস্তে বন্ধুত্ব। তখনই শাওন জেনেছিল দিব্য খুব বড়ো ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে। তবে নিজে ডাক্তারি পাশ করেছে সবে নামজাদা মেডিক্যাল কলেজ থেকে। ইচ্ছা আছে অল্পদিনের মধ্যেই আরও হায়ার স্টাডি করতে বিদেশ যাবার। দিব্যর ছবি দেখেই শাওন বুঝেছিল দিব্য বেশ হ্যান্ডসাম। তবে সেটা যে এতটা বেশি মাত্রায় সেটা দিব্যকে সামনে দেখার পর প্রথম বুঝেছিল শাওন। প্রায় ছ-ফুট লম্বা, ছিপছিপে চেহারা আর ফর্সা গালে নীলচে আভার দাড়ি আর সাথে চোখে রিমলেশ চশমা। পুরো সেই কহো না প্যায়ার হ্যায় এর ঋত্বিক রোশন টাইপ। ওকে দেখেই ওর প্রেমে ঠাস করে আছাড় খেয়ে পড়েছিল শাওন। ওর গা থেকে ভুরভুর করে বেরচ্ছিল দামি পারফিউমের গন্ধ। একটা শপিং মলে দেখা করেছিল ওরা। প্রথমদিনেই জোর করে দিব্য খুব দামি একটা কুর্তি কিনে দিয়েছিল ওকে আর তারপর ওকে ডিনার করিয়েছিল খুব নামজাদা দামি রেস্টুরেন্টে। বারবার তখন মনে হচ্ছিল শাওনের, ইশশ! যদি এই মানুষটাকে একদম নিজের করে

www.banglabookspdf.com

পাওয়া যেত! কিন্তু না। নিজের মনের ভাব ঘুণাক্ষরেও ও বুঝতে দেয়নি দিব্যকে। শাওন সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। দিব্যর মতো ছেলের পাশে দাঁড়ানোর ওর কী বা যোগ্যতা আছে!

সেই প্রথম সাক্ষাতের পরেও আরও দু-বার দেখা করেছিল ওরা। আর তখনই শাওন নিজের মনের সবটুকু হারিয়ে ফেলেছিল। তবুও চুপ ছিল ও। কথা বার্তা চলত নিজের স্বাভাবিক ছন্দেই। দিব্য সব রকম কথা শেয়ার করত ওর সাথে। নিজের স্বপ্নের কথা, ক্যারিয়ার প্ল্যানের কথা। পছন্দ অপছন্দ সব কিছু। ও বলত বিলেত থেকে পড়ে এসে ও শহরে না থেকে গ্রামে থাকতে চায়। সেখানকার সাধারণ গরিব মানুষদের জন্য কিছু করতে চায়। যাতে কেউ আর বিনা চিকিৎসায় না মরে। শাওন অবাক হয়ে শুনত আর ভাবত সত্যি কত আলাদা এই ছেলেটা।

তারপর এল সেইদিনটা। ২৬ মে। দু-দিন ধরে পুরো বেপাত্তা ছিল দিব্য। কোনো ফোন নেই। চ্যাট নেই। রিসিভও করছে না ফোন। শাওন কষ্টে যখন প্রায় আধমরা তখনই সেই ২৬ মে রাত দুটোয় হঠাৎ হুড়মুড় করে হোয়াটসঅ্যাপ জ্বলে উঠল দিব্যর অনেকগুলো মেসেজ নিয়ে।

—'শাওন... আমি জানি না আমি কীভাবে বলব। জানি না আজকের পর আর আদৌ তুমি আমার বন্ধু থাকবে নাকি আমায় ভুল বুঝে চলে যাবে। আসলে আমি ভেবেইছিলাম যে আর কোনোদিন তোমার সামনে আসব না। কারন আর আমি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারছি না। শাওন, আমি বুঝতে পারছি আস্তে আস্তে আমি বড্ড দুর্বল হয়ে পড়েছি তোমার প্রতি। আজকাল সব সময় তোমার কথাই মনে হয় আমার। তোমার সাথেই সর্বক্ষণ কথা বলতে ইচ্ছে করে। আমার মনে হচ্ছে তুমি ছাড়া আমি আর চলতে পারব না। শাওন প্লিজ আমায় ভুল বুঝ না। আমি তোমায় ভালোবেসে ফেলেছি।'

নিজের চোখকে সেদিন বিশ্বাস করতে পারছিল না শাওন। এও কি সম্ভব! এভাবে হঠাৎ স্বপ্ন সত্যি হয়ে যায় নাকি!

সেই শুরু। এখন তো দিব্য ছাড়া শাওন নিজেকে জাস্ট ভাবতে পারে না। দিব্যর মতো ছেলের পাশে পাশে চলার আনন্দটাই আলাদা। দিব্য যেদিন ওকে প্রথমবার কিস করেছিল সেদিন শাওনের মনে হয়েছিল নির্ঘাত প্রজাপতির বৃষ্টি হচ্ছে ওর সারা শরীর জুড়ে। দিব্যর প্রতিটা স্পর্শ আর আদরই যেন বারবার সম্পূর্ণ করে তোলে ওকে। তবে ওর বড্ড ভয় হয় মাঝে মাঝে। সত্যি কি ওর কোনো যোগ্যতা আছে দিব্যর মতো ছেলের পাশে চলার? কোন খেয়ালে কে জানে এখন ফোনে ও নিজের রিং টোন সেট করেছে 'ম্যায় তেরি কাবিল হু ইয়া কাবিল নেহি।'

শাওন জানে এখন ওর বেশির ভাগ বান্ধবীই ওকে হিংসা করে। সে তো করবেই। অমন হিরের টুকরো বয়ফ্রেন্ড থাকলে সে ঈর্ষার পাত্রী হবে বই কী! বাবা মা-ও বারবার ওকে নিয়ে আসতে বলছেন। দিব্য তো বলেইছে আসবে ও পরের মাসে। তারপর তো আসলে ও বিদেশ চলে যাচ্ছে তিন বছরের জন্য। উফফ! তিন বছর দিব্য থাকবে না। ভাবতেই বুকটা মুচরে ওঠে শাওনের। অবশ্য দিব্য ফিরে এলেই বিয়েটা সেরে ফেলতে হবে বলেছে ছেলেটা। ততদিনে শাওনের এম. এ. টাও শেষ হয়ে যাবে। উফফ! বিয়ে, হানিমুন আর আদর এই নিয়ে কথা বলতে শুরু করলে আর তো কিছু

www.banglabookspdf.com

লাগে না ছেলেটার। দিব্য বলেছে মালদিভ এ যাবে ওরা। অখণ্ড নির্জনতা, সমুদ্র আর শুধু ওরা দুজন ভাবতেই গায়ে কাঁটা দেয় শাওনের।

তবে হ্যাঁ নিজেদের প্রেমের সাক্ষী সমুদ্রকে বানাতে তো পরের মাসেই একবার মন্দারমনি যাচ্ছে ওরা। কিছু একটা ঢপ মেরে বাবা মা-কে রাজি করাতে হবে। যদিও ভীষণ ভয় করছে ওর। তবে এটাও ঠিক যে দিব্য সাথে থাকতে কোনো ভয়ই ছুঁতে পারে না ওকে। ওখান থেকে ফিরে আসার পরই তো দিব্য আসবে ওদের বিয়ের ব্যাপারে কথা বলতে শাওনের বাবা মা-র সাথে। আর মাত্র তিন বছর। তারপর সত্যি রাজপুত্তরকে পেয়ে যাবে শাওন।

ঘ্যাঁচম্যাচ করে ব্রেক কষল বাসটা। আর শাওনেরও সম্বিৎ ফিরল যে বাড়ি এসে গেছে। বাস থেকে নামতে হবে এবার।

বাস থেকে নেমে রাস্তায় পা দিতেই কানে এল কয়েকটা পরিচিত কথা ওই চায়ের দোকানের দিকটা থেকে—

—'গুরু ওই যে আসছে... উফফ! সত্যি গুরু তোমার চয়েসের জবাব নেই...' ওদিকে না তাকিয়েও শাওন বুঝতে পারল ওই অঞ্জন বলে ভ্যাবলাকান্ত ছেলেটা হাঁ করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। উফফ! কী যে অসহ্য লাগে শাওনের। এই চায়ের দোকানে বসে থাকা ওই আলু ভাতে মার্কা ফিজিক নিয়ে কিনা শাওনের সাথে প্রেম করার স্বপ্ন দেখে ছেলেটা। কি অদম্য আশা! ভাবলে হাসিও পায় আবার রাগও হয় শাওনের। বছরের পর বছর এই একই ভাবে শাওনকে ক্যাবলার মতো ঝাড়ি মেরে যাচ্ছে ছেলেটা। এতেই ওর শান্তি। উফফ! কেন যে এরা বোঝে না যে শাওনের মতো সুন্দরীদের জন্য রাজপুত্ররা অপেক্ষা করে থাকে, তাদের জন্যই জন্ম হয় শাওনদের। এই সব উলু খাগড়ার কোনো জায়গা শাওনদের জীবনে থাকে না। থাকতে পারে না।

banglabookspdf.com

৩

অন্ধকার ঘরটায় টেবিলে মাথা রেখে ঝুম মেরে বসেছিল অঞ্জন। বাইরের আওয়াজ, শব্দ, আলো, গন্ধ সব জাস্ট অসহ্য লাগছে ওর। কী যে করবে এবার ও কিছুতেই বুঝতে পারছে না। মাথার ভেতরটা কেমন যেন ভোঁ ভোঁ করছে, বুদ্ধি আর কাজ করছে না। মঞ্জরী ঠিক কি বলতে চাইছিল? যা শুনল অঞ্জন সব ঠিকঠাক শুনল তো? নাঃ। কিচ্ছু বুঝতে পারছে না অঞ্জন। তাহলে কি সব শেষ হয়ে যাবে এবার এভাবে? অঞ্জন কি কিচ্ছু করতে পারবে না? কিন্তু কিছু তো একটা ওকে করতেই হবে? কিন্তু কি সেটা? এই পরিস্থিতিতে এখন কিই বা করতে পারে অঞ্জন।

খট করে একটা শব্দ টের পেল অঞ্জন নিস্তব্ধ ঘরটায় আর অমনি ঘর ভরে উঠল ফ্যাটফ্যাটে সাদা টিউব লাইটের আলোয়।

—'অঞ্জনদা...' মঞ্জরী এসেছে বুঝতে পারল অঞ্জন।

আস্তে আস্তে মাথা তুলল ও। ভেজা চোখ দুটো রক্তের মতো লাল প্রায়।

মঞ্জরী খেয়াল করল না বোধ হয়।

www.banglabookspdf.com

—'অঞ্জনদা তোমাকে আমার অনেক কিছু বলার আছে। বিশ্বাস কর হাতে আর সময় সত্যি বেশি নেই। তুমি প্লিজ আমায় ফিরিয়ে দিও না অঞ্জনদা। তুমি ছাড়া এখন আমার এই কথা আর কে শুনবে বল?'

অঞ্জন দেখল মঞ্জরীর গলা কাঁপছে। এবার আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগোল ও। নিঃশব্দে আলতো করে ভেজিয়ে দিল ঘরের দরজাটা।

৪

হাতে ফুটে থাকা মেহেন্দির নক্সাগুলোর দিকে ঝাপসা দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল শাওন। এই মুহূর্তে এই ঘরে ও সম্পূর্ণ একা।

বর এসে গেছে বর এসে গেছে রব শুনেই যথারীতি সবাই দৌড়ছে বর দেখতে। সেই গতানুগতিক প্রথা মেনে বর দেখার উন্মাদনায় কনেকে একা বসিয়ে চলে যাওয়া।

—'ম্যায় তেরি কাবিল হু ইয়া... কাবিল নেহি...'

—'হ্যালো' মোবাইল কানে চাপল শাওন।

—'শাওন প্লিজ আমার ওপর রাগ করিস না রে। আজ আমার দিল্লিতে এই পরীক্ষাটা পড়ে না গেলে আমি সত্যি থাকতাম তোর বিয়েতে। প্লিজ আমায় ভুল বুঝিস না। কিরে শুনতে পাচ্ছিস? দেখিস সব ঠিক হয়ে যাবে।'

শাওন অনেক কিছু বলতে চাইল ওর বেস্ট ফ্রেন্ডকে। কিন্তু বলতে পারল না। কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। বুকের মাঝে একরাশ কষ্ট আর গলার কাছে আটকে থাকা এক দলা কান্না কিচ্ছু বলতে দিচ্ছে না শাওনকে। বুকের ভেতর কেমন ঢিপ ঢিপ করে উঠল শাওনের। সেই এক সুর যেন খেলছে মঞ্জরীর গলায় ঠিক দেখিস সব ঠিক হয়ে যাবে।' ঠিক এই কথাটার পরেই তো শাওন সেদিন সপাটে চড় বসিয়ে ছিল নিজের সবচেয়ে প্রিয় বান্ধবীর গালে।

banglabookspdf.com

আবার... আবার... না চাইতেও হুশ করে শাওনের মনটা পিছিয়ে গেল সেই কালো সময় আর মুহূর্তগুলোর মাঝে।

স্বপ্নের মানুষটার সাথে সমুদ্রের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়াটা যে কি স্বপ্নিল ব্যাপার সেটা শাওন বুঝতে পেরেছিল দিব্যর সাথে একান্তে মন্দারমনি পৌঁছে যাবার পর। সবটাই কেমন যেন স্বপ্নের মতো লাগছিল। সমুদ্র, আকাশ, বালি, ঝিনুক আর পাশে দিব্য, আর ক্ষণে ক্ষণেই দিব্যর পাগল করা আদর। পুরোপুরি ভেসে গেছিল শাওন। নিজেকে সামলাতে পারেনি আর। নিজের সবটুকু দিয়ে দিয়েছিল দিব্যকে। সেদিন ওর মনে হয়নি ব্যাপারটা একটুও খারাপ। যেটা দিব্যরই সেটা ওকে দিতে বাধাটাই বা কোথায়? এতে ভুল তো নেই।

কিন্তু ঠিক ভুলের হিসাবটা যে এতটা সহজে মিলান যায় না সেটা শাওন প্রথম বুঝতে শুরু করেছিল মন্দারমনি থেকে ফেরার পর। হঠাৎই কেমন যেন একটু একটু করে বদলে যেতে শুরু করল দিব্য। দেখা করতে চায় না, বেশি কথা বলতে চায় না, চ্যাট করতে চায় না এমনকী শাওন ফোন করলেও কাজের অজুহাতে দু-একটা কথা বলেই এড়িয়ে যেতে চায় ওকে।

www.banglabookspdf.com

কষ্টে পাগল হয়ে যেদিন শাওন একরাশ কান্না বুকে নিয়ে ওকে বলেছিল—

—'দিব্য, কেন এমন করছ তুমি? আমি কি কিছু ভুল করেছি? যদি আমি কিছু অন্যায় করে থাকি না বুঝে তাহলে প্লিজ আমাকে বক, মার বা যা ইচ্ছে শাস্তি দাও। কিন্তু প্লিজ এভাবে আমায় দূরে ঠেলে দিও না।' কথাগুলো বলার সময় সেদিন ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেছিল শাওন। তবুও দিব্য সেই একইভাবে ভাবলেশহীন গলায় বলেছিল—

—'প্লিজ শাওন বারবার ফোন করে বিরক্ত কোরো না তো আমায়। তুমি তো জানই জাস্ট একমাসের মধ্যেই মানে ২৭ নভেম্বর লন্ডন যাচ্ছি আমি, তাই এই সময়ে যে আমি চরম ব্যস্ত থাকব আর তোমার এসব ইমোশনাল ড্রামার জন্য যে আমার হাতে সময় থাকবে না সেটা কি বোঝার মতো বুদ্ধিটুকুও নেই নাকি তোমার?'

—'আমি জানি তুমি বিদেশ যাচ্ছ। কিন্তু আমার বাড়িতে যে তার আগে তোমার আসার কথা আমাদের বিয়ের ব্যাপারে কথা শুরু করার জন্য। বাবা মা যে বারবার জিজ্ঞাসা করছেন। কবে আসবে তুমি?'

—'ওনাদের বল বড়োলোক বাড়িতে মেয়েকে ভিড়িয়ে দেবার প্ল্যান করে সেটা নিয়ে এত বেশি উত্তেজিত না হতে। ধৈর্য ধরুক। সময় হলে ঠিকই পাবে আমার দেখা।' দিব্যর ইস্পাত কঠিন নিষ্ঠুর কথাগুলো শুনে সেদিন কেঁপে গেছিল শাওন। এসব কি বলছে ও? একি আদৌ ওর সেই চেনা দিব্য? কেমন যেন সিটিয়ে গেছিল সেদিনের পর থেকে শাওন। আর কোনো যোগাযোগ করতে পারেনি নিজের থেকে দিব্যর সাথে এর পর। শুধু রাতের পর রাত ওই আকাশের বুকে জেগে থাকা তারাগুলোকে সাক্ষী রেখে নিজের চোখের জলে বালিশ ভিজিয়ে গেছে। আর অপেক্ষা করে গেছে পাগলের মতো শুধু দিব্যর একটা ফোনের। কিন্তু না। আর কোনো ফোন আসেনি। সেই ২৭ নভেম্বর তারিখটা পেরিয়ে যাবার পর শাওন শুধু বুঝতে পেরেছিল যে ও নিঃস্ব হয়ে গেছে। দিব্য এখন ওর জন্য অনেক দূরের একটা নাম। সে তো আসলে ওর কোনোদিনই ছিল না। দিব্যর ফেসবুক, স্কাইপ সব প্রোফাইল হাওয়া, ফোন নম্বর ইনঅ্যাকটিভ। মনে হয় যেন দিব্য বলে কেউ কোনোদিন ছিলই না শাওনের জীবনে। সবটাই যেন ছিল ক্ষণিকের কল্পনা।

না, কল্পনা নয়। দিব্য ভীষণভাবে একটা কালো বাস্তব ছিল শাওনের জীবনে। তাই তো ঠিক ২৭ ডিসেম্বর হঠাৎ মাথা ঘুরে বাথরুমে পড়ে গেল শাওন। বমিও হল অনেকটা। ডাক্তার এসে বললেন যে শাওনের কালো বাস্তব তার চরম অভিশাপের সাক্ষ্য চিহ্ন পুঁতে দিয়েছে শাওনের শরীরে।

—'বল বল কবে করলি এসব সর্বনাশ তুই? পারলি এত নীচে নামতে? তুই কি মানুষ? বল কে? কে করেছে এই সর্বনাশ? কে দিব্য? কোথায় সে? কবে আসবে? বল কীভাবে মুখ দেখাব এবার আমরা সমাজে? এই অবৈধ বাচচার কী পরিচয় হবে? উফফ! ভগবান! এবার যে গলায় দড়ি দিতে হবে আমায়?' মায়ের একলক্ষ প্রশ্ন আর বাবার নিথর অবস্থা সেদিন আরও বেশি বিবশ করে দিয়েছিল শাওনকে। কিন্তু তবুও মায়ের প্রশ্নের কোনো উত্তরই দিতে পারেনি ও। কি বা বলার ছিল ওর? দিব্য এই সন্তানের বাবা সেটা বলতে পারেনি সেদিন শাওন কিছুতেই। যে মানুষটা একটা ছেঁড়া জুতোর

www.banglabookspdf.com

মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে শাওনকে তার কথা বলবে শাওন! আর বলবেই বা কি? সে কোথায় তাও কি জানে নাকি ও।

মায়ের আর্তনাদ আর বাবার থমথমে মুখ এর মধ্যে থেকেই একটুকরো আড়াল খুঁজে সেদিনই বিকেলে ও চলে গেছিল নিজের বেস্ট ফ্রেন্ড মঞ্জরীর বাড়ি। নিজের সন্তানকে আশ্রয় দেবার আর তাকে বাঁচিয়ে রাখার শেষ চেষ্টা যে করতেই হবে ওকে। ও যে মা। মা তো সন্তানকে উপেক্ষা করতে পারে না। নিজের লজ্জা ঘেন্না ভুলে সবটুকু জানিয়েছিল মঞ্জরীকে।

—'মঞ্জু তুই প্লিজ বাঁচা আমায়। আমি জানি তুই পারবি। কাকু মানে তোর বাবার পলিটিক্সে তো অনেক বড়ো হাত আছে। তাই কাকু চাইলেই পারবেন আমায় একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে। যে কোনো কাজ করব আমি। আমি সব পারব। প্লিজ তুই আমায় ফিরিয়ে দিস না। আমি আর তাহলে কোথায় যাব বল। আমি যে বাবা মা-কে এই অসম্মানের অন্ধকারে ঠেলে দিতে পারব না। তাই একটা ব্যবস্থা যে আমার বড্ড দরকার।'

—'এসব কি বলছিস তুই শাওন? তোর শরীরের এই অবস্থায় তুই চাকরি করবি? তুই কি পাগল হয়ে গেছিস? আর তা ছাড়া অভিজ্ঞতাবিহীন শুধু গ্র্যাজুয়েট একটা মেয়ের চাকরি পাওয়া অত সোজা নাকি আজকের বাজারে? আর পেলেও বা কটা টাকা মাইনে পাবি সেখানে? তাতে কি হবে তোর? শোন শাওন তার চেয়ে এই ভালো যে বাড়িতে সব কথা খুলে বল। বাচচাটাকে এবোরট কর।'

—'না মঞ্জু। প্লিজ ওকথা বলিস না। এটা আমি পারব না। আমি বাড়িতেও আমার এই লজ্জার কথা বলতে পারব না রে।' দু-হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল শাওন সেদিন।

কয়েক মিনিট চুপ থেকে মঞ্জরী বলেছিল—

—'তাহলে আর একটাই উপায় আছে শাওন। অঞ্জনদা। তুই অঞ্জনদা-র কাছে যা। সব কথা ওকে খুলে বল। ও তোর পাশে দাঁড়াবেই রে শাওন। ও যে তোকে পাগলের মতো ভালোবাসে। ও তোকে ফেরাবে না। তোর কোনো ক্ষতি হতে দেবে না ও। তুই যদি না বলতে পারিস তাহলে আমি যাব ওর বাড়ি। আমি গিয়ে সবটা বলব ওকে।'

এই কথাটায় মাথাটা দাউদাউ করে জ্বলে গেছিল শাওনের। বিপদে পড়েছে বলে মঞ্জরী কি ভাবছে ওকে? নরকের কীট? ঠাস করে মঞ্জরীর গালে একটা চড় মেরে সেদিন শাওন বলেছিল—

—'আজ তুই চিনিয়ে দিলি যে তুই কেমন বন্ধু? বিপদে পড়ে তোর কাছে সাহায্য চেয়েছি বলে তামাশা করছিস আমায় নিয়ে? ছিঃ এই তুই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড।'

ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে হনহন করে পা চালিয়ে বাড়ি আসতে আসতেই ঠিক করে নিয়েছিল শাওন কী করবে ও এবার। হ্যাঁ অনেক হয়েছে। আর নয়। এই নোংরা পৃথিবীতে আর বাঁচতে চায় না ও। সত্যি মৃত্যুর পরের পৃথিবীটার খোঁজেই বেরোবে এবার ও।

—'কিরে দিদিভাই কনে সেজে একা একা বসে কী ভাবছিস? আর বাকি সব কোথায়? বর দেখতে ছুটেছে বুঝি?'

www.banglabookspdf.com

ঠাকুমার গলার স্বরে এক নিমেষে যেন সেই অতীতের অন্ধকার সময় ছিঁড়ে আবার আজকের বাস্তবে এসে পড়ল শাওন। ঠাকুমা! একমাত্র এই মানুষটাকেই সবটুকু সত্যি বলতে পেরেছিল শাওন। শুধু ঠাকুমাই ওকে বলত সেই সময়েও—

—'দেখিস দিদি, খারাপ সময় ঠিক কেটে যাবে। তুই ভুল করেছিস ঠিকই, কিন্তু পাপ করিসনি। কাউকে ভালোবাসা আর বিশ্বাস করা যদি পাপ হত তাহলে যে চন্দ্র সূর্য মিথ্যা হয়ে যেত। তবে হ্যাঁ ভুল মানুষকে বিশ্বাস করা ভুল। তাই আজ তোর এত কষ্ট।'

—'ওরে কনে বউ রে, তোর রাজপুত্তুর এর যে আজ আর তর সইছে নে রে তার বউটাকে দেখার জন্য এই লাল টুকটুকে শাড়িতে।' বলেই আবার ফোকলা দাঁতে খিক খিক হাসল বুড়ি।

—'রাজপুত্তুর মানে? কে রাজপুত্তুর?' ঘড়ঘড়ে গলায় বলল শাওন।

—'ওরে পাগলি রে তোর রাজপুত্তুর। যার কথা তোকে বলেছি সেই ছোট্ট থেকে। আজ যে তার তোর আঁচলে বাঁধা পড়ার দিন।

—'আমার রাজপুত্তুর!' চোখের সামনে এবার শাওনের ভেসে উঠছে একটা ফোলা ফোলা ফর্সা মুখ, চোখে তার গোল গোল চশমা আর মুখে লেগে রয়েছে একটা সরল হাসি যে সবসময়, না জানি সেই কোন কাল থেকে শুধু শাওনকে একটু চোখের দেখা দেখতেই ব্যাকুল।

সেই দিনটায়... সেই দিনটায় যেদিন মঞ্জরীর সাথে রাগারাগি করে, ওকে থাপ্পড় মেরে বুকে একরাশ যন্ত্রণা নিয়ে আবার ঘরে ফিরে এসেছিল শাওন; সেদিন ফিরে ঘরের দরজা বন্ধ করে নিজেকে শেষ করে ফেলার ভাবনা চিন্তাই করছিল ও। নানা ভাবনা চিন্তা তোলপাড় করে দিচ্ছিল ওর বুকের ভিতর। কিন্তু হঠাৎ ভাবনার ঝড়টা থমকে গেছিল বাইরের ঘর থেকে ভেসে আসা অনেক চেঁচামেচির শব্দে।

খুট করে সন্তর্পণে দরজা খুলে বাইরে বেরোতেই শুনতে পেয়েছিল বাবার গলা—

—'জানোয়ার ছেলে। পাড়ার ছেলে হয়ে তুমি সর্বনাশ করলে আমাদের। তোমায় পুলিশে দেব আমি। দেখি কোন বাপ বাঁচায় তোমায়।'

—'কাকু আমি জানি আমরা খুব বড়ো অন্যায় করে ফেলেছি। আপনি যা খুশি শাস্তি দিতে পারেন আমায়। কিন্তু প্লিজ বোঝার চেষ্টা করুন একবার। আমায় পুলিশে দিলে আমি তো শাস্তি পাবই, কিন্তু আরও বেশি বড়ো শাস্তি পাবে শাওন। অনেক বদনাম হবে ওর। হয়তো দুঃখে অভিমানে মেয়েটি নিজের বড়ো কোনো ক্ষতি করে ফেলবে।'

—'শয়তান নোংরা ছেলে। আমি ছাড়ব না তোমায়।' মা'ও ঠাস ঠাস করে চড় মারছিল ওকে। আর নীরবে দাঁড়িয়ে সব অপমান সহ্য করছিল সেই ছেলেটা, বিনা দোষে।

শাওন স্থবির হয়ে গেছিল পুরো দৃশ্যটায়। ওরা গলা আটকে গেছিল, মুখ থেকে কথা সরছিল না। ও চিৎকার করে বলতে চাইছিল—

—'এসব মিথ্যা, সব ভুল।' কিন্তু কেন কে জানে সব শব্দ সেদিন বেইমানি করেছিল ওর সাথে।

www.banglabookspdf.com

পরেরদিন সন্ধ্যায় ও সোজা হানা দিয়েছিল ছেলেটার বাড়ি। ওর ঘরে ঢুকে ওর ওপর আছড়ে পড়েছিল ঝড়ের মতো।

—'আমি জানি মঞ্জরী তোমায় বলেছে আমার ব্যাপারে। কিন্তু তুমি এসব করে কি প্রমাণ করতে চাইছ অঞ্জন? এত সাহস হল কী করে তোমার? আমার জীবনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার তুমি কে? কোনো জায়গা নেই তোমার আমার জীবনে। কোনোদিনও থাকবে না। বুঝতে পেরেছ?'

—'আমি তো কোনোদিন তোমার জীবনে জায়গা চাইনি। ভাবিওনি আর ভাববও না। কিন্তু তা বলে তোমায় চোখের সামনে একটু একটু করে জ্বলে পুড়ে মরতেও দেখতে পারব না। কারণ... কারণ...। সে যাই হোক, আমি জানি আমি তোমার যোগ্য নই আর হতেও পারব না। যা করেছি তা শুধুই এই কঠিন পরিস্থিতিটাকে সামাল দেবার জন্য। আজ তোমার একজন স্বামীর পরিচয় দরকার, না তোমার জন্য নয়। যে আসছে তার বেঁচে থাকার জন্য এই সমাজে। সে চলে আসার পর, পরিস্থিতি সামলে ওঠার পর তুমি যা চাইবে তাই হবে। তুমি চাইলে ডিভোর্স দিয়ে দেব আমি। তারপর তুমি নতুন ভাবে বাঁচতেই পার নিজের ইচ্ছামতো। কথা দিচ্ছি আমি কোনো বাধা হব না তোমার। এখন শুধু আমাদের সন্তানের কথা ভেবে সবটা মেনে নাও তুমি।'

খুব কেটে কেটে কথাগুলো উচ্চারণ করেছিল সেদিন শাওনের দেখা সেই আপাত ক্যাবলা ছেলেটা। অবাক হয়ে গেছিল শাওন। কে এ? কী বলছে এ সব? বিনা দোষে অন্য কারোর কলঙ্ক মাথায় নিয়ে এভাবে কেউ নিজেকে দুনিয়ার সামনে ছোটো করতে পারে নাকি? এ কেমন মানুষ? এত শক্তি কোথায় পাচ্ছে এই ছেলেটা? মনে পড়েছিল সেদিন শাওনের ছোটোবেলায় শোনা ঠাকুমার সেই গল্প, রাক্ষসের হাত থেকে রাজপুত্র এসে রক্ষা করত রাজকন্যাকে। আবার রাজকন্যা ফিরে পেত নতুন জীবন?

—'অঞ্জন... অঞ্জন... আমি তোমার মতো মানুষের যোগ্য নই। আমি যে নষ্ট হয়ে গেছি। আমায় ভালোবাসতে পারবে তুমি সত্যি করে? নাকি তোমার ঘেন্না আর দয়া নিয়েই বাঁচতে হবে আমায় বাকি জীবন? আসলে আমি যে ঘেন্নারই যোগ্য।' কান্নায় ভেঙে পড়া শাওন সেদিন বলেই ফেলেছিল কথাগুলো শেষমেষ। আছড়ে পড়েছিল ও সেদিন অঞ্জনের বুকে একটুকরো বিশ্বাসে ভরা নিরাপদ ভালোবাসার খোঁজে। অঞ্জনের দু-হাত ছুঁয়ে যাচ্ছিল ওর মাথায় পরম আশ্বাসের স্পর্শ হয়ে, আর শাওনের দু-চোখ ছাপিয়ে বন্যা এসে ভাসিয়ে দিচ্ছিল ওর সব গ্লানি।

—'কিরে দিদি চোখে জল কেন তোর? আজ যে খুশির দিন। লগ্ন যে প্রায় এসেই গেল।' আবার বলল ঠাকুমা আদরের নাতনির চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে।

—'আমি সুখী হতে পারব তো? অঞ্জনকে সুখী করতে পারব তো বল।' আকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করল শাওন।

—'রাজপুত্তর এসে গেছে যে, আর চিন্তা কীসের।' আবার বলল বুড়ি।

—'রাজপুত্তররা শুধু গল্পে নয়, আমাদের জীবনেই থাকে তাই না ঠাকুমা? শুধু অনেক সময় আমরা চিনে নিতে পারি না কেন কে জানে?' ঠাকুমার গলা জড়িয়ে সেই ছোট্টবেলার মতো খিলখিল করে

www.banglabookspdf.com

আবার হাসল শাওন অনেকদিন পর। আজ যে ওর সত্যিকারের নিজের মানুষটাকে পাবার দিন, ঠিক সেই রূপকথার গল্পগুলোর রাজকন্যাদের মতোই।

—

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

সে এসেছিল

১

—'শেষ প্রশ্ন স্যার... আপনি কি কখনো স্বচক্ষে ভূত দেখেছেন বা এমন কোনো অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করেছেন যেটা ঠিক লৌকিক নয়।'

শেষ প্রশ্নটাতেই মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল এ সময়ের প্রখ্যাত সাহিত্যিক অভিযান গুহ'র। অভিযান ভৌতিক অলৌকিক পর্যায়ের সাহিত্য রচনা করেই এই নিদারুন খ্যাতি, টাকা পয়সা সব পেয়েছেন খুব অল্প সময়ের মধ্যেই। অল্প জল খেয়ে বললেন—

—'প্লিজ আজ আর কোনো প্রশ্ন নয়। আমায় এক্ষুনি বেরিয়ে যেতে হবে একটা অন্য ভীষণ জরুরি কাজে।' প্রায় হন হন করে বেরিয়ে গেলেন অভিযান গুহ ইন্টারভিউ রুম ছেড়ে।

২

—'খোকা যে কেন এমন করছে তার কিছুই তো আমি বুঝতে পারছি না। এত নাম ডাক করেছে এখন, কিন্তু সংসার ধর্ম তো করতে হবে এবার। কিন্তু ছেলে তো বিয়ের নাম শুনলেই কেমন যেন আঁতকে ওঠে। কেন যে এমন করছে...' মুখে চিন্তার ভাঁজ ফেলে কথাগুলো স্বামীকে বললেন সুমিত্রা দেবী।

—'আরে ঘটক পরশুদিন যে মেয়েটার ছবি দিয়ে গেছে সে মেয়েটার ছবি খোকাকে দেখাও যখন খোকা আসবে পরের বার। আমি বলছি অমন ডানা কাটা পরীর সমন্ধ খোকা না বলতে পারবে না।'

স্বামীর কথা শুনে খানিক আশ্বস্ত হলেন সুমিত্রা দেবী। কিছুটা স্বগতোক্তির ভঙ্গীতেই বললেন—

—'তাই যেন হয় ঈশ্বর, তাই যেন হয়।'

৩

টিফিন বাক্স খুলে টিফিন খেতে খেতে একদৃষ্টে মেয়েটার দিকে লক্ষ্য করছিল লখা মানে লখিন্দর। লখা নিজের নামটা নিয়ে বড্ড অস্বস্তিতে ভোগে। কেন যে ঠাকুমা এমন একটা বিদঘুটে নাম রেখেছিলেন ওর! ওর নাকি বাইশ বছর বয়সে ফারা আছে। তাই ঠাকুমার ইচ্ছে হল ওর নাম লখিন্দর দিতে... ইশশ! কোনো মানে হয়।

লখা কলেজ পাশ করেছে গত বছর। ও একদমই গ্রামের ছেলে। চালাক চতুরও বিশেষ নয়। শুধু একটু আধটু কবিতা টবিতা লিখতে পারে এই আর কি!

কলেজ পাশ দিয়ে যখন নিপাট শিক্ষিত যুবক হয়ে ঘরে বসেছিল লখা, তখনই বেশ খানিকটা অপ্রত্যাশিত ভাবেই জুটে যায় ওর এই চাকরিটা। ওদের গ্রামেরই লেখা কাকিমার জামাইয়ের

www.banglabookspdf.com

সুপারিশে এই চাকরিটা পেয়ে গেছে লখা। খুব সাধারণ একটা বেসরকারি অফিসে কেরানির কাজ।

অফিসে জয়েন করার পর প্রথম প্রথম সব কিছু ঠিকই ছিল। মন দিয়েই কাজ করছিল লখা। কিন্তু গোলমাল শুরু করল বেয়াড়া এই মনটা। অজন্তা বলে ওই মেয়েটাকে দেখলেই কেন যে বুকের মধ্যে এভাবে ধুকপুকানিটা বেড়ে যায়...

আসলে অজন্তা মেয়েটা সত্যি খুব ভালো। লখা নতুন বলে সবাই যেমন শুরুর দিকে ওকে শুধু নাস্তানাবুদ করার চেষ্টা করত অজন্তা কোনোদিনই তা করেনি। বরঞ্চ লখা কোনো কাজ বুঝতে অসুবিধা হলে ও সব সময় সাহায্য করার চেষ্টা করত লখাকে। আর অজন্তার এই আলাদা রকম মিষ্টি ব্যবহারটাই আস্তে আস্তে লখাকে বড্ড দুর্বল করে দিয়েছে ওর প্রতি।

আগে লখা ভাবত যে লখার ওই মেয়েটার প্রতি এই অনুভূতিটা শুধুই একতরফা। কিন্তু ওকে ভীষণ চমকে দিয়ে ইদানীং অজন্তার ব্যবহারটাও কেমন যেন বদলেছে একটু একটু করে। লখা লক্ষ্য করেছে ইদানীং অজন্তার দৃষ্টিও ছুঁয়ে যায় ওকে একটা অন্যরকম ভালো লাগা নিয়ে। আগে লখা লুকিয়ে লুকিয়ে অজন্তাকে দেখত, কিন্তু আজকাল অজন্তার প্রশ্রয়েই ও মাঝে মাঝেই সরাসরি দৃষ্টি বিনিময় করে অজন্তার সাথে। দু-একবার কাজের অছিলায় ছুঁয়ে গেছে অজন্তার হাত। না, অজন্তা রাগ করেনি। বরং কেমন ভয় পাওয়া ত্রস্ত হরিণীর মতো কেঁপে উঠেছে কখনো, আবার কখনো বা লজ্জার গোলাপি আভা ছড়িয়ে পড়েছে ওর মুখে।

অজন্তার দিকে দেখতে দেখতেই আজও লাঞ্চের রুটি তরকারি খাচ্ছিল লখা। কখন যে তরকারি ফুরিয়ে গেছে, আর শুধু শুকনো রুটিই চিবিয়ে চলেছে ও সেটা লক্ষ্যই করেনি লখা। ও তো আজকাল বেশির ভাগ সময়ই কেমন যেন স্বপ্নের জালে বিভোর থাকে।

—'কী ব্যাপার? শুকনো রুটি খাচ্ছ কেন? তরকারি শেষ? এই নাও। আমার এত তরকারি লাগবে না।'

অজন্তার গলার স্বরেই চমক ভাঙল লখার। অজন্তা নিজের লাঞ্চ বক্স থেকে তরকারি ঢেলে দিচ্ছে লখাকে।

—'এই না না। আমি আর খাব না'.... বাধা দিতে গেল লখা। আর ঠিক তখনই আবার অজন্তার আঙুল ছুঁয়ে গেল লখার হাত।

আবার কেঁপে উঠল অজন্তা। আবার একটা হালকা রক্তিম আভা ছুঁয়ে দিল ওর চিবুক।

লখার বুকের মধ্যেও যেন বয়ে গেল কুলকুল ঝর্না। না অনেক হয়েছে। আর না। নিজের আবেগ নিয়ে আর এভাবে লুকোচুরি খেলতে পারছে না লখা। এবার একটা কিছু করতেই হবে।

—'অজন্তা, আমার তোমার সাথে খুব দরকারি কিছু কথা আছে। যেটা আমি অফিসে বলতে পারব না। আমার তোমার কিছুটা সময় চাই। আজ অফিসের পর একটা কফিশপে একটু যেতে পারবে আমার সাথে?' কথাটা প্রায় একনিঃশ্বাসে বলে দিল লখা।

পলকে ফ্যাকাসে হয়ে গেল অজন্তার মুখ। নিমেষে যেন সবটুকু রক্ত কেউ শুষে নিয়েছে ওর মুখ থেকে। সাদাটে পাংশু বর্ণ মুখে পাক খাচ্ছে একরাশ ভয়।

www.banglabookspdf.com

না, লখা দেখতে পেল না সেটা। বা হয়তো বুঝতেও পারল না। লখার বুক জুড়ে তখন পাক খাচ্ছে শুধুই নবীন প্রেমের উন্মাদনা।

৪

বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে পাগল পারা বৃষ্টিতে ভিজছিল লখা। পাগলের মতো বৃষ্টি হচ্ছে কলকাতা শহর জুড়ে। লখা আজ ছাতা নিয়ে বের হয়নি সকালে। তাই এখন তো ওকে ভিজতেই হবে। অবশ্য তাতে কোন দুঃখ নেই লখার। ভিজতে কোনো আপত্তি নেই। আসলে আর বাঁচতেই ইচ্ছা করছে না ওর। কী হবে আর বেঁচে থেকে! গত পরশু দিনের ঘটনাটা এখনো পুরোপুরি হজম করতে পারছে না ও। কফিশপে সেদিন অজন্তাকে প্রপোজ করেছিল। কিন্তু অজন্তা প্রত্যাখান করেছে ওকে। কিন্তু কেন? না সত্যি বুঝতে পারছে না লখা এই প্রত্যাখানের কারণ কি? লখা নিশ্চিত যে অজন্তা ওকে পছন্দ করে, কিন্তু তাহলে কেন?

অজন্তার জীবনটা অনেকটা অন্ধকার মেঘে ঢাকা এটা ঠিক, কিন্তু তার জন্য ও লখাকে কেন সরিয়ে দিতে চাইছে দূরে? লখা জানে অজন্তার স্বামী মারা গেছেন একটা বিচ্ছিরি দুর্ঘটনায় বছর দুই আগে। আর বর্তমানে অজন্তার তিন কুলে কেউ নেই। সেইজন্যই তো লখা আজ চায় অজন্তাকে নিজের করে নিয়ে ওকে সব ভুলিয়ে দিতে। তাহলে ওর কীসের এত ভয় আজ? কেন সেদিন ওভাবে তড়িঘড়ি কফিশপ ছেড়ে চলে গেল অজন্তা? তারপর গতকাল অফিস পর্যন্ত এল না। আজ সারাদিনে একটি বার তাকাল না পর্যন্ত লখার দিকে।

অবিশ্রান্ত বারিধারা ভিজিয়ে দিচ্ছে লখাকে, তবুও দেখা নেই বাসের। হঠাৎ যেন মাথার ওপর একটুকরো ছাদ অনুভব করল লখা। চমকে পাশ ফিরে তাকাতেই ও দেখল কখন যেন ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে অজন্তা। ছাতা দিয়ে বাঁচাতে চাইছে ওর মাথা। ওকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল লখা তার আগেই খুব চাপা স্বরে কথা বলে উঠল অজন্তা—

—'লখিন্দর আমার তোমার সাথে খুব দরকারি কয়েকটা কথা আছে। খুউব দরকারি।' কেমন হিসহিসে লাগল যেন অজন্তার গলাটা। লখা আবার কিছু একটা বলতে গেল, কিন্তু বলা হল না। তার আগেই সামনে অবতীর্ণ হল রুটের বাস।

পড়িমরি করে বাসটায় উঠে পড়ল লখা। আর উঠেই চমকে গেল। একী! অজন্তাও উঠে এসেছে।

—'কী ব্যাপার তুমি এই বাসে?' প্রশ্নটা করেই ফেলল লখা।

—'আমি রোজ এই রুটের বাসেই ফিরি। আমি তোমার থেকে কিছুটা আগে অফিস থেকে বের হই বলে তুমি হয়তো আগে কোনোদিন দেখনি।' একই রকম চাপা হিসহিসে স্বরে বলল অজন্তা।

মিনিট দশেকের মধ্যেই একটু খালি হল বাসটা। ধপ করে নিজের শরীর ছেড়ে দিল লখা একটা খালি সিটে। ওমনি পাশের খালি সিটে এসে বসে পড়ল অজন্তাও।

—'লখিন্দর, আমি আজ তোমায় এমন একটা কথা বলব যেটা হয়তো তোমার বিশ্বাস হবে না।' মুখে একরাশ ভয় নিয়ে কথাটা বলল অজন্তা।

www.banglabookspdf.com

—'নিলয়, মানে আমার স্বামী খুব সাংঘাতিক লোক। ও যদি একবারও জানতে পারে যে তোমার নজর পড়েছে আমার ওপর, বা আমিও তোমার প্রতি... বিশ্বাস কর নিলয় তাহলে আর আমাদের কাউকে ছাড়বে না। শেষ করে ফেলবে ও আমাদের। কোথাও পালিয়ে বাঁচতে পারব না আমরা।' লখা দেখল ভয় আর আতঙ্কে কেমন অদ্ভুত কালো দেখাচ্ছে অজন্তার মুখ।

—'মানে? এসব কি বলছ তুমি? নিলয় বাবু মানে তোমার স্বামী তো মারা গেছেন।'

—'নিলয় মানসিক ভাবে অসুস্থ ছিল। ওর সবচেয়ে বড়ো অসুখের জায়গা ছিলাম আমি। ওর সব সময় মনে হত আমি ওকে ঠকাব। আমার ভালোবাসা ওর প্রতি পুরোপুরি সৎ নয়। নিলয় মারা যায় অ্যাক্সিডেন্টে। কিন্তু মৃত্যুর পরেও শেষ হয়নি নিলয়ের আমার প্রতি অধিকার বোধ। প্রতি মুহূর্তে ও এখনো কড়া নজরে রেখেছে আমাকে। আমার বিন্দুমাত্র বেচাল দেখলেই ও শেষ করে ফেলবে আমায়। আর সাথে তোমাকেও। তাই প্লিজ তুমি আমার থেকে দূরে দূরে থেকো লখা। এতে তোমার আর আমার উভয়েরই মঙ্গল।'

—'এসব কি পাগলের মতো বলছ তুমি অজন্তা?' বাসের লোকজন উপেক্ষা করেই খানিকটা স্বর চড়িয়ে ফেলল লখা। নিজেকে সংযত করে নিল পরক্ষনেই।

—'আমি ঠিক বলছি লখা। নিলয় আজও আমার সাথেই থাকে। অন্যরূপে, অন্যভাবে। কিন্তু ও ভীষণ ভাবে সত্যি আজও আমার জীবনে।'

হঠাৎ ভীষণ ক্যাচম্যাচ শব্দ করে ব্রেক কষল বাসটা।

—'আমি আসি' বলে দ্রুত পায়ে নেমে গেল বাস থেকে অজন্তা। স্থানুবত হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল লখা। তারপর বাসটা ছাড়ার মুহূর্তটাতেই নেমে পড়ল লখাও।

banglabookspdf.com

৫

বৃষ্টিভেজা সেই সন্ধ্যায় অজন্তার বলে যাওয়া কথাগুলোর বিন্দু বিসর্গ গত সাত দিনেও বুঝে উঠতে পারেনি লখা। কী ওসব কথার মানে? অজন্তা কি কোনো রকম মানসিক ব্যাধির শিকার হয়েছে নাকি জেনে বুঝে ইচ্ছে করেই লখাকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্য এমন আষাঢ়ে ভূতের আজগুবি গল্প ফেঁদেছে ও। এই সব ভাবতে ভাবতেই গত সাতটি দিন কেটে গেছে লখার। কিন্তু কোনো উত্তর পায়নি ও। গত সাতদিন ধরে টানা অফিসে আসেনি অজন্তা। আজ সকালে এসেছিল। তবে অজন্তা নয়। অজন্তার রেজিংগনেশান লেটার। ও খবর পাঠিয়েছে যে ও চলে যাচ্ছে এই শহর ছেড়ে দু-দিন পরেই। অজন্তার ইস্তফার খবরটা পাবার পরই আজ নিজের শেষ সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলেছে লখা। আজ ও সরাসরি পৌঁছে যাবে অজন্তার বাড়ি। ভাগ্যিস! সেদিন সন্ধ্যাতেই অজন্তার পিছু নিয়ে গিয়ে ওর বাড়িটা দেখে নিয়েছিল লখা। কিন্তু সেদিন সাহস হয়নি ওর ওই বাড়িতে ঢোকার। কিন্তু আজ ও ওখানে গিয়েই সরাসরি মুখোমুখি হবে অজন্তার।

সেই মতোই বেরিয়ে পড়েছে আজ লখা অফিস শেষে। এগিয়ে চলেছে ও অজন্তার বাড়ির দিকে। যদিও ঘড়ি বলছে সময় রাত ন-টা সবে, কিন্তু চারপাশটা দেখে যেন মনে হচ্ছে গভীর রাত। অজন্তার

www.banglabookspdf.com

পাড়ায় ইতিমধ্যে এসে পড়েছে লখা। এখন বোধ হয় পাওয়ার কাট হয়েছে এখানে। বর্ষার সন্ধ্যা, তাইতে ঘুটঘুটে অন্ধকার, ঝিঁঝিঁ আর ব্যাঙের অবিরাম কলরব চলছে, সব মিলিয়ে হঠাৎ কেমন যেন গা-টা ছম ছম করে উঠল লখার।

হাঁটতে হাঁটতে এবার লখা চলে এসেছে অজন্তার বাড়ির একদম কাছে। ঘুটঘুটে একলা সন্ধ্যায় কেমন যেন অতৃপ্ত দৈত্যর মতো দাঁড়িয়ে আছে পুরোনো দিনের একতলা বাড়িটা। বাড়িটার দরজার সামনে দাঁড়াল লখা। বুকের ভেতর হঠাৎ যেন কেউ লক্ষ দামামা বাজাতে শুরু করেছে। ভীষণ ভয় করছে হঠাৎ কেন কে জানে!

নাঃ। ভয় কীসের? নিজেই যেন নিজেকে প্রবোধ দিল লখা। কাঁপা হাতে হাতে কড়া নাড়ল অজন্তার দরজায়।

ঠক ঠক... একবার, দু-বার, তিনবার। পর পর তিনবার কড়া নাড়ল লখা।

—'কে? কে?' এবার ভেতর থেকে শোনা গেল অজন্তার গলা।

এতদিন পর ওর গলাটা শুনতে পেয়ে লখার হৃদয়ের ভেতর যেন একসাথে লক্ষ প্রজাপতি উড়ে গেল। সব ভয় নিমেষে উবে গেল।

—'আমি...। আমি লখিন্দর অজন্তা।' বলতে গিয়ে যেন আবেগে গলা বুজে এল লখার।

খুট করে খুলে গেল দরজাটা। সামনে দাঁড়িয়ে অজন্তা। হাতে তার মোমবাতি, যার শিখাটা দুলছে আর লাফাচ্ছে ক্রমাগত।

—'তুমি? তুমি এখানে? তুমি কীভাবে চিনলে এই জায়গা? ভয়ে শুকিয়ে গেছে অজন্তার মুখ। কাঁপছে গলার স্বর।

—'সব কথা বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেই বলবে? ভিতরে আসতে বলবে না?' কথাটা বলেই আর অজন্তার উত্তরের অপেক্ষা করল না ও। খানিকটা ওকে জোর করে ঠেলেই ভিতরে ঢুকে গেল।

—'আমি জানি না লখিন্দর, তুমি কীভাবে চিনলে এই জায়গা। কিন্তু শুধু এই কথাই বলব যে এখানে এসে তুমি আজ তোমার জীবনের সব চেয়ে বড়ো ভুলটা করেছ। আর রক্ষা নেই। আর আমরা কেউ বাঁচব না।' ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে এবার অজন্তা।

—'না অজন্তা না। তোমাকে এভাবে আমি ভয় আর আতঙ্ক নিয়ে বেঁচে থাকতে দেব না। আর তোমাকে আমি চলে যেতেও দেব না। তোমার এসব আজগুবি ভাবনা এবার শেষ করতে হবে। নিলয় বাবু আর নেই। মারা গেলে আর কেউ আসতে পারে না।' অজন্তার একদম কাছ ঘেঁষে বসে বলল লখা।

—'না, লখা তুমি বুঝতে পারছ না'... কথাটা শেষ করতে পারল না ও। তার আগেই লখার গলা চিরে বেরিয়ে এলো একটা তীব্র চিৎকার।

—'অজন্তা... ওটা আ আ কী?' আঁতকে উঠেছে লখা। কারণ আলো আঁধার মাখা ঘরটার কোণে রাখা কাঁচের বাক্সটায় ততক্ষণে চোখ পড়ে গেছে ওর। ও দেখে নিয়েছে যে কাঁচের ওই বাক্সটায় কিলবিল করছে একটা হিংস্র চোখের নধর কালো কেউটে।

www.banglabookspdf.com

—'ওটা নিলয়।' খুব ঠাণ্ডা গলায় উত্তর এল অজন্তার কাছ থেকে।

—'আমি তো তোমাকে বলেইছিলাম যে নিলয় এখনও এখানেই থাকে। আমার সাথে থাকে আমার উপর নজরদারি করবে বলে। নিলয়ের মৃত্যুর দু-দিন পরেই ও আবার ফিরে এসেছিল। সাপের শরীর নিয়ে। প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু তারপর ও নিজেই ধরা দিল। ও বলছে আমাকেও ও সাপ বানিয়ে দিতে পারে যেকোনোদিন। তাই আমি ওর সব কথা শুনে চলি লখা। আর আগামী দিনেও শুনে চলতে হবে আমায়। তাই বলছি তুমি প্লিজ চলে যাও।' কেটে কেটে কথাগুলো বলল অজন্তা।

মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে লখার। এসব কী বলছে মেয়েটা? এই একবিংশ শতকে এমন কথা কেউ বলতে পারে নাকি?

—'অজন্তা আমার মনে হয় তোমার মানসিক চিকিৎসা দরকার। কোনোভাবে একটা ভয়ের মধ্যে আটকে পড়েছ তুমি আর যার থেকে হয়ে যেতে পারে তোমার বড়ো কোনো ক্ষতি। এভাবে একটা সাপ পুষছ ঘরের মধ্যে, আর বলছ ওটা নিলয় বাবু। না, অজন্তা এভাবে চলতে পারে না। আমি তোমায় সাইকিয়াট্রিস্ট এর কাছে নিয়ে যাব।' এবার একটু শক্ত হল লখা।

—'না লখা, আমি সব হারিয়ে ফেলেছি। আমার জীবন স্বপ্ন, সব কিছু।' এবার ডুকরে কেঁদে উঠল অজন্তা।

লখা এগিয়ে গেল অজন্তার দিকে। ওর চোখ মুছিয়ে দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরল ওকে নিজের আলিঙ্গনে—

—'আমি এভাবেই শক্ত করে সারাজীবন বেঁধে রাখব তোমায় নিজের কাছে। দেখি কে আলাদা করে আমাদের। প্রেম যখন জীবনে একবার এসেছে তাকে আমি আটকে রাখবই অজন্তা।' ওর মাথায় একটা গভীর চুমু খেয়ে বলল লখা।

—'সত্যি বলছ? আমায় ভুলে আর অন্য কোনো মেয়ের দিকে তাকাবে না বল? আমায় কোনোদিন ভুলে যাবে না বল? আমি কিন্তু তাহলে খুব কাঁদব। আঁচরে কামড়ে একাকার করব তোমায়? প্লিজ আমার নিলয়ের থেকে বাঁচাও লখা।' লখার বুকে মাথা রেখে হাপুস নয়নে কাঁদছে অজন্তা।

—'নিলয় কিচ্ছু করতে পারবেন না। আমি বলছি শোন।' আশ্বাস ভরা স্বরে বলল লখা।

—'কিন্তু ও...' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল অজন্তা, কিন্তু বলতে পারল না। লখা তার আগেই ওর ঠোঁটে ডুবিয়ে দিল নিজের ঠোঁট।

ঝন ঝন ঝন ঝন... মুহূর্তের মাঝে একটা তীব্র হাড় কাঁপান শব্দে কেঁপে উঠল ঘরের মেঝে। শব্দের অভিঘাতে ছিটকে গেল লখা আর অজন্তা।

হঠাৎ কীভাবে যেন ভেঙে গেছে সাপের কাঁচের বাক্সটা।

—'লখা, লখা নিলয় জেগে উঠেছে।' ভয়ে কাঁপছে অজন্তার স্বর।

www.banglabookspdf.com

বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে লখাও। কাঁচের বাক্স থেকে বেরিয়ে এসেছে সাপটা। আর নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না লখা। সাপটা এবার ফণা মেলে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা সোজা সরলরেখার মতো, ঠিক যেন দু-পায়ে ভর দিয়ে আছে ও।

—'তুমি পালাও লখা।' কোনোমতে বলল অজন্তা। কিন্তু লখা পালাতে পারছে না। কোন অদৃশ্য মায়াবলে যেন স্থবির হয়ে গেছে ওর পা দুটো।

লখা দেখতে পাচ্ছে। ওর চোখের সামনে আস্তে আস্তে সাপটা পরিণত হচ্ছে মানুষে, এমন মানুষ যার সারা শরীরটা ঠিক সাপের খোলসের মতো।

সর্পিল ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে লখার দিকে এগিয়ে আসছে ওই সর্প মানব লখাকে শেষ করতে। লখার মনে পড়ল সবে দু-মাস আগে একুশ পুরে বাইশে পড়েছে ও। আর ঠাকুমা বলেন সর্বদা, বাইশ বছরে ওর মস্ত ফাঁড়া আছে। এই কি তবে সেই ফাঁড়া?

হঠাৎ তড়িৎ গতিতে লাফ মেরে দৌড়ল লখা দরজার দিকে। এক হ্যাঁচকায় দরজা খুলে কোনোমতে বেরিয়ে রাস্তায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে শুনতে পেল ও একটা কান ফাটান আর্তনাদ অজন্তার গলায়।

—'না না নিলয় না। প্লিজ ক্ষমা করে দাও আমায়। না আ আ।'

না লখার আর কিচ্ছু শোনার বা বোঝার অবকাশ নেই। ও এখন ছুটছে পাগলের মতো। ওকে পালাতে হবে যে। পালাতেই হবে যেভাবেই হোক।

না আর ছুটতে পারছে না লখা। পা দুটো অবশ হয়ে আসছে, বুকটা মুচড়ে উঠছে।

আঁক করে একটা মুখ দিয়ে শব্দ বের হল লখার। জ্ঞান হারিয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল ও।

banglabookspdf.com

৬

বিকালের পড়ন্ত আলো ছুঁয়ে যাচ্ছিল প্রখ্যাত ভৌতিক সাহিত্যিক অভিযান গুহকে। অনেকদিন পর গ্রামের বাড়িতে ফিরেছেন। আনমনা হয়েই বসেছিলেন বাড়ির দাওয়ায়। এরকম কত বিকাল আগে কেটেছে এমনই বাড়ির দাওয়ায় বসে। তখন তো আর অস্তিত্ব ছিল না এই বিখ্যাত সাহিত্যিকের, তখন ছিল নেহাতই এক গ্রাম্য যুবক লখা।

মা বারবার বলছেন বিয়ের জন্য। জোর করে হাতে গুঁজে দিয়ে গেছেন একটা ছবি। কিন্তু না। অভিযান ওরফে লখা তো আজও কেমন যেন কেঁপে উঠে কোনো নারী সঙ্গের কথা ভাবলেই। ঝপ করে মনে পড়ে যায় পাঁচ বছর আগের সেই বীভৎস রাতটা। মনে পড়ে যায় লখার সেই সময়ে জীবনে আছড়ে পড়া একটা মোহ। হ্যাঁ মোহই। যদি ভালোবাসা হত তাহলে কি আর লখা পারত সেদিন নিজের প্রাণ বাঁচাতে অমন ভাবে ওকে ফেলে পালাতে?

সেদিন রাতে প্রাণ নিয়ে কোনোমতে পালিয়ে, রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল লখা। হ্যাঁ সেরকমই তো মনে পড়ে ওর। কিন্তু জ্ঞান হবার পর ও নিজেকে খুঁজে পেয়েছিল নিজেরই মেস ঘরের বিছানায়। গায়ে ধুম জ্বর। রুমমেটদের মুখে ও শুনেছিল লখা নাকি মেস বাড়ি থেকে অল্প দূরে পড়ে ছিল

www.banglabookspdf.com

সেদিন। ওদের মেসের রান্নার দিদি ভোর বেলা কাজে আসার সময় ওকে দেখতে পেয়ে তুলে আনে ওকে।

না, লখা সেদিন বুঝতে পারেনি কীভাবে মেস অবধি এসেছিল ও। কিছুতেই মনে পড়েনি ওর। তবে মনে করার চেষ্টাও করেনি আর। সেই বীভৎস স্মৃতি ওর বুদ্ধি, যুক্তি, মানবিকতা সব স্থবির করে দিয়েছিল সেদিন। কোনো দিকে না তাকিয়ে, কোনো কথা না ভেবে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সোজা ফিরে এসেছিল গ্রামের বাড়ি।

অনেকদিন কেমন যেন আতঙ্কের ঘোরে ছিল। তারপর হাতে তুলে নিয়েছিল পেন। কিন্তু আর কবিতা নয়, হাত থেকে বের হতে শুরু করেছিল ভূতের গল্প। আস্তে আস্তে দু-একটা পত্রিকায় জায়গা পেল লেখা। তারপর বই। আর সেই বইয়ের চরম সাফল্য এক ধাক্কায় অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিল ওকে। আর আজ তো ও নামজাদা সাহিত্যিক।

আজ এত গুলো বছর পার হয়ে যাবার পর মাঝে মাঝে মনে হয় লখার সত্যি কি ওই বীভৎস রাতটা এসেছিল লখার জীবনে? নাকি সবটাই ছিল জ্বরের ঘোরের দুঃস্বপ্ন? আচ্ছা এমনও তো হতে পারে অসুস্থ অবস্থায় ও রাস্তায় জ্ঞান হারিয়ে পড়েছিল আর তখনই চোখে নেমে এসেছিল সেই ভয়ানক স্বপ্ন?

না মনে যেমন খেয়ালই আসুক না কেন, লখা পারেনি একবারও আর অজন্তার খোঁজ নিতে। কলকাতা শহরে ফেরার পরেও পারেনি। যখনই ভেবেছে অজন্তার কথা, তখনই ভয়ে অসাড় হয়ে এসেছে ওর শরীর।

কিন্তু বয়সও বাড়ছে। সবাই বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে। কী একটা ভেবে যেন হাতের ছবিটা দেখল এবার লখা। মেয়েটার সম্বন্ধ এনেছে ঘটক। হ্যাঁ সবাই বলছে ঠিকই। মেয়েটার রূপ সত্যি মন ভোলান। ছবিটার দিকে দেখতে দেখতে মনটা কেমন দুলে উঠল যেন বিখ্যাত সাহিত্যিকেরও। না এই মেয়েকে নিয়ে ঘর বাঁধলে বেশ হবে।

মা-কে গিয়ে এবার বলবে বিয়েতে মত আছে। উঠতে গেল ও। কিন্তু একী? পা সরছে না কেন লখার? মনে হচ্ছে পা দুটো যেন কেউ গেঁথে দিয়েছে মাটির সাথে। আর হাতটা কেন এমন ভারী ঠেকছে? বুকের ভেতর কেন এমন আতঙ্ক ঢেউ খেলে যাচ্ছে?

একী? একী? কী হচ্ছে এটা? শিরদাঁড়া দিয়ে হিমেল স্রোত বইছে লখার। একী! ছবির মেয়ের মুখটা এমন বদলে যাচ্ছে কী করে? একী? ছবির মেয়েটা একটু একটু করে যে পরিণত হচ্ছে লখার সেই পুরোনো প্রেমের মানবীতে... অজন্তা! সাপের মতো সুড়ুত করে জিভ বের করল অজন্তা। হিসহিস করে বলল—

'—বলেছিলাম না, আমায় ভুলে অন্য কাউকে মনে জায়গা দিলেই আঁচড়ে কামড়ে শেষ করে দেব। তোমার মিথ্যা ভালোবাসায় ভুলে সেদিন শেষ হয়ে গেছিলাম আমি। তবুও এতদিন ক্ষমা করে দিয়েছি তোমায়। কিন্তু তুমি এবার সুখে সংসার করব ভেবেছ!'

www.banglabookspdf.com

—'না না না আ আ! প্লিজ মেরো না আমায়...' একটা গোঙানি মেশান চিৎকার বেরিয়ে এলো লখার গলা থেকে।

* * *

সাহিত্য জগতে আজ শোকের ছায়া। মারা গেছেন বিখ্যাত সাহিত্যিক অভিযান গুহ, সর্প দংশনে। গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলেন লেখক। একলা বলেছিলেন খোলা দাওয়ায়। আর তখনই ঘটে ঘটনাটা। আসলে বর্ষাকাল, ঝোপ ঝাড় ভরা এলাকা। হয়তো লেখক খেয়ালই করেন নি কখন সে এসে ফণা তুলেছে ওনার দিকে।

বি. দ্র: লেখকের মৃতদেহের পাশে পড়েছিল একটা মেয়ের ফোটোগ্রাফ। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে ওই মেয়েটির সাথেই বিয়ের কথাবার্তা চলছিল অভিযান গুহ'র।

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

আমি শুধু চেয়েছি তোমায়

১

—'এই ভ্যালেনটাইন্স ডে তে সারাদিন ধরে মুভি প্লাস চ্যানেলে দেখুন পর পর ব্লকবাসটার হিট ছবি। দেব, জিৎ আর প্রসেনজিৎ...'

উফফ! এই এক জিনিস দেখিয়ে দেখিয়ে ক-দিন ধরে চোখ পচিয়ে দিল একেবারে। একরাশ বিরক্তি নিয়ে রিমোটের বোতাম টিপে চ্যানেলটা ঘুরিয়ে দিল নীলিমা।

—'এই ভ্যালেন্টাইন ডে তে নিজের মনের মানুষকে মনের মতো উপহার দিতে চলে আসুন মায়াবী জুয়েল হাউসে...'

এবার টিভিটা বন্ধই করে দিল নীলিমা। এই এক শুরু হয়েছে এখন। এই সব ভ্যালেন্টাইন ডে নাকি সব গুষ্টির পিণ্ডি এসব আগে ছিল না এত। এখনই যত্ত বাড়াবাড়ি।

টিভি বন্ধ করে হালকা পাখা চালিয়ে চাদর ভালো করে মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল নীলিমা। প্রতিদিন এই সময় মানে এই দুপুরের দিকটায় টিভি নিয়েই থাকে ও। কিন্তু আজ ইচ্ছে করছে না। কিচ্ছু ভালো লাগছে না।

আর চারিদিকে এই ভ্যালেন্টাইনের ভ্যানভ্যানানি দেখতে আরও বেশি যেন অসহ্য লাগছে আজ। আসলে নীলিমার মতো মেয়েদের কাছে ভ্যালেন্টাইন ডে আর বাকি আর পাঁচটা দিনের তো কোনো পার্থক্য হয় না, তাই এসব আদিখেত্যাও জাস্ট পোষায় না।

প্রেম দিবস! হুহ! প্রেম বলে কি আদৌ কিছু হয় নাকি যে তার আবার আলাদা করে কোনো দিন হবে! হ্যাঁ প্রেম নামক ওই শব্দটা সিনেমা, সিরিয়াল বা গল্পের বইয়ের পাতার বাইরে থাকে না, এটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে নীলিমা। কারণ এই চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত নীলিমা জীবনে প্রেম বলে কোনো বস্তুর দেখা পায়নি।

হ্যাঁ সেই বয়স যখন ওর চোদ্দ ছিল তখন পাড়ার বিনোদদা'কে ওর খুব ভালো লাগত। কী সুন্দর দেখতে। কী সুন্দর গান গাইত লোকটা। তখন নীলিমা রোজ স্কুল যাবার পথে দু-চোখ ভরে দেখত বিনোদদাকে। রোজ সকালে ওই সময়টাতেই জানলার পাশে বসে রেওয়াজ করত বিনোদ দা। ওকে দেখে তখন নীলিমার মনে হত ইশশ! যদি এই লোকটার পাশে বসে ওর চোখে চোখ রেখে সারাজীবন ধরে বসে ওর গান শোনা যেত, তাহলে কি ভালোই না হত।

এরকম ভাবতে ভাবতে যখন নীলিমার দিন কাটছিল তখনই দুম করে একদিন বাড়িতে চলে এল বিনোদদা'র বিয়ের কার্ড। কার্ডটা দেখে বুকের কাছটা কেমন যেন মুচড়ে উঠেছিল নীলিমার। কয়েকদিন পর পর রাতে আর ঘুম হয়নি। শুধু এটা ভেবে মনের মধ্যে হুহু করেছিল যে এবার থেকে

www.banglabookspdf.com

আর বিনোদদাকে দু-চোখ ভরে দেখার আর তাকে নিয়ে স্বপ্নের জাল বোনার অধিকারটা থাকবে না ওর। বিনোদদা পুরোপুরি অন্য কারোর হয়ে যাবে।

যাই হোক সেই প্রথম আর সেই শেষ। এই ঘটনার পর আর কোনদিন প্রেম প্রেম ভাব জাগেনি নীলিমার মধ্যে। আর বিনোদদার বিয়ে হবার পর, ওই বউকে দেখার পর আস্তে আস্তে নীলিমার মন থেকে মুছে যেতে শুরু করছিল বিনোদ প্রীতি।

তারপর তো আর বছর কয়েকের মধ্যে বিয়েই হয়ে গেল ওর কলকাতা শহরের দায়িত্ববান সরকারি কেরানি রতন হালদারের সাথে। হ্যাঁ দেখতে দেখতে এই রতন হালদারের সংসারে আঠারোটা বছর পার হয়ে গেল নীলিমার।

এই আঠারো বছরে নীলিমা কোনোদিনই প্রেম খুঁজে পায়নি সম্পর্কের মাঝে। রতন বরাবরই খুব ছাপোষা মানসিকতার মানুষ। সে খুব দায়িত্ববান গৃহকর্তা নিঃসন্দেহে। তা ছাড়া বলাই বাহুল্য যে রতন খুব কর্তব্যপরায়ণ বাবা, খুবই নিয়ম মেনে চলা দায়িত্বশীল স্বামী। তবে কোনোভাবেই এক কণাও প্রেমিক নয়। রতন খুব সৎ মানুষ। সে খুব নিষ্ঠা করে পুজো জ্ঞানে নিজের চাকরি করে, নেশা করে না, মেয়েদের দিকে বদ নজরেও তাকায় না। বলা ভালো রতন মধ্যবিত্ত জীবনের গতানুগতিক নিয়মের এক চুলও এদিক ওদিক করে না। আর সেই জন্যই মাঝে মাঝে নীলিমার মনে হয় রতন বুঝি অনুভূতি শূন্য একটা রোবট। যে যন্ত্রের মতো সংসার করে যে ভাবে, বিছানায় নিজের শরীরের জৈবিক নিয়মের খাতিরে রমণও করে সেভাবে আবার বাজারে গিয়ে আলু পটলও কিনে আনে সেভাবে।

ঘটাং ঘটাং করে বাইরের গেট খোলার শব্দে নীলিমা বুঝল বুবান ফিরল স্কুল থেকে। ফিরুক গে। আজ আর উঠতে ইচ্ছা করছে না নীলিমার। পুঁটি আছে। ওই দরজা খুলে খেতে দিয়ে দেবে ওকে একটা দিন।

বুবান মানে নীলিমার একমাত্র ছেলে। এখন ক্লাস নাইন। দেখতে দেখতে ওই একরত্তি ছেলেটাও চোখের সামনে কত বড়ো হয়ে গেল। এখন নিজের জগতেই সে ডুবে থাকে বেশি। তাই নীলিমা যেন আরও বেশি একা হয়ে গেছে আজকাল। তবুও ছেলেটা যখন মা-এর আঁচল ধরা ছিল তখন ওকে নিয়ে সময়টা কেটে যেত নীলিমার। কিন্তু এখন তো আর ছেলেরও মা-কে সেভাবে প্রয়োজন নেই। আর রতন হালদার? সে, আর কবেই বা নীলিমাকে নিয়ে ভেবেছে। ভাবতে জানে নাকি আদৌ লোকটা? কোনো অনুভূতি থাকলে তো! আজকাল সত্যি চোখ ফেটে জল আসে নীলিমার। এই ভাবে ভালোবাসাবিহীন একটা আসবারের মতোই তাহলে কাটবে ওর বাকি জীবনটাও? কেউ তো বোঝে না নীলিমা কতখানি একা আর নিঃস্ব। এই চার দেওয়াল, বাংলা মেগা সিরিয়াল আর দেব জিতের সিনেমা দিয়ে নিজেকে যে আর ভুলিয়ে রাখতে পারছে না ও।

—'কি হল মা শুয়ে আছ এভাবে ঘর অন্ধকার করে? শরীর খারাপ নাকি তোমার?' বুবান মায়ের ঘরে ঢুকেই ছুঁড়ে দিল প্রশ্নটা।

www.banglabookspdf.com

—'না শরীর খারাপ নয়। এমনি। ভালো লাগছে না। তুই খেয়ে নে। পুঁটিদিকে বল ও দিয়ে দেবে।' ধরা গলায় জবাব দিল নীলিমা।

—'শরীর খারাপ নয় তো কি হয়েছে? ও বুঝেছি। সকালে বাবার সাথে যে ঝগড়া হল সেই নিয়ে মুড অফ তোমার। তাই তো? উফফ! মা এই হয়েছে তোমাদের প্রবলেম। প্রথমে নিজেরাই ঝামেলা করবে আর তারপর নিজেরাই মুড অফ করবে। কোনো মানে হয়? তার চেয়ে ভালো কথা বলছি শোন। এই সব অশান্তি মিটিয়ে নাও। কাল বাদে পরশুই ভ্যালেন্টাইন ডে। বাবাকে একটা গোলাপ আর সিগারেটের প্যাকেট দিয়ে পটিয়ে ফেল। তারপর দেখবে বাবা ঠিক তোমার দাবি মেনে নেবে।' হে হে করে হেসে নিজের বিধান শুনিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বুবান।

আবার চোখ ফেটে জল আসছে নীলিমার নিজের পেটের ছেলেটাও ওকে বোঝে না। কি লাভ আর ওর বেঁচে থেকে। আজ সকালে... আজ সকালে যা কিছু হয়েছে সবটাই তো চোখের সামনে দেখল বুবান। তারপরেও মায়ের হয়ে একটি কথাও বলল না বাপের বিরুদ্ধে। অবশ্য কেনই বা বলবে। বাপের পয়সায় খায় পরে ছেলে। কিন্তু নীলিমার শ্রম! তার কি কোনো দাম নেই। কি না করেছে নীলিমা এই সংসারের জন্য? যেদিন থেকে বিয়ে হয়ে এসেছে সেইদিন থেকে ভেবে গেছে সকলের কথা। মুখ বুজে শ্বশুর শাশুড়ির সেবা করে গেছে তাদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। প্রতিটা মুহূর্তে ভেবে গেছে কীভাবে সংসারের মানুষগুলোকে শুধু আর একটু বেশি ভালো রাখা যায়। প্রতিদিন সবার মন মত খাবার বানান, ঘর গোছান, সকলের মঙ্গল কামনায় ব্রত করা, পুজো দেওয়া এসবেরল কি কোনো দাম নেই?

কোনোদিন নীলিমা মুখ ফুটে কিচ্ছু চায়নি স্বামীর থেকে। না শাড়ি, না কোন দামি হোটেলে ডিনার। এমনকী নিজের একফালি ছাদের স্বপ্নটাকেও মেরে ফেলেছে গলা টিপে। এই ভাড়ার বাড়িটাকেই বানিয়ে নিয়েছে নিজের স্বর্গ। আর বাইরের খাওয়া বলতেও নীলিমার কাছে বড়োজোর পাড়ার মোড়ের বিমলের দোকানের বিরিয়ানি আর মাঝে মাঝে রতনের বিকালে কিনে আনা ডিমের চপ। কিন্তু তারপরেও সংসারের আজ ওর এই দাম!

পরের মাসে বড়দার মেয়ে মানসীর বিয়ে। তাই নীলিমার বড়ো ইচ্ছে ওকে একটা গলার চিক উপহার দেবার। সেই কথা ও বলেও ফেলেছে মানসীকে। নিজের জন্য তো কোনোদিন কিছু চায়নি ও বরের কাছে, তাই প্রথমবার কিছু একটা বললে রতন না করবে না বলেই ওর বিশ্বাস ছিল।

—'সামনের মাসেই তো মানুর বিয়ে। তাই ওর জন্য তো ভালো কিছু উপহার নিতে হবে। মানে সোনার কিছু।' কথাটা আজ সকালেই রতনকে বলেছিল নীলিমা।

অফিস যাবার জন্য তখন তৈরি হচ্ছিল রতন। ভাবলেশহীন গলায় জবাব দিয়েছিল—

—'হ্যাঁ জানি। টাকা আমার সরানো আছে আলাদা। কানের ফুল দেবে তো? হয়ে যাবে। কবে কিনতে যাবে বল।'

—'না কানের ফুল না। আমি ওকে গলার চিক দেব। ওকে আমি বলেছি।'

www.banglabookspdf.com

—'গলার চিক মানে?' আকাশ থেকে যেন পড়েছিল রতন। আর ওর ওই ভঙ্গিমাটা দেখে ধাঁ করে মাথাটা গরম হয়ে গেছিল নীলিমার।

—'গলার চিক মানে গলার চিক। শোননি নাকি আগে কখনো।'

—'না নীলিমা। ওসব হবে না। আমার অত বাড়তি টাকা নেই। কানের ফুলই ঠিক আছে।'

আর সহ্য করতে পারেনি নীলিমা। বেশ চেঁচিয়ে বলে উঠেছিল—

—'না ঠিক নেই কানের ফুল। আমি চিকই দেব। জীবনে কোনোদিন কিছু চাই না বলে খুব পেয়ে বসেছ না? কোথা থেকে টাকা জোগাড় হবে জানি না আমি। চিক দেব ব্যস।'

—'আর আমিও বলে দিচ্ছি আমি একটা বাড়তি টাকাও দিতে পারব না। কত খেটে রোজগার করতে হয় জান?'

শেষ কথার শ্লেষটা চরম ভাবে বিদ্ধ করেছিল নীলিমাকে। ও রোজগার করে না বলে আজ এত বছর পর রতন খোঁটা দিচ্ছে ওকে? অনেক কষ্টে কান্না চেপে বলেছিল—

—'অনেক হয়েছে আর না। অনেক মানিয়ে চলেছি আমি, কিন্তু এবার আমি সত্যি ক্লান্ত। পারছি না আর তোমার সাথে চলতে। ছেলেও বড়ো হয়ে গেছে। এবার দয়া করে মুক্তি দাও আমায়। আমি সত্যি আর থাকতে চাই না তোমার মতো লোকের সাথে।' বলেই ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল দুম করে।

সত্যি নীলিমা চলে যাবে। যেদিকে দু-চোখ যায় সেখানেই চলে যাবে ও। এই সংসারে আর ও থাকবে না। এখানে তো ওর কোনো দামই নেই।

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

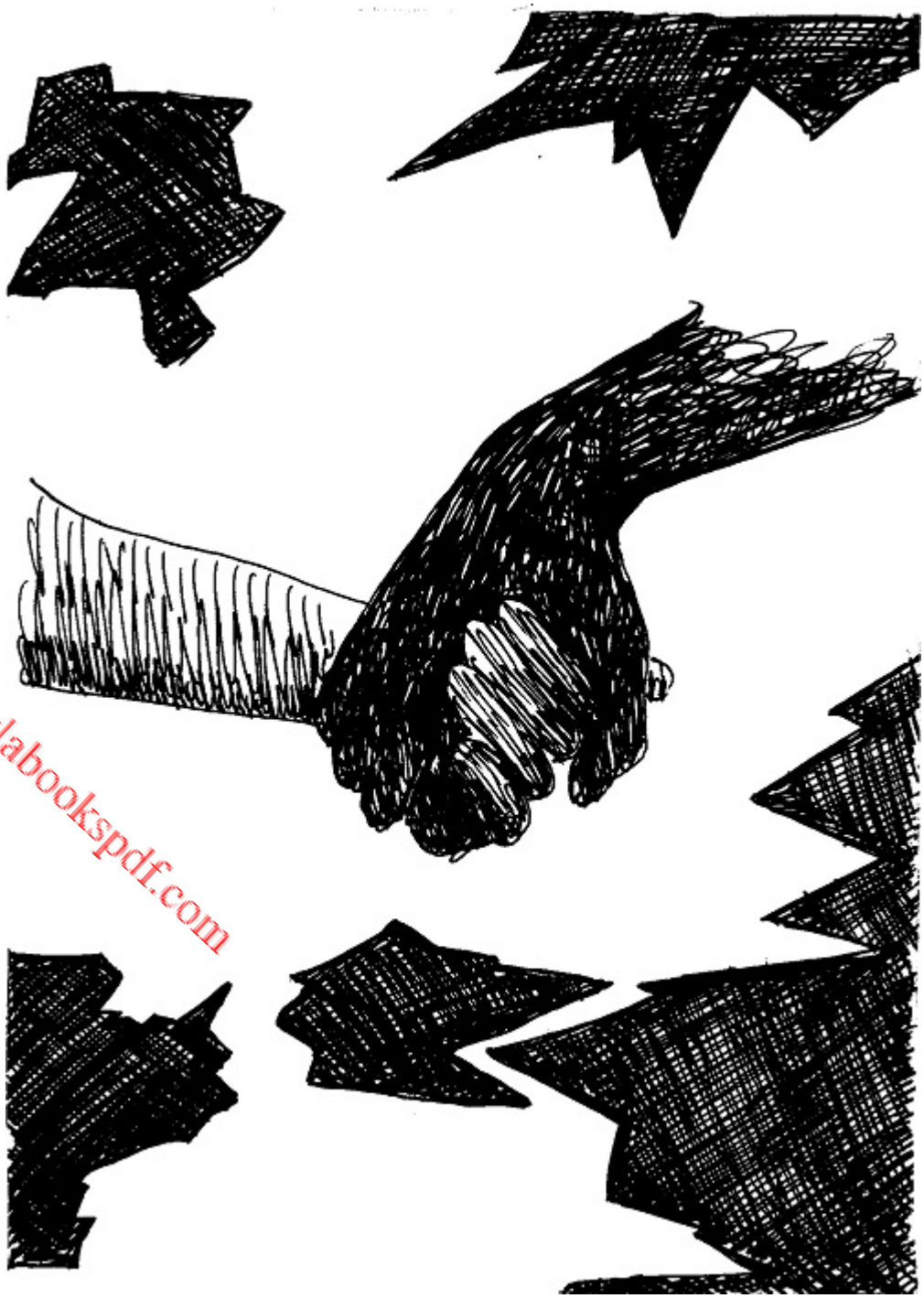

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

—'বউদি একটা কথা ছিল।' দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে পুঁটি।

—'বল কী হয়েছে?'

—'আমায় দু-শো টাকা আগাম দেবে গো?'

—'মানে? কী জন্য আগাম দেব? এই তো ক-দিন আগে মাইনে পেলি।' বিরক্ত গলা এবার নীলিমার।

—'না মানে আসলে পরশু তো ইয়ে মানে... মান ভেলেটিন ডে না ওই কি যেন... তাই আমার ব ফেরেনড (বয়ফ্রেন্ড) কে একটা কিছু দেব।'

উফফ! আবার ঘুরে ফিরে সেই ভ্যালেন্টাইন ডে। না অসহ্য লাগছে নীলিমার এই বিষয়টা। ওর তো না আছে জীবনে ভালোবাসা আর না আছে ভালোবাসার দিন... তবুও ওর সামনেই বারবার কেন আসছে এই কথা!

—'কোনো আগাম হবে না। যা এখন।' খিঁচিয়ে উঠল নীলিমা।

মনটা খুব ভারাক্রান্ত লাগছে। না, সত্যি সবার জীবনে সব কিছু থাকে না। তাই নীলিমার জীবনেও নেই। প্রেম ভালোবাসা এই সব শব্দগুলো এই নীলিমার আর এই জীবনে খুঁজে পাওয়া হল না।

২

সিটটা খালি হতেই তাতে ধপ করে নিজের শরীরটা ছেড়ে দিল রতন। উফফ! বাসে সিট খালি পাওয়া তো নয় যেন ভগবানের দেখা পাওয়া। দিন দিন এই অফিস টাইমে বাসে করে বাড়ি ফেরার পর্বটা যেন কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছে। অন্যদিন সিট পাওয়া নিয়ে এত চাপ নেয় না রতন। কিন্তু আজ শরীরটা সত্যি বিশেষ ভালো লাগছে না। সকাল থেকে মাথার মধ্যে কেমন যেন চাপ ধরে আছে। আর এখন তো নিঃশ্বাসটা কেমন যেন বন্ধ হয়ে আসছে এই ভিড় বাসটায়।

ধুর! আর ভালো লাগে না। বাঁচতেই আর ইচ্ছে করে না রতনের। কি লাভ আর এই থোর বড়ি খাড়া জীবনটাকে বয়ে বেড়িয়ে নিয়ে। অনেক তো হল।

ছোটোবেলা থেকেই বড্ড সাদা মাঠা ছেলে রতন। পড়াশুনায় সাধারণ, কথাবার্তা হাঁটা চলা চেহারা সবই সাধারণ। সেটা জানত রতন বরাবরই। তাই গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার পর যখন একটা সরকারি চাকরি জুটেছিল তাতে বেশ খুশিই হয়েছিল ও। হোক না কেন কেরানির চাকরি, তবুও সরকারি তো।

বিশেষ কোনো মেয়ের প্রতি প্রেম ট্রেম কোনোদিনই তেমন আসেনি রতনের মনে। তাই বাবা মা যখন বললেন সেজ মাসিমার ননদের মেয়ের সাথে সম্বন্ধ এসেছে রতনের আর তাকে দেখতে যেতে হবে, তখন বাবা মা-র বাধ্য ছেলে হয়ে চলেই গেছিল রতন।

মেয়েটাকে দেখে প্রথমবারেই কি যেন একটা হয়েছিল রতনের। কি যে ঠিক হয়েছিল সেটা ও নিজেও বুঝতে পারেনি সেদিন।

ফর্সা মুখ, টোল পরা গাল আর জোড়া ভুরুর মাঝে কালো ছোট্ট টিপ আর তার মাঝেই নিজের মনটা হারিয়ে ফেলেছিল রতন। বাড়ি ফিরে বাবা মা-কে জানিয়েছিল বিয়ে করলে শুধু মাত্র এই মেয়েকেই বিয়ে করবে ও।

www.banglabookspdf.com

তারপর শুভ দিনে বর বেশে রতন পৌঁছে গেছিল তাকে একদম নিজের করে নিয়ে আসার জন্য। বিয়ে ঠিক হবার পর থেকে প্রতিদিন রাতে তাকে নববধূর সাজে কল্পনা করে রতন যে কি ভীষণ রোমাঞ্চিত হত তা শুধু ও নিজেই জানে।

শুভদৃষ্টির সময় চোখে একরাশ স্বপ্ন আর ভালোবাসা নিয়ে রতন তাকিয়েছিল তার দিকে। কিন্তু ওই চোখ দুটো কেমন যেন ভাবলেশহীন। সম্প্রদানের সময় ঘটের উপরে রাখা গামছার আড়ালে রতন নিজের সবটুকু ভালোবাসা উজাড় করে চেপে ধরেছিল তার হাতে। ভেবেছিল বোধ হয় তার মুখেও ফুটে উঠবে চিরাচরিত কনে সুলভ গোলাপি আভা। কিন্তু না। সে মুখ তখনও নির্বিকার। ফুল শয্যার রাতেও তাই। রতন ঢেলে দিতে চেয়েছিল তার সবটুকু উষ্ণতা, কিন্তু সে? না তাকে সেদিনও পড়তে পারেনি রতন।

প্রথম প্রথম রতন ভাবত সবে নতুন বিয়ে হয়েছে, নিজের পরিবার পরিজনদের সকলকে ছেড়ে নতুন পরিবেশ তাকে মানিয়ে চলতে হচ্ছে তাকে আর সেই জন্যই হয়তো এত উদাস থাকে সে। কিন্তু না। আসল কারণটার তল রতন পেয়েছিল বিয়ের প্রায় মাস ছয়েক পর। রতনেরই ছোটো শালি পরমা ইয়ার্কিচ্ছলে বলে ফেলেছিল একদিন। বিয়ের আগে নাকি তার মনে ধরেছিল তাদেরই পাড়ার এক গানের মাস্টারকে। দারুন নাকি গানের গলা তার, আর সাথে চেহারা খানাও খাসা। পুরো বাংলা সিনেমার চিরঞ্জিত টাইপ।

সবটা শুনেই কেমন যেন কুঁকড়ে গেছিল রতন। মুহূর্তের মাঝেই নিজেকে একটা জোকার বলে মনে হয়েছিল। সত্যি তো। নীলিমার মতো মেয়ের পাশে তো অমন ছেলেকেই মানায়। রতনের মতো কালচে গায়ের রং, তোবড়ানো গাল আর হাফ টেকো টাইপ একটা মানুষকে কি আর নীলিমার পছন্দ হতে পারে। সেদিনের পর থেকেই একটু একটু করে নিজের আবেগ আর তার প্রকাশকে গুটিয়ে নিয়েছিল রতন।

নীলিমা খুব কতর্ব্যপরায়ণ মেয়ে। রতন বা তার বাড়ির লোকদের প্রতি দায়িত্ব বা কর্তব্য নিয়ে সে একদম একশো ভাগ সৎ। কিন্তু রতন তো এই দায়িত্বের ভার বয়ে চলা এই মানুষটাকে চায়নি। ও তো শুধু চেয়েছিল নিজের জন্য এক সমুদ্র ভালোবাসা খুঁজে পেতে যেমনটা ওর নিজের মনে আছে নীলিমার জন্য।

কিন্তু না। এই আঠারো বছরে একদিনও নীলিমার চোখে দেখতে পায়নি নিজের জন্য সেই বাঁধন ভাঙা প্রেম। উল্টে ওর ভালোবাসাকেও নীলিমা বুঝতে পারেনি কোনোদিন। বুঝতে চায়ইনি। বিয়ের পরে নীলিমা পুজোর সময় জামা কাপড় কিনতে যেত রতনের মায়ের সাথে। সাধারণত নিজের পছন্দ মতোই শাড়িটারি কিনত ও। কিন্তু তবুও একবার নিজের পছন্দে বেগুনি রঙের জমকালো একটা শাড়ি কিনে নিয়ে গেছিল ওর জন্য। বেগুনি রঙটা যে রতনের বড্ড প্রিয়। প্রথবার নিজে হাতে নীলিমাকে উপহার দেওয়াটা নিয়ে সেদিন বেশ উত্তেজিত ছিল রতন। কিন্তু মুহূর্তের মাঝেই নীলিমা নিভিয়ে দিয়েছিল সবটা।

www.banglabookspdf.com

—'ইশশ! কী শাড়ি এটা? কী বাজে রং। আর এত জংলা কাজ আমি পড়ি নাকি? তুমি রাখ এটা। সামনের মাসে সুভাষ কাকুর মেয়ের বিয়ে আছে, তখন ওকেই দিয়ে দেব এটা। আর পয়সা খরচ করে কিনতে হবে না তখন।'

শুধু বোকার মতো একটু ঘাড় নেড়েছিল রতন।

আর একবার নিজের পছন্দ মতো এক নাকছাপি নিয়ে গেছিল ও নীলিমার জন্য। নীলিমার জন্মদিনে। ওর মনে হয়েছিল দারুন মানাবে এটা ওকে। কিন্তু সেদিনও নীলিমা গুরুত্ব দেয়নি ওর ভাবনাকে।

—'এ বাবা! কি বিচ্ছিরি জিজাইন। তুমি আমায় না দেখিয়ে কেন কিনতে যাও বলতো। শুধু শুধু পয়সা খরচ। যাকগে এটার ক্যাশ মেমো আছে তো? কাল গিয়ে পাল্টে আনব আমি।'

এরপর থেকেই আস্তে আস্তে নিজের সব আবেগকে গলা টিপে শেষ করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল রতন। কিছুটা পেরেও ছিল। কিন্তু অনেকটাই পারেনি। সেইজন্যই তো ওর ভালো লাগা, মন্দ লাগা, খুশি অখুশি নিয়ে আজও এত বেশি ভাবে রতন।

রতন জানে মুখ ফুটে না বললেও নিজের একটুকরো বাসার বড়ো সাধ মানুষটার। আর তাইতো অফিসের অজিতদার সাথে কথা বলেছে রতন। অজিতদা ব্যবস্থা করে দেবেন বলেছেন। সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্ল্যাট। অজিতদার চেনাও আছে। বেশ সস্তায় হয়ে যাবে। নিজের সব শখ আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে শুধু নীলিমার এই সাধটা মেটানোর জন্যই যে তিল তিল করে পয়সা জমাচ্ছে রতন। নীলিমাকে জানতে দেয়নি। ভেবেছিল হঠাৎ একদিন বলে চমকে দেবে ওকে। ওর মুখে সেই আচমকা অনাবিল খুশি দেখতে পাওয়ার সাধটা রতনের আজও মেটেনি যে।

না এখন হিসেব বহির্ভুত খরচ করাটা রতনের পক্ষে সত্যি সম্ভব নয়। সেইজন্যই তো আজ না চাইতেও নীলিমার দাদার মেয়েকে চিক দেবার প্রস্তাবটা খারিজ করতে হল রতনকে। হ্যাঁ হয়তো এতে নীলিমার রাগ করাটা স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু তা বলে এত বড়ো কথা! আঠারো বছর সংসার করার পরও কি নীলিমার এতটুকু মায়া জন্মায়নি এই ছাপোষা কুদর্শন মানুষটার ওপর? না নিশ্চয় জন্মায়নি। তা না হলে কি আর বলতে পারত যে মুক্তি চায় ও। হ্যাঁ ও তো বলেই দিল রতনের মতো মানুষকে নিয়ে আর চলতে পারছে না ও।

না সত্যি বড্ড বেশি কষ্ট হচ্ছে আজ রতনের। বুকের কাছটায় একটা অসহ্য চাপ লাগছে। মনে হচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা যেন ছিঁড়ে যাবে এবার। দমটা বন্ধ হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। আস্তে আস্তে চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে আসছে এই পৃথিবী, চারপশাটা, এই বাসটা।

—'দাদা... দাদা কী হয়েছে আপনার? আপনি এমন করছেন কেন? দাদা... এই জল দে ওনাকে... এক্ষুনি নিয়ে আয়...'

কতগুলো অচেনা মুখ ঝুঁকে পড়েছে রতনের ওপর। একরাশ অচেনা কণ্ঠস্বর ওকে নিয়েই যে কথা বলছে বুঝতে পারছে রতন। বাসটা কি থেমে গেল এবার? আস্তে আস্তে সব শব্দ ফিকে হয়ে আসছে। সব দৃশ্য ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। রতন কি মারা যাচ্ছে তাহলে? হ্যাঁ তাই বোধ হয়। এই বেশ। নীলিমা

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

তো মুক্তিই চেয়েছিল ওর থেকে। নীলিমাকে মুক্তি দিয়ে চলে যাচ্ছে ও। ও ভালো থাক... সুখে থাক... আর রতন থাকবে না ওর জীবনে। আর রতন ভাববে না ওর কথা। অনেক দূরে... অনেক দূরে এবার চলে যাচ্ছে রতন।

৩

—'রতন হালদারের বাড়ির লোক কে আছেন?' নার্সের আচমকা কর্কশ স্বরে ঈষৎ কেঁপে উঠল নীলিমা। গত দেড় দিন ধরে এই নার্সিং হোমেই পড়ে রয়েছে ও। এক মুহূর্তের জন্যও যেতে পারেনি মানুষটাকে ফেলে। সবার হাজার অনুরোধ সত্ত্বেও মুখে বিশেষ কিছু তুলতেও পারেনি। কী করেই বা পারবে। ওখানে যে লোকটার যমে মানুষে লড়াই চলছে।

সব হয়েছে নীলিমার জন্য। না নিজেকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবে না ও। সেদিন ঠিক বেরোবার আগের মুহূর্তেই চিক দেবার ব্যাপারটা নিয়ে ওই তো অশান্তি বাধিয়েছিল। ভালো করে খেয়েও যেতে পারেনি মানুষটা। নিশ্চয় সারাদিন ধরে খুব টেনশন করেছে আর তার ফলেই...

আসলে নীলিমা যে সত্যি একেবারেই বুঝতে পারেনি এমন কিছু ঘটতে পারে। ঝগড়া অশান্তি তো ওদের এর আগেও কতবার হয়েছে। কিন্তু তা বলে এত মারাত্মক তার ফল! ডাক্তাররা বলছেন রতনের হার্ট অ্যাটাকটা বেশ ভালোই সিরিয়াস। বহুদিন ধরেই নাকি একটু একটু করে হৃৎপিণ্ডের ব্যাধি বাসা গেড়েছে ওর শরীরে।

যেদিন ওদের ঝগড়া হয়েছিল সেদিনই সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে ফেরার পথে বাসে অ্যাটাকটা হয় রতনের। ভাগ্যিস বাসে পাড়ার দু-একজন চেনা লোক ছিলেন। তারাই ওকে নার্সিং হোমে ভর্তি করান আর বাড়িতে খবর দেন।

না, রতনকে সুস্থ করে নিয়ে তবেই একেবারে বাড়ি ফিরবে নীলিমা। নইলে কি বা আছে ওর বাড়ি ফেরার। সারাদিন রান্না বান্না সে তো রতনের কথা ভেবেই, পুজো আচচা সেও ওরই মঙ্গল কামনায়, বাড়ি গুছিয়ে রাখা সেও তারই জন্য। আগোছালো ঘর যে মোটে পছন্দ না মানুষটার। নীলিমার জীবনের প্রতি পরতেই তো রতন। রাগ করলেও রতন, অভিমান করলেও রতন, ঝগড়া করলেও রতন, কিছু প্রত্যাশা করলেও রতন। নীলিমার অস্তিত্বের মধ্যেই তো মিশে আছে মানুষটা। না এই উপলব্ধিটা আগে কোনোদিন এভাবে হয়নি নীলিমার। আসলে ও সব সময়ই জানত যে, রতন তো আছেই। রতনকে হারিয়ে ফেলার ভয় তো কোনোদিন এর আগে পেতে হয়নি নীলিমাকে। আজ প্রথমবার ওকে হারিয়ে ফেলার কথা ভাবতে গিয়েই আঁতকে উঠছে ও। আরও বেশি করে বুঝতে পারছে রতন ওর জীবনের কতখানি বা বলা ভালো ওর জীবনের সবটুকু জুড়েই তো রতন। আজ শুধু একটাই প্রার্থনা প্রতি নিয়ত করে চলেছে নীলিমা ভগবানের কাছে—

—'হে ঈশ্বর, শুধু মানুষটাকে ভালো করে ফিরিয়ে দাও আমার কাছে। বাড়ি, টাকা পয়সা কোনোদিন আর কিচ্ছু চাইব না আমি। শুধু মানুষটাকে পাশে নিয়ে আজীবন চলতে চাই।'

—'রতন হালদারের বাড়ি থেকে কে আছেন?' নার্স ডাকল গম্ভীর গলায়।

www.banglabookspdf.com

—'আমি... আমি ওর মেজ শালা। আমায় বলুন...।' মেজদা এগিয়ে গেল নার্সের ডাকে। পাশেই ভিতু ভিতু চোখে দাঁড়িয়ে আছে বুবান।

—'উই আর ভেরি সরি। মিস্টার হালদার ইজ নো মোর।'

নীলিমার সারা শরীরটা কেঁপে উঠল এবার। মানে হল কানের ভিতর কেউ ঢেলে দিল যেন এক টিন গরম গলন্ত সীসা। মুহূর্তের মধ্যেই যেন বুকের ভিতরটা খালি।

না কান্না পাচ্ছে না নীলিমার। সব চোখের জল যেন শুষে নিয়েছে কোনো অদৃশ্য দানব।

রতন আর নেই! রতন ওকে ছেড়ে চলে গেছে! না এটা তো হতেই পারে না। এবার আর তাহলে নীলিমা বেঁচে থাকবে কী জন্য? আর তো কোনো কাজ নেই ওর। কার মঙ্গল কামনায় পুজো করবে? কার পছন্দ ভেবে সব্জি কিনবে বাজার থেকে? কার জন্য রান্না করবে? যে কোনো অসুবিধাতেই কাকে মুখ ঝামটা দেবে? কেই বা সন্ধ্যাবেলা নীলিমাকে ডিমের চপ এনে দেবে? কে নীলিমার সব অভিযোগ শুনবে? কার সাথে আর ঝগড়া করবে নীলিমা।

রতন ছাড়া যে নীলিমার পুরো অস্তিত্বটাই নড়বড়ে। বুকের কাছে অসহ্য একটা যন্ত্রণা হচ্ছে নীলিমার। ও কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না।

—'নাআআ'... গগনভেদী একটা তীব্র চিৎকার বেরিয়ে এল নীলিমার গলা চিরে।

—'মা... মা... কী হয়েছে তোমার...' বুবান ঝুঁকে পড়েছে নীলিমার ওপর।

ধড়মড় করে চোখ খুলল নীলিমা। নার্সিং হোমে টানা দেড় দিন ধরে বসে থাকতে থাকতে এমনটাই হচ্ছে থেকে থেকে। মাঝেই মাঝেই চোখে বুজে আসছে হালকা তন্দ্রায়। আর অমনি চোখের পাতায় এসে ভিড় করছে একরাশ দুঃস্বপ্ন।

—'রতন হালদারের বাড়ি থেকে কে আছেন?' চমকে উঠল নীলিমা। নার্স এসে খুঁজছে রতনের বাড়ির কাউকে। ঠিক একটু আগেই দেখা দুঃস্বপ্নটার মতো। তবে কি এবার... তবে কি এবার স্বপ্নের বাকিটাও...

আতঙ্কে ঠোঁট কামড়ে ধরল নীলিমা।

—'আমি আছি। আমি মেজ শালা ওর।' মেজদা এগিয়ে গেল। সাথে বুবান ও। হুবহু সব মিলে যাচ্ছে স্বপ্নটার সাথে।

—'ওকে। আচ্ছা মি. হালদারের জ্ঞান এসেছে। আগের থেকে বেটার হয়েছে কন্ডিশন। আপনারা একে একে যান। তবে বেশি কথা বলাবেন না পেশেন্টকে।' নিজের পেশাদারী চালে বলল নার্সটা।

উফফ! বুক ঠেলে স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল নীলিমার।

—'বাই দা ওয়ে, নীলিমা কে আছেন? ওয়াইফ কি?' নার্সের দৃষ্টি নীলিমার দিকেই।

—'হ্যাঁ আমি। কেন?' ভীতু কণ্ঠে বলল নীলিমা।

—'উনি নীলিমাকেই খুঁজছেন। মাঝেও ঘোরের মধ্যে ওই নামই নিচ্ছিলেন। তাহলে আপনিই প্রথমে যান ম্যাডাম।'

www.banglabookspdf.com

একছুটে প্রায় কাঁচের দরজা ঘেরা ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল নীলিমা। রতন শুয়ে আছে। শরীরে হাজারটা নল আর ছুঁচ আর মেশিনের সমারোহ।

—'এবার থেকে আমার সব কথা শুনে চলবে বুঝলে। তেলে ভাজা, পাঁঠার মাংস সব বন্ধ তোমার। আমি যেমন যেমন বলব তেমনটাই খাবে শুধু।' কথা বলতে বলতে হাউহাউ করে বাচচা মেয়ের মতো কাঁদছে নীলিমা।

রতন একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে নীলিমার দিকে দুর্বল দুটো চোখ নিয়ে। ঠিক যেমনটা করে তাকিয়েছিল শুভদৃষ্টির সময়। নীলিমার দু-চোখ উপচানো ভালোবাসা। শুধু রতনের জন্য। কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল এতদিন এই ভালোবাসার সমুদ্রকে মেয়েটা? নিজের বুকের মধ্যে নাকি সংসার আর তার প্রতিটা কোণাতেই লুকিয়ে রেখেছিল শুধু রতনই বুঝতে পারেনি। কারণ রতন ভাবত ভালোবাসা মানে শুধু সেই একই গতানুগতিক কনসেপ্ট। ভালোবাসা তো স্থবির নয়। ভালোবাসা তো সজীব। তাই তার রূপ রং সব আলাদা আলাদা প্রতিটা ক্ষেত্রে।

—'খুব চালাকি করে আমায় ছেড়ে চলে যাবে ভেবেছিলে না সব দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে? একবারও ভাবলে না তোমাকে ছাড়া কতটা অসহায় আমি। অবশ্য সে তুমি কবেই বা ভেবেছ আমার কথা।' কেঁদেই যাচ্ছে নীলিমা।

শরীরের হাজার কষ্ট সত্ত্বেও এক পরম তৃপ্তি টের পাচ্ছে রতন, যেটা বলে বোঝাতে পারবে না ও।

—'নীলু...' অস্ফুটে ডাকল রতন। ছোট্ট করে। বিয়ের পর থেকে কতবার ভেবেছে রতন এই নামে ডাকবে ওকে। কিন্তু ডাকা আর হয়নি। ডাকতে গিয়েও কেন যেন বিদ্রোহ করেছে স্বর বার বার। মনে হয়েছে হয়তো রতনের মুখে এসব আদিখ্যেতায় বিরক্ত হবে ও।

—'কোনো কথা নয়। একদম চুপ করে থাকবে। ডাক্তার বলেছেন একদম চুপ থাকতে তোমায়। আবার একটা বিপদ বাধিয়ে আমায় মেরে ফেলবে তাই তো?'

—'না নিলু না। আর যে যমের আমায় ছোঁয়ার সাধ্য নেই। তোমার ভালোবাসার শেকল ছিঁড়ে আর যে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না আমায়। আর আমিও যে এবার বাঁচতে চাই। অনেকদিন। তোমার চোখের ওই ভালোবাসাটা দেখার জন্যই বাঁচতে চাই।'

না রতন বলতে পারল না কথাগুলো। সব কথা যে বলতে নেই। কিছু কথা চোখের ভাষাকে আশ্রয় করেই খুঁজে নেয় নিজের গন্তব্য।

শুধু একদৃষ্টে রতন তাকিয়ে রয়েছে নীলিমার দিকে। চোখে টলটল করছে জল। আর নীলিমার দু-চোখে বাঁধ ভাঙা শ্রাবণ।

—'কি হল শুধু চোখে চোখে প্রেম করে তুমি একাই দখল করে রাখবে বাবাকে? আমায় একটু কথা বলতে দেবে না?' বুবান এসে দাঁড়িয়েছে কখন যেন। চোখে জল ছেলেটার। তবুও লঘু ইয়ার্কি করে সহজ করতে চাইছে বিধ্বস্ত মা-কে। দেড় দিনেই যেন দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে ছেলেটার।

—'হ্যাঁ রে বাবা। তুই থাক। আমি চলি।' কথাটা বুবানকে বললেও দৃষ্টি রতনের দিকেই নীলিমার।

www.banglabookspdf.com

রতনের চোখ পরতে পারছে নীলিমা। ওই চোখে সম্মতি নেই। রতনের চোখ চাইছে নীলিমা এখন থাকুক ওর সামনে।

—'আমি আছি তো ঠিক বাইরেটাতেই। একটু পরেই আসছি আবার।' চোখে একরাশ আশ্বাস নিয়ে বলল নীলিমা রতনকে।

কাঁচের দরজা ঠেলে ক্লান্ত পায়ে বেরিয়ে এল নীলিমা। নার্সিং হোমের লবি ছেড়ে এসে দাঁড়াল বাইরের চত্বরটায়। বসন্তের ফুরফুরে বাতাস বইছে চারদিকে। হ্যাঁ বসন্ত তো এসেই গেল আবার।

হঠাৎ চোখে পড়ল হাতে রাংতা জড়ানো একটা গিফটের প্যাকেট নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে একটা মেয়ে। সুন্দর সাজগোজ করা।

হ্যাঁ তাই তো। আজই তো সেই দিন। ভ্যালেন্টাইন ডে। কোনোদিন এই দিনটার তাৎপর্য নিয়ে ভাবেনি নীলিমা। কিন্তু আজ যেন নতুন করে বুঝতে পারছে, হ্যাঁ আজ সত্যি ভালোবাসার দিনই বটে। আজই তো যেন নতুন করে খুঁজে পেল ও নিজের ভালোবাসাকে, নতুন করে চিনল আবার।

সব ভালোবাসার প্রকাশ সত্যি এক রকম হয় না। এক একটা ভালোবাসা যে এক এক রকম। কিছু ভালোবাসা থাকে যেগুলোকে আলাদা করে দেখা যায় না। কারণ সেগুলো নিজের মধ্যেই মিশে থাকে। মিশে থাকে নিজের অস্তিত্বের মাঝে, জীবনের প্রতিটি কোণায় আর গৃহকোণের প্রতিটি পরতে পরতে। খুব কাছে থাকা জিনিস যেমন অনেক সময় চোখ এড়িয়ে যায়, তেমনই একদম পাশে থাকা ভালোবাসাকেও হয়তো অনেক সময় আলাদা করে নজরে পড়ে না। কিন্তু নীলিমা এবার দেখতে পেয়েছে। আর কোনো সংশয় নেই ওর। ভালোভাবে চিনতে পেরেছে নিজের মনকে আর নিজের ঘরের মানুষটাকেও। ওর মতো সুখী আর কে আছে! নিজের ঘরের মানুষটাই যে ওর সত্যিকারের মনের মানুষ, প্রাণের মানুষ।

—

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

সেদিন দুপুরে...

১

আগামী সপ্তাহের প্রেজেন্টেশনের কনটেন্টটা রেডি করতে করতে কাজের মধ্যে একদম ডুবে গেছিল সাঁঝ। গত দু-দিন ধরে চলছে কাজ। অনেক রিসার্চ টিসার্চ করে শেষ অবধি উদ্ধার হল কাজটা। এবার সবটা ম্যানেজার শর্বাণীদি-কে সাবমিট করলেই এই গেড়োটা শেষ। কব্জি উল্টে একবার ঘড়ি দেখল সাঁঝ। এখন সাড়ে তিনটে। একটা হালকা আড়মোড়া ভেঙে একটু নড়ে চড়ে বসল আবার ও। একবার উঁকি দিল চারপাশের কিউবিকলগুলোতে। অনিক, শুভেন্দু, রমলা, বিপাশা সবাই যে যার নিজের গলতায় অলস মেজাজে রোজকার মতোই। কেউ কানে হেডফোন গুঁজে অলস চালে কি-বোর্ড চাপছে, কেউবা আবার আনমনা ছন্দে মাউস নাড়াচ্ছে, আবার কেউ ঢুলুঢুলু চোখে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। রোজকার প্রায় একই ছবি। মাথা উঁচিয়ে থাকা বড়ো বড়ো বিল্ডিং-এ ঠাসাঠাসি এই অফিস পাড়াটার বাইরে বিছিয়ে থাকা হেমন্তের অলস দুপুরটা যেন ঘষা কাচের জানালা ভেদ করে ঢুকে পড়েছে অফিসের মধ্যেও। শুধু কাবু করতে পারেনি সাঁঝকে। এই সময়টায় মানে বিশেষ করে মিঠে রোদ্দুর মাখা হেমন্তের এই দুপুরগুলোতে আরও বেশি করে যেন নিজেকে কাজে ডুবিয়ে রাখতে চায় ও। অফিস না থাকলেও জোর করে দু-চোখ বুজে কাঠ হয়ে পড়ে থাকে বিছানায়। নিজেকে ভাসিয়ে দিতে চায় গভীর ঘুমের অচিনপুরে। কারণ জেগে থাকলেও যে এমন অনেক হেমন্ত দুপুরের স্মৃতির গন্ধগুলো অবশ করে দেয় ওর সারা শরীর। কষ্ট দলা পাকিয়ে ওঠে গলার কাছে। গত তেরো বছর ধরে যে এমনটাই হয়ে আসছে।

হঠাৎ ফোন ভাইব্রেট হবার ঘ্যার ঘ্যার শব্দে একটু চমকালো সাঁঝ।

—'হ্যালো...' ফোন কানে চাপল ও।

—'সাঁঝ কাল তো শনিবার। তার মানে কাল তো তোর অফিস ছুটি। কাল তোকে তুলে নেব দুপুরের দিকটায় বুঝলি। প্লিজ রেডি থাকিস। কাল একটু নন্দন যাব আমরা। ঠিক আছে?' নিজের স্বভাব সিদ্ধ খলখলে চালেই কথাগুলো বলে গেল শিমূল।

এই নভেম্বরের মাঝামাঝি, ভরা হেমন্তের দুপুরে নন্দন! বুকটা আবার একবার মুচড়ে উঠল সাঁঝবাতির।

—'নারে প্লিজ আমায় ছেড়ে দে। আমার হবে না রে কাল। আমি অন্য দিন না হয়...'

—'অন্য দিন মানে? তুই কি ভুলে গেছিস কালই ১৭ নভেম্বর। কালই নন্দনে দেখানো হবে শুভ্রর শর্ট ফিলমটা। আর তুই বলছিস যে তুই যাবি না? এটা বলতে পারলি তুই? আমি তো কবে থেকে

www.banglabookspdf.com

বলে রেখেছিলাম তোকে। সবাইকে বলেছি আমি যে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আসবে কাল। আর তুই এখন...' এবার গলা ভিজে এল শিমূলের।

—'শোন শিমূল, প্লিজ একবার বোঝার চেষ্টা কর...' কথা শেষ হল না সাঁঝের। তার আগেই কেটে গেল লাইন। উফফ! এই শিমূলটা বড্ড ছেলেমানুষ এখনও। অল্পেই অভিমান আর ঠোঁট ফোলানোর স্বভাবটা সেই স্কুল লাইফ থেকে রয়েই গেল ওর।

কিন্তু সাঁঝই বা কি করে বোঝাবে! আজ এই তেত্রিশ বছর বয়সে পৌঁছেও ও যে আটকে রয়েছে সেই কুড়িতেই। আজও যে এই হেমন্তের দুপুরগুলো বড্ড বেশি কষ্ট দেয় ওকে। আজও যে ও ভুলতে পারেনি তেরো বছর আগের ঠিক এমনই অনেক দুপুর, অনেক কথা, স্বপ্ন, ভালোলাগা আর সেই মুখটা। আজও যে প্রতিমুহূর্তে ওকে তাড়া করে অনেক বছর আগের এমনই নভেম্বরের হালকা শীত আর কাঁচা মিঠে রোদ মাখা একটা দুপুর।

সেই দিনটা আজও চোখ বুজলেই একদম ছবির মতো স্পষ্ট দেখতে পায় সাঁঝ। নভেম্বর মাস। কলেজে ইলেকশন। প্রতি বছরের মতোই উত্তেজনা তুঙ্গে। হাওয়া গরম। ভোট গোনা চলছে। নীল দল আর হলুদ দল একদম নেক টু নেক ডিফারেন্সে রয়েছে। সাঁঝ নীল দলের চরম সাপোর্টার। ঠিক সক্রিয় রাজনীতি না করলেও কলেজের সবারই জানা যে সাঁঝ নীল দলের একজন। সেদিন সেই ভোট গোনার সময় হঠাৎ কি একটা ইস্যু নিয়ে যেন হঠাৎ বচসা লেগে গেল নীল আর হলুদ দলের। নিমেষে বচসা রূপ নিল হাতাহাতির আর তারপর মারামারির। হঠাৎই তীব্র মারমুখী হয়ে উঠেছে দুই দলেরই ছেলে-মেয়েরা। যে যাকে পারছে পিটাচ্ছে। আর সাঁঝের এমন কপাল খারাপ যে ঠিক সেই সময়টাতেই ও পড়ে গেল দুই দলের লড়াইয়ের মাঝখানে। হঠাৎ সাঁঝ লক্ষ্য করল হলুদ দলের কট্টর সমর্থক রিপন মানে ওই গুন্ডা টাইপের ছেলেটা রে রে করে একটা লোহার রড নিয়ে তেড়ে আসছে ওর দিকেই। ভয়ে পা দুটো অবশ হয়ে গেছে বলে মনে হয়েছিল সাঁঝের। চারদিকের মারামারির ভিড় ঠেলে পালাতে পারল না ও। আঘাতটা নেবার জন্য যখন তৈরি হচ্ছিল সাঁঝ তখনই হুট করে যেন কি একটা হয়ে গেল ও কিছু বুঝে ওঠার আগেই। হঠাৎ একটা হ্যাঁচকা টান আর নাকের ওপর এসে ঝাপটা মারা একমুঠো মাস্কের গন্ধ। আর চোখ মেলতেই ও বুঝল ও আছড়ে পড়েছে আকাশি পাঞ্জাবি পরা একটা ছেলের বুকের ওপর। ফর্সা গালের হালকা দাড়ি, আর রিমলেস চশমার আড়ালে জেগে থাকা ভাসা ভাসা নীলচে ওই চোখদুটো তো ভীষণ চেনা ওর। এটা তো মল্লার। ওদের ডিপার্টমেন্টের সেরা ছেলে। যাকে সব স্যার, ম্যাডামরা দারুন ভালোবাসে আর যার জন্য গোটা কলেজের প্রায় আশি ভাগ মেয়েই পাগল। কিন্তু ছেলেটা খুব চুপচাপ আর গম্ভীর ধরনের। বা বলা ভালো অহংকারী। কারোর সাথেই বেশি কথা বলে না। নিজের পড়াশোনা নিয়েই থাকে। মেয়ে তো দূরের কথা, ছেলে বন্ধুই নেই বেশি ওর। কিন্তু এই মল্লার সাঁঝকে কেন বাঁচাল রিপনের রডের আঘাত থেকে? বুঝতে পারছিল না সাঁঝ। মাত্র কয়েকটা মুহূর্তই বোধ হয় মল্লার এর বুকের ওপর ছিল ও। কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন ওর সমস্ত পৃথিবীটা থেমে গেছে ওই কয়েকটা মুহূর্তেই। ভালো লাগায় কেমন যেন পাগল হয়ে

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

যাচ্ছিল ও। আসলে কলেজের অনেক মেয়ের মতোই সাঁঝও যে নিজের সবটুকু সবার অজান্তেই দিয়ে বসে আছে মল্লারকে।

—'বাড়ি যা তাড়াতাড়ি। অবস্থা ভালো নয়।' এটাই ছিল মল্লারের প্রথম কথা সাঁঝের জন্য। এই প্রথম মল্লার কথা বলল ওর সাথে। কলেজের অনেক সাধারণ মেয়ের মতোই সাঁঝ খুব সাধারণ একটা মেয়ে। আর যে মল্লার কলেজে প্রায় কারোর সাথেই কথা বলে না সে কেনই বা কথা বলবে ওর মতো একটা অতি সাধারণ মেয়ের সাথে! কিন্তু তবুও সেদিন সেটাই ঘটেছিল। সবটাই কেমন যেন স্বপ্ন স্বপ্ন লাগছিল ওর। বাড়ি ফিরেও বারবার মনে পড়ছিল মল্লারের বুকে আছড়ে পড়ার মুহূর্তটা। আর সাঁঝ বুঝতে পারছিল মল্লার ছাড়া এ জীবনে আর অন্য কোনো পুরুষের দিকে তাকাতেই পারবে না ও।

কমবয়সে মনটা সত্যি বড়ো বেয়াড়া থাকে। সাঁঝেরও সেদিন তাই ছিল। তাই ভালো লাগায় পাগল হয়ে যাওয়া মেয়েটা বেশ একটা বেয়াড়া স্টেপ নিয়েছিল দু-দিনের মধ্যেই। টিফিনের খরচ বাঁচিয়ে গিফট শপ থেকে একটা 'থ্যাঙ্ক ইউ' কার্ড আর চকলেট কিনে সোজা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল মল্লারের সামনে।

—'জানি তুই হয়তো ভালোভাবে নিবি না, কিন্তু তবুও তোর জন্য এটা কিনেছি। না সেদিন আমায় বাঁচানোর জন্য থ্যাঙ্কস দিয়ে তোকে ছোটো করতে আমি চাই না এটা ঠিক, কিন্তু কৃতজ্ঞতা জানানোর অধিকার তো আমার নিশ্চয় আছে।' প্রায় এক নিঃশ্বাসেই কথাগুলো বলে ফেলেছিল সেদিন মেয়েটা। আর কথাগুলো বলার সময় নভেম্বরের হিমেল আবহাওয়াতেও ওর মাথায় ফুটে উঠেছিল কয়েক ফোঁটা ঘাম।

মল্লার ওর কথাগুলো শুনে অল্প ভ্রূ কুঁচকে রিমলেস চশমার আড়াল থেকে নীলচে চোখ দুটো মেলে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়েছিল ওর দিকে। তারপর হাত বাড়িয়ে জিনিসগুলো নিয়ে বলেছিল— 'সব সময় দলবাজি আর দিদিগিরি না করে পড়াশুনাতেও তো একটু মন দেওয়া যায়। পার্ট ওয়ান পরীক্ষার তো আর বেশি বাকি নেই।'

—'পড়া আমার অত মাথায় ঢোকে না। আমি সব বুঝতেও পারি না।' একটু আদুরী চালেই কথাগুলো বলেছিল সেদিন সাঁঝ। কেন কে জানে ওর মনে হচ্ছিল মল্লারও ওর সাথে কথা বলতে চাইছে।

—'পড়া বুঝতে অসুবিধা হলে স্যারদের তো বলাই যায়। আর স্যারদের বলতে না চাইলে ক্লাসের যে ছেলেপুলেগুলো মোটামুটি পড়া বোঝে তাদেরও তো বলা যায়।' মল্লার এর শেষ কথাটায় ঠিক কি ইঙ্গিত ছিল সেটা বুঝতে না পারার মতো বোকা সাঁঝ কখনোই ছিল না। কিন্তু নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না ও। ঠিক শুনছে তো ও? মল্লার এসব কথা ওকে বলছে! তবুও নিজের বেড়ে যাওয়া সাহসটাকে সম্বল করে বলেই ফেলেছিল—

—'ক্লাসের কোন ভালো ছেলে মেয়েটা আমায় সময় দেবে বল। তুই-ই কি দিতে পারবি?'

www.banglabookspdf.com

—'পারব না বলে তো মনে হয় না।' গম্ভীর গলায় বলেছিল মল্লার। এর পর থেকেই বন্ধুত্ব শুরু ওদের। সবাই তখন ভীষণ ঈর্ষার চোখে দেখত সাঁঝকে। এমনকী ওর বান্ধবীরাও। যে মল্লার কিনা কাউকেই পাত্তা দেয় না সে কিনা হঠাৎ সাঁঝের মতো একটা অতি সাধারণ মেয়ের এত ভালো বন্ধু হয়ে গেল! বন্ধুত্ব বাড়ার সাথে সাথে ও বুঝতে পারছিল মল্লার এর ওই শক্ত আবরণটার আড়ালে একদম আলাদা একটা মানুষ আছে। যে ভীষণ ভালো, যে চায় নিজের সাধ্যমতো সব সময় সবার দিকে নিজের সাহায্যের হাতটা বাড়িতে দিতে। যে সবাইকে নিয়ে বাঁচতে চায়, যে একদম অন্যরকম একটা মানুষ। সাঁঝের তখন জীবনটাকে স্বপ্নের মতো লাগত। রোজ ক্লাস শেষে দুপুরগুলোতে মল্লার এর সাথে কফি হাউসে সময় কাটান আর নিজের কবিতা শোনানো। হ্যাঁ সাঁঝ তখন গল্প আর কবিতা লিখত, যার একমাত্র পাঠক শ্রোতা ছিল মল্লার। সাঁঝের সব টুকু চুরি করে নিয়েছিল মল্লার। কেন যেন ওর মনে হচ্ছিল মল্লারও পছন্দ করতে শুরু করেছে সাঁঝকে। এভাবেই কাটছিল দিনগুলো। কেটে গেছিল প্রায় গোটা একটা বছর।

সেটাও ছিল নভেম্বর মাস।

—'মল্লার রোজ তো আমরা ক্লাস শেষে কফি হাউসে যাই। আজ নন্দনে যাবি রে?' কি একটা খেয়ালে যেন সেদিন বলে ফেলেছিল সাঁঝ। মল্লারের আপত্তি ছিল না। তাই সেদিন ওরা পৌঁছে গেছিল নন্দন। পাশাপাশি হাঁটছিল ওরা। আর হাঁটার সময় মল্লার এর হাত ছুঁয়ে যাচ্ছিল ওর আঙুলগুলো। হেমন্তের হিমেল দুপুর, সোনালী রোদ আর মাস্কের গন্ধ সব মিলিয়ে ভালো লাগায় দমটা কেমন যেন বন্ধ হয়ে আসছিল সাঁঝের।

—'মল্লার আমি না... আমি না তেকে বড্ড ভালোবাসি রে। তুই বল ভালোবাসবি আমায়? ধরে থাকবি তো আমার হাত?' মল্লারের হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে বলে ফেলেছিল সাঁঝ।

পলকে মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছিল মল্লারের। সাঁঝের থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে হনহন করে বেরিয়ে গেছিল নন্দন চত্বর থেকে। আর বোকার মতো চোখে জল নিয়ে একলা দাঁড়িয়ে ছিল সাঁঝ। কিছু বুঝতে পারছিল না। না, এই ঘটনার পর থেকে আর কোনোদিন একটাও কথা বলেনি মল্লার সাঁঝের সাথে। সাঁঝও আর চেষ্টা করেনি।— আচমকা অপমানে আর তাচ্ছিল্যে কুঁকড়ে গেছিল ও। যে কয়েকটা মাস বাকি ছিল কলেজ শেষ হবার, সেই কটা মাস সম্পূর্ণ আগন্তুক হয়ে হয়ে মল্লার সামনে আসত সাঁঝের জন্য, আর সাঁঝ মল্লারের জন্য। তারপর আর কোনোদিন দেখা হয়নি ওদের। বিগত তেরো বছরে কোনোদিন সাঁঝ আর কোনো খবর পায়নি মল্লারের। শুধু সাঁঝ কেন, ওদের ব্যাচ এর কেউই পায়নি। হারিয়ে গেছে মল্লার। শুধু হারায়নি সাঁঝের স্মৃতিগুলো। আজও ওরা বারবার ফিরে আসে সাঁঝকে রক্তাক্ত করতে, ক্ষতবিক্ষত করতে।

২

সব ষড়যন্ত্র! বারাবর শুধু সাঁঝের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে ওই ওপরে থাকা 'ভগবান' নামের লোকটা। যেমন আজ আবার করল। আজ শিমূলের অনুরোধটা ফাইনালি ফেলতে পারেনি সাঁঝ। চলেই এসেছে নন্দনে। শর্ট ফিলম দেখার জন্য। আসলে শিমূলের বর শুভ্র পেশায় ইঞ্জিনিয়ার হলেও খুব সিনেমা

www.banglabookspdf.com

পাগল। তাই ওরা কয়েকজন বন্ধু মিলে কিছুদিন আগে বানিয়ে ফেলেছিল একটা শর্ট ফিলম। এখন নন্দনে যে কলকাতা শর্ট ফিলম ফেস্টিভ্যালটা চলছে সেখানেই দেখানোর জন্য সিলেক্টেড হয়েছে শুভ্রর শর্ট ফিলমটা। কয়েকদিন ব্যাপি চলবে এই শর্ট ফিলম উৎসব আর আঁতেল বোদ্ধাদের ভিড় এই নন্দনে। প্রতিদিন দেখানো হবে ৫টা করে শর্ট ফিলম। আজও তাই যথারীতি। শুভ্রদের ছবিটা দ্বিতীয় নম্বরে দেখান হল। তার পরেও বাকি ছিল তিনটে। সাঁঝও সবার সাথে বসে দেখছিল বাকি ছবিগুলো। কিন্তু হঠাৎ এসব কি হয়ে গেল। কিছুই যে মাথায় ঢুকছে না সাঁঝের। শেষ ছবিটা! কী ছিল ওটা? ছবির নাম 'ছেঁড়া মেঘ'। একটা অনাথ মেয়ের গল্প। একটা কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ের গল্প। সে হঠাৎ জানতে পারে যে তাকে মানুষ করা বাবা মা তার নিজের বাবা মা নয়। তখন বিপর্যয় নেমে আসে তার জীবনে। তাকে ছেড়ে চলে যায় তার প্রেমিক, বন্ধু সবাই। প্রশ্ন ওঠে তার জাত নিয়েও। একরাশ ছাই চাপা কষ্ট বুকে নিয়ে সব ছেড়ে চলে যায় মেয়েটা। হারিয়ে যায় অচেনা ঠিকানায় ঠিক একটুকরো ছেঁড়া মেঘের মতোই। কিন্তু এই গল্পটা তো সাঁঝের ভীষণ চেনা। এটা তো সাঁঝেরই লেখা গল্প। যেটা শুধু ও শুনিয়েছিল মল্লারকে, ওদের সম্পর্কটা শেষ হয়ে যাবার ঠিক দু-তিনদিন আগে কফি হাউসে বসে। কিন্তু সেই গল্পটা কীভাবে এখানে...? সব চেয়ে অদ্ভুত কথা হল সিনেমার শুরুতে গল্পকার হিসাবে যে নাম দেখেছে সাঁঝ সেটাও ভারি আশ্চর্য। নাম সন্ধ্যাতারা। অনেকটাই সাঁঝের নামের সাথে মিল। ছবির পরিচালকের নাম সমুদ্রনীল। কে এই সমুদ্রনীল? সে কে সাঁঝের চেনা কেউ নাকি? ছবি দেখানো শেষ। এবার একে একে পাঁচ ছবির পরিচালক কিছু বক্তব্য রাখছেন। এই সবে চতুর্থ জনের বক্তব্য শেষ হল। পঞ্চম জনের পালা এবার। ঢিপ ঢিপ করছে সাঁঝের বুকের ভিতর। কাকে দেখতে চলেছে এবার ও?

—'নমস্কার। আমি ''ছেঁড়া মেঘ'' এর পরিচালক সমুদ্রনীল।' চোখ বন্ধ করেছিল সাঁঝ। এবার ও চোখ মেলল আস্তে আস্তে। না, এ তো সে নয়। তাহলে?

—'এই ছবিটা আমার প্রথম প্রয়াস। তবে এই ছবির গল্প আমার নয়। যার গল্প তাকে আমি চিনি না। এই গল্প আমি শুনেছি আমার দাদার কাছে। আমার দাদা মল্লার বসু। যে আমার সবচেয়ে বড়ো প্রেরনা। যে সব সময় আমায় উৎসাহ দিয়ে গেছে আমার সব কাজের জন্য। আর আমার দাদার জীবনে ভালোবাসার ঢেউ বয়ে নিয়ে আসা মানুষটার সৃষ্টি 'ছেঁড়া মেঘ'। তাই আজ এই গল্পটা নিয়ে ছবি করে আমি আমার দাদাকেই সম্মান জানাতে চেয়েছি। আসলে দাদা আজ আর আমার সাথে নেই...' অনেকটা দূরে চলে গেছেন।

চমকে উঠল সাঁঝ। এসব কি বলছে ছেলেটা? মল্লার আর নেই? মানে? আরও অনেক কথা বলছিল সমুদ্রনীল। কিচ্ছু শুনতে পেল না আর সাঁঝ। একচাপ কালো অন্ধকার আর এক সাগর নোনা জল আঁকড়ে ধরল ওকে।

* * *

উত্তর কলকাতার বনেদি পরিবারের মেজ বউ মৃণালিনী লাহা মা হতে পারেননি নিজের শারীরিক অক্ষমতার জন্যই। তাই বাড়ির সবাই বন্ধ্যা বলে ব্রাত্য করেছিল তাকে। কিন্তু তাতেও মরেনি

www.banglabookspdf.com

মৃণালিনীর মায়ের মনটা, মাতৃসত্তাটা। তাই যখন তার কোলে এলো পাঁচ মাসের বাপ মা মরা অনাথ শিশুটা তাকে তখন নিজ সন্তান স্নেহেই আপন করে নিয়েছিলেন মৃণালিনী। কিন্তু এই ব্যাপারটা পরিবারের কেউই ভালোভাবে মানেননি। এমনকী মৃণালিনীর স্বামীও না। তাই যৌথ পরিবারে বড়ো হলেও ছেলেটা কোনোদিন ভালোবাসা পায়নি সেভাবে। বরং অবহেলা আর তাচ্ছিল্যই পেয়ে এসেছে। শুধু মা আর খুড়তুতো দুই ভাই বোন (দত্তক সূত্রে পাওয়া) ছাড়া কেউই আপন ভাবেনি কখনো ছেলেটাকে। আর তার উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর যখন মারা গেল মৃণালিনী, তখন নিজেকে আরও বেশি গুটিয়ে ফেলেছিল ছেলেটা। শুধু পড়াশুনায় ডুবে থাকত। আর সব সময় সংকুচিত থাকত সবার মাঝে। আর সেই দুঃখী চুপচাপ ছেলেটাকেই ওর কলেজে অহংকারী ভাবত সবাই। কিন্তু সেই ছেলেটাও ভালোবেসেছিল একটা মেয়েকে। খুব ভালোবেসেছিল তাকে কোনো কারণ ছাড়াই। স্বপ্ন দেখত তাকে নিয়ে। কিন্তু একটা গল্প! সেই মেয়েটার লেখা একটা গল্পই হঠাৎ এলোমেলো করে দেয় ছেলেটার সব। একটা কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ের গল্প লিখেছিল সেই ছেলেটার ভালোবাসার মেয়েটা। যেখানে তার প্রেমিক তাকে ছেড়ে দেয় সমাজ, সংসার আর পরিবারের ভয়ে। খুব অপরিণত লেখা হয়তো ছিল সেটা, তবুও ওই ছেলেটার দোমড়ানো যুবক মনে বড্ড নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল গল্পটা। কী বুঝেছিল সে কে জানে! নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল মেয়েটার থেকে চিরতরে। আর কোনোদিন সামনে আসেনি তার। আজ সেই ছেলেটা চলে গেছে চেনা শহর আর চেনা বাড়ি আর চেনা গন্ডি ছেড়ে। সে আর থাকে না পুরোনো ঠিকানায়। নিজেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়েছে পুরোনো চেনা মানুষগুলোর থেকে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন অধ্যাপনা করে সে। একাই থাকে নিজের মতো। বিশেষ সম্পর্ক রাখে না কারোর সাথেই পুরোনো দিনের। যেন স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছে সে।

banglabookspdf.com

সেদিন শর্ট ফিলম উৎসব শেষে সরাসরি সমুদ্রনীলের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল সাঁঝ। মল্লার এর সবটা শোনার পর চোখের জল আর বাঁধ মানছিল না ওর।

—'কি রে মা, চল এবার। তৈরি হবি না? ম্যারেজ রেজিস্টার এসে যাবে যে।' মায়ের ডাকে চমক ভাঙল সাঁঝের। একা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে অঘ্রাণের দুপুরটার বাতাসটা গায়ে মেখে নিচ্ছিল ও। ফুসফুসে ভরে নিচ্ছিল হেমন্তের দুপুরের সুঘ্রাণ।

—'হ্যাঁ মা আসছি।' ঘরে এসে নিজের লাল শাড়িটা দু-হাতে মুঠো করে আলতো চুমু খেল ও। হ্যাঁ এই লাল রং আর মল্লার আজকের পর থেকে শুধুই যে ওর। সমুদ্রের থেকে সবটা শোনার পর ও নিজে গেছিল নর্থ বেঙ্গল। নিজের মানুষটাকে নিজেকেই যে খুঁজে নিতে হয়, নিজেকেই যে মিটিয়ে নিতে হয় সব দূরত্ব আর অভিমান।

লাল শাড়ি আর গয়নায় সেজে বাইরের ঘরে বেরিয়ে এলো সাঁঝ। ম্যারেজ রেজিস্টার এসে গেছেন। ওই তো সেও এসে গেছে... সেই নীল চোখ, সেই রিমলেস চশমা। সাঁঝের চোখ পড়ল তার চোখে। সাঁঝ দেখতে পাচ্ছে ওর চোখে তেরো বছর আগের সেই দুপুরটা, সেই মাস্কের গন্ধটা, সেই আকাশি পাঞ্জাবিটা, সেই পুরোনো সময়টা।

www.banglabookspdf.com

—

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

তুমি আসবে বলে...

রবির কথা

রবির ইচ্ছে করছে এই মুহূর্তে পুরো পৃথিবীটাকে দুমরে মুচরে খান খান করে দিতে। না, মানে ঠিক পুরো পৃথিবীটা নয় 'নারী' নামক প্রজাতিটাকে শেষ করে দিতে ইচ্ছে করছে ওর এই পৃথিবীর বুক থেকে।

ছোট্ট রবি, না কোনোদিন ভালোবাসার স্বাদ পায়নি সেই ছেলেটা শৈশবেও। বাবা চাকরির সুবাদে বাইরে, আর মা সবসময় কেমন যেন ছাড়া ছাড়া আর উড়ু উড়ু। —'মা, আমায় একটু আদর কর' বলে কাছে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেই কেমন যেন ছিটকে সরে যেতেন ভদ্রমহিলা।

—'বিনয় দেখতে পারছ না ছেলেটাকে' করে মা হাঁক দিতেই যেন বেশি স্বচ্ছন্দ। আর ওমনি রবি আবার বিনয় দাদার হেফাজতে বন্দি নিয়মমাফিক। ভদ্রমহিলা যেন বড়ো বেশি গম্ভীর রবির সাথে, অথচ ফোনে হেসে হেসে কথা বলতে কিন্তু তার জুড়ি মেলা ভার।

—'প্লিজ, ছাড় আমায়। না, না না। বিনয় নেই আজ, আর রবি যে কোনো টাইমে জেগে যাবে। পুরো বাপের মতো ওই ছেলে। একদম অবিনাশের ছায়া ওর মধ্যে। তাই তো ওকে সহ্য করতে পারি না আমি।'

—'না রেবা আজ ছাড়ব না তোমায়। আজ তোমার শরীরের প্রতিটা কোনা ছুঁয়ে আমি আদর করব। অনেকদিন... অনেকদিন কাছে পাইনি তোমায়। আর যে পারছি না আমি। আজ আমার সবটুকু জ্বালা মিটিয়ে দিতে হবে তোমায়। নইলে কোথাও যেতে পারবে না, কিছুতেই ছাড়ব না।'

বারো বছরের রবি সেদিন সবটা দেখতে পাচ্ছিল। না আসলে মোটেই ঘুমায়নি ও। অসীম আঙ্কেলের যাতায়াতটা মোটেই কোনোদিনই বেশি ভালো লাগত না রবির। কেমন যেন ঘোলাটে চোখে লোকটা দেখে রবিকে। একদমই রবিকে পছন্দ করে না। সেই লোকটাই বাড়িতে এসে যখন আজ রেবা মাইতির গায়ে সাংঘাতিক ঢলে পড়ছিল প্রায়, আর রেবা মাইতিও যখন নিয়মের ছন্দ ভেঙে আজ রবিকে আদর করে ঘরে শুয়ে দিয়ে গেল তখনই মনে সন্দেহ দানা বেঁধেছিল রবির। তাই কিছুটা পরে পা টিপে টিপে উঠে মায়ের বেড রুমের আইবলটায় চোখ রেখেছিল ও।

রেবা মাইতি সম্পূর্ণ নগ্ন আর অসীম মিত্তিরও। ঘোলাটে চোখের লোকটা রেবা মাইতির ঠোঁট, কপাল, গলা ছুঁয়ে চুম্বন করছে। আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দিচ্ছে রেবার উন্মুক্ত স্তনেও।

—'অসীম, আই উইল কিল ইউ...' বারো বছরের ছেলেটার আকাশ কাঁপান উন্মাদ নিনাদ আর গোটা একটা কাঁচের টেবিল উল্টে ভেঙে ফেলার সেই তীব্র অভিঘাত সেদিন উন্মুক্ত করেছিল অসীম

www.banglabookspdf.com

মিত্তির আর রেবা মাইতির সত্যিটাকে পুরো পৃথিবীর সামনে। রেবা মাইতি এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছিল চিরতরে আর মিস্টার মাইতিও বাইরে চাকরির পার্টটা চুকিয়ে ফেলেছিলেন পুরোপুরি।

কিন্তু না। রবিকে কেউ বোঝেনি। অবিনাশ মাইতি আর রেবা মাইতির ডিভোর্স এর পর হই হই করে রেবা বিয়ে করে অসীমকে। আর কোনোদিন ভুলেও সে খোঁজ নেয়নি তার ছেলের। আর অবিনাশ মাইতি? সেও ঘরে নিয়ে আসে টুকটুকে কচি বউ। আর দু-দিনের মধ্যেই তাদের মাঝে আসে নতুন এক কন্যা সন্তান। আর রবি হয়ে যায় সংসারের একটা অবান্তর বোঝা। বাড়ির এক কোণে ফেলে দেওয়া একটা বাতিল আসবাব। তখন প্রতিদিন রবির মনে হত যে মানুষগুলো নষ্ট করে দিল রবির শৈশব, কৈশোর তাদের প্রতি বদলা না নিতে পারলে ও শান্তি পাবে না। প্রতি মুহূর্তে ওর মনের মধ্যে যে দাবানলের আগুন জ্বলত সেটা কারোর পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না। আর বাইরে থেকে সবাই বলত রবি নাকি ঠিক আর পাঁচ জনের মতো স্বাভাবিক নয়। অপ্রকৃতিস্থ। রবির ইচ্ছা হত সবাইকে খুন করে দিতে। স্কুলের ওই ছেলেগুলোর গলা কুচি কুচি করে কেটে দিতে ইচ্ছে করত রবির যারা ওকে নিয়ে হাসত। স্কুলের ওই স্যার গুলোর বুকটা চিরে দিতে ইচ্ছে করত রবির যারা বলত ও ফালতু। ওর নাকি জীবনে কিছু হবে না। সবার প্রতি ঘৃণা হত রবির। কিন্তু ও কিচ্ছু করতে পারত না। ধীরে ধীরে আরও বেশি করে যেন সবার উপহাস আর ঠাট্টার পাত্র হচ্ছিল ও। আর ওর মনের মধ্যে প্রতিশোধের আগুনের লেলিহান শিখাও ততই প্রগাঢ় হচ্ছিল। এভাবেই দেখতে দেখতে মাধ্যমিক পাশ করল রবি। খুব খারাপ রেজাল্ট। থার্ড ডিভিশন। বাড়িতে সকলে আরও ছি ছিকারে মুখরিত হল। আর রবিও ঠিক করেছিল যে আর নয়। এবার এ বাড়ির সবাইকে খুন করে, ওর প্রতিটা শত্রুকে খুন করে আত্মহত্যা করবে ও।

কিন্তু না। সেটা আর করা হল না। তার আগেই ওর জীবনে চলে এল রুমেলা। রুমেলা মানে ওর বাংলা কোচিনে ভর্তি হওয়া সেই গোলাপি সালোয়ারের মেয়েটা। কী সুন্দর দেখতে। মুখটা ঠিক গল্পের বইয়ের সিন্ডারেলার মতো। ওকে দেখলেই মনের মধ্যে জমতে থাকা রাগ আর ঘৃণাগুলো ফুস করে উবে যেত রবির। ওরা গা দিয়ে কি সুন্দর একটা গন্ধ বেরতো সবসময়। আর রুমেলাই এমন একজন মানুষ যে রবিকে ঘৃণার চোখে দেখত না। খুব মিষ্টি করে কথা বলত ওর সাথে। রবির খুব ইচ্ছে হত রুমেলার বুকে মুখ গুঁজে ওর শরীর থেকে ছিটকে আসা সুঘ্রাণটা প্রাণ ভরে নিতে। রবির খুব ইচ্ছে হত রুমেলার ওই ফুলের পাপড়ির মতো ঠোঁটে নিজের ঠোঁটটা খুব করে ঘষতে। আর এই ইচ্ছেগুলোর সাথে সাথেই নিজের শরীরে এক অদ্ভুত পরিবর্তন টের পেত রবি। এক অদ্ভুত দেহ সুখ। রুমেলা সত্যি খুব ভালো। রবিকে পড়াও বুঝিয়ে দিত মাঝে মাঝে ও। কিন্তু সেই রুমেলাও আর ভালো রইল না যেদিন রবি নিজে থেকে গিয়ে জানাল ওকে নিজের মনের কথা।

—'না রবি। তুই আমার বন্ধু। কিন্তু এসব কি? আমার এখন এসবের মধ্যে জড়াবার ইচ্ছে নেই।'

—'কেন? আমি কি খারাপ? নাকি আমি থার্ড ডিভিশনে পাশ করা বলে তুই পিছিয়ে যাচ্ছিস?' মাথায় নতুন করে জ্বলে ওঠা দাবানলের আগুনকে লুকিয়ে রেখেই বলেছিল রবি।

www.banglabookspdf.com

—'না ওসব নয়। আমি সত্যি এসব চাই না এখন। আর যদি চাইতাম তাহলে তনেন-এর প্রস্তাবেই রাজি হতাম। কারণ ওকে আমারও যথেষ্ট ভালো লাগে...'

না রুমেলার কথাটা আর শেষ করার সুযোগ দেয়নি রবি। কারণ ওর শেষ কথাটায় ততক্ষনে রবির মাথায় খুন চেপে গেছে। এমনিতেই একটু নির্জন একটা কোণার দিকে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল ওরা। সেই নির্জনতাকে ক্ষুণ্ণ না করেই নিঃশব্দে রুমেলার ঠোঁটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রবি। নিজের ঠোঁট আর দাঁত দিয়ে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল ওর পাতলা দুই ঠোঁট। রুমেলার সমস্ত প্রতিরোধ অগ্রাহ্য করে নিজের সাঁড়াশির মতো হাত দিয়ে চেপে ধরেছিল রুমেলার দুই স্তন।

কিন্তু না বেশিক্ষণ পারেনি রবি। রুমেলা প্রাণপণ চেষ্টায় কোনোরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেছিল। আর রবিও ঠিক করে নিয়েছিল বাড়ি থেকে এক খাবলা অ্যাসিড নিয়ে এসে রুমেলার ওই সুন্দর মুখটা পুড়িয়ে দেবে ও পরের দিনই।

কিন্তু না। সেই সুযোগটাও আর ও পায়নি। রুমেলা আর কোনোদিন ওই কোচিনের চত্বরই মাড়ায়নি। আর কোনোদিন রুমেলার মুখ দেখতে পায়নি ও।

হায়ার সেকেন্ডারিতে ফেল করেছিল রবি। না, তার পর আর কেউ ওকে পড়াশুনা করতে বলেনি। নিজের নতুন দোকানটায় বসে কাজ শেখাচ্ছিল ওকে অবিনাশ মাইতি।

আসলে সবটা চালাকি। রবিকে বিনা পয়সার চাকর বানানোর ধান্দা। সব বোঝে রবি। কিন্তু রবির মাথায় যে আগুন নেভে না কিছুতে। সব কটা বদলা যে বাকি। রেবা মাইতি, রুমেলা, স্কুলের সেই ছেলেগুলো, স্যারগুলো...।

রবি যখন নিয়মিতভাবে বদলার ভাবনায় ব্যস্ত ঠিক তখনই আবার নতুন অধ্যায় শুরু হয়ে গেল। রবির তথাকথিত আপনজনরা ওর বিয়ে ঠিক করে ফেলল। মেয়েটা গ্রামের। নাম রিমা। দেখতে খুব একটা সুন্দর না হলেও খুব মন্দ না। রবির খুব ইচ্ছে না থাকলেও ও রাজি হয়ে গেছিল। তবু যা হোক একটা নিজের লোক তো হবে। আর সেখানেই রবি সবচেয়ে ভুল করে ফেলেছিল। আসলে মেয়েরা কোনোদিন কারোর নিজের হয় না। ওরা শুধু চেনে নিজের স্বার্থ আর ধান্দা। রিমাও তার থেকে আলাদা ছিল না। রবিকে আসলে ওর পছন্দই হয়নি। সেই আন্দাজটা বিয়ের দিনেই পেয়েছিল রবি। কেমন যেন ছাড়াছাড়া ভাব, ঠাণ্ডা চাহনি। আর ফুলশয্যার রাতে রবি যখন কাছে টানতে গেল তাকে সে তো বলেই দিল যে সে একটু সময় চায়। অচেনা একজনের সাথে সে হঠাৎ করে ঘনিষ্ঠ হতে পারবে না। ব্যস! বুঝতে আর দেরি হয়নি রবির। পুরো রুমেলার মতোই ব্যাপার। এর মনেও অন্য কেউ বাসা বেঁধে রয়েছে। কিন্তু না এবার আর একে যেতে দেবে না রবি। তাই জোর করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রিমার উপর। একদম কাবু করে ফেলেছিল মেয়েটাকে। কিন্তু কেন যে বেইমান শরীরটা সেদিন সাথ দিল না! পরেরদিন ভোর হতে না হতেই চলে গেল রিমা। দু-দিনের মধ্যে ডিভোর্স চেয়ে পাঠাল। রিমা আর তার পরিবারে দাবি রবি পাগল এবং পুরুষত্বহীন। আবার নিমেষে সকলের সামনে একটা হাস্যকর জন্তুতে পরিণত হল রবি। সবাই বাধ্য করল ওকে ডিভোর্স পেপারে সই করতে। কেউ শুনল না ওর কথা। কেউ বুঝল না ওকে।

www.banglabookspdf.com

কী এমন বেশি চেয়েছিল রবি? শুধুই একটু ভালোবাসা আর একটু উষ্ণতার ছোঁয়া। শুধু একটু উষ্ণতার জন্যই তো বারবার কাঙালের মতো বারবার ছুটে গেছে নিঃস্ব ছেলেটা। আর বারবার সবাই লাথি মেরে সরিয়ে দিয়েছে ওকে। কিন্তু না। আর না। রবির পরাজয়ের পালা এবার শেষ। ওর সব কটা বদলা নিয়ে তাদের রক্ত পান করে এবার জয়ী হবে রবি। ভুটিয়া বাবার সাথে কপালজোরে যখন একবার পরিচয় হয়েই গেছে তখন আর পিছন ফিরে তাকাতে হবে না ওকে। ভুটিয়া বাবা তো বলেইছে ভগবান যার সাথ ছেড়ে দেয় শয়তান তাকে আপন করে নেয়। যেমন নিয়েছে ভুটিয়া বাবাকে। আর ভুটিয়া বাবার সব কথা মেনে চললে সেদিন আর বেশি দূর নেই যখন শয়তানের আশীর্বাদে রবির বদলা আর মনে জমে থাকা ঘৃণা শেষ হবে কড়ায় গণ্ডায়। পঞ্চ আহুতির মাধ্যমে সম্পন্ন হবে রবির সাধনা। আর তার পরই রবি হবে সত্যিকারের ক্ষমতাবান নিজের বদলা নেবার জন্য। পর পর পাঁচটা মাসের অমাবস্যা শুধু চাই ওর। আর পাঁচটা প্রথম ব্যঞ্জন বর্ণ। সামনের ১১ পৌষই তো অমাবস্যা। আর ওর আসন্ন প্রথম ব্যঞ্জন বর্ণের নাম কমলি।

—'ছোড়দাবাবু, ঘরে আসব...' দরজায় টোকার শব্দের সাথেই ভেসে এল গলাটা।

—'কে?' গলা ছাড়ল রবি।

—'আমি কমলি।'

চকচক করে উঠল রবির চোখ।

—'হ্যাঁ আয়।' মলিন সালোয়ার পরা রোগা মেয়েটা ঢুকল রবির ঘরে।

—'মা, আপনার চা পাঠালেন। রাতে কী দেব আপনারে? রুটি না ভাত? কী খাবেন?'

উত্তর দিল না রবি। শুধু চকচকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রোগা, কালো অতি সাধারণ গরিব কাজের মেয়েটার দিকে।

banglabookspdf.com

১

সমুদ্রের ধারে বসে বালি চেপে চেপে বালির ঘর বানাচ্ছিল কনক। আর সারা গায়ে মেখে নিচ্ছিল ফুরফুরে মিষ্টি সাগরের হাওয়া। অনেকেই তাকাচ্ছে যথারীতি ওর দিকে কিন্তু ওর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। ও ব্যস্ত নিজের কাজে। নিজের হানিমুনের একটা মুহূর্তও ও নষ্ট হতে দেবে না কোনো বাজে জিনিসে মন দিয়ে। হঠাৎ করে পিছন থেকে কেউ এসে জড়িয়ে ধরল ওকে।

—'উফফ! অরুণ। আবার দুষ্টুমি না?' গদগদ গলায় বলল কনক। তারপর ঝট করে পিছন ঘুরে মুখ গুঁজে দিল অরুণের বুকে। আর ওমনি অরুণও ঠোঁট ডুবিয়ে দিল কনকের ঠোঁটে। সত্যি! এই মুহূর্তগুলোর জন্যই তো এতদিন সব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বেঁচে ছিল বোধ হয় কনক। আস্তে আস্তে একটা স্বর্গীয় অনুভূতি ছেয়ে যাচ্ছে কনকের সারা শরীর আর মনে।

টিংটিংটিংটিং... অ্যালার্মের শব্দে ভেঙে গেল কনকের ঘুমটা। ধড়মড় করে জেগে উঠে বিছানায় বসল ও। উফফ! সত্যি কি জীবন্ত স্বপ্ন। এখনও সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে আছে ওর। অরুণ! ওর একদম কাছে। ওর নিজের মধ্যে একদম মিশে গেছিল অরুণ। আলগোছে একবার ঘড়ির দিকে

www.banglabookspdf.com

তাকাল কনক। ঘড়িতে এখন দুপুর সাড়ে চারটে। তার মানে আর অল্প অল্প ক্ষণ পরেই এসে যাবে রাইমা দিদি। উফফ! এসেই তো লাটসাহেবের হুকুম ছাড়া শুরু হবে।

—'কনক চা দে। কনক এটা দে, ওটা দে, খাবার দে।' উফফ! অসহ্য লাগে কনকের ওই নেকা রাইমাটাকে। শয়তান মেয়ে একটা। এখন আবার চক্রান্ত করছে ওর আর অরুণের প্রেমটা ভাঙিয়ে দেবার। অরুণকে ওর জীবন থেকে সরিয়ে দেবার। সে তো ও করবেই কনক চলে গেলে ওর বিনা পয়সার কেয়ার টেকার গিরি আর করবে কে। কিন্তু কনক অত বোকা নয়। রাইমার কোনো চালকে বিশ্বাস করে ও অরুণকে হারাবে না। অরুণকে পাওয়াটা নেহাতই ওর চরম ভাগ্য। নইলে ওর মতো একটা মেয়েকে কি আর অরুণের মতো ছেলে কখনো ভালোবাসতে পারে! অরুণের প্রেম পাবার পরেই কনক বুঝেছে বেঁচে থাকার মানে কী। নইলে কী ছিল কনক! নিজেদের গ্রামে সকলের হাসি ঠাট্টার পাত্রী। ছোটোবেলাতে খুব খারাপ একটা অগ্নিকাণ্ডের কবলে পড়েছিল কনকরা। কনক আর ওর বোন কেয়া খুব খারাপ ভাবে পুড়ে যায় তাতে। প্রাণে সেবার বেঁচে গেলেও চিরজন্মের মতো নিজের রূপ খুইয়ে বসে কনক সেই মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই। তারপর সেই পোড়া মুখ আর পোড়া শরীর নিয়েই ছোটো থেকে বড়ো হয়েছে কনক। গ্রামের সব মানুষজনই কেমন যেন হেয়ও করত কনককে। সবাই কেমন যেন হাসাহাসি করত ওকে নিয়ে, কানাকানি করত। অনেকে তো সামনেই বলত ওর মাকে—

—'কিগো সেজ বউ, তোমার এই মুখ পোড়া কুৎসিত মেয়েগুলোকে নিয়ে কী করবে শেষমেষ? কেউ তো বরন করে ওদের ঘরে তুলবে না, আর তোমাদেরও তো গ্যাঁটের অত জোর নেই যে পার করবে ওদের। তাহলে ওদের কি হবে গা?' না, মা কোন উত্তর দিতে পারত না এসব কথার। চুপ থাকত।

কনক যখন স্কুলে যেত তখনও ওর সাথে মিশতে চাইত না কেউ। যেন ও ভিনগ্রহের এক প্রাণী। ভীষণ কান্না পেত কনকের। কী দোষ ওর যে সবাই এমন দুর ছাই করে ওকে। দেখতে দেখতে বড়ো হয়ে গেল কনক। প্রকৃতির নিয়মে ভরা যৌবনে এসে ভর করল ওর শরীর। আস্তে আস্তে কনকের মনও খুঁজতে শুরু করল পুরুষের সান্নিধ্যের উষ্ণতা, শরীরে খুঁজতে শুরু করল পুরুষের স্পর্শের সুখ। কিন্তু কনকের মতো মেয়েকে তো কথা বলারই যোগ্য মনে করে না, তাইতে কে স্থান দেবে ওকে নিজের জীবনে! মনের কষ্ট মনে চেপেই যখন দিন কাটছিল এভাবে কনকের তখন হঠাৎ একদিন ওদের বাড়িতে এল রজত মামা। এই রজত মামা মায়ের দুঃসম্পর্কের ভাই। যোগাযোগও এদের সাথে অল্পই ছিল। রজত মামা শিলিগুড়িতে থাকে। ওখানকার বড়ো ব্যবসায়ী। বউ নেই। আছে একমাত্র মেয়ে রাইমা। সেও ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে সবে। রজত মামা মাকে এসে বলল—

—'শোন বুলু, আমায় মেয়েটা কলকাতায় একটা বড়ো কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছে। ওকে ওখানেই এবার থেকে থাকতে হবে। একা। ওখানে আমার চেনা লোক আছে। সে থাকা-টাকার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কিন্তু বুঝতেই তো পারছিস, ও আমার খুব আদরে মানুষ। একা কোনোদিন কোথাও থাকেনি। তাই তুই যদি কনককে ওর সঙ্গে পাঠাস তাহলে খুব ভালো হয়। ওরা দুজন মিলে

www.banglabookspdf.com

থাকবে, কনক ওর দেখভালও করতে পারবে। আর তুই তো বলিসই এই গ্রামে কনকের নানা সমস্যা। কলকাতা তো আর তেমন না। ওখানে কেউ কারো ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। তা ছাড়া কলকাতায় থাকতে থাকতে কনকও অনেক চালাক চতুর হবে। জীবনে চলার পথে ওরও তো একটু স্মার্ট হওয়া দরকার।'

রজত মামার কথাগুলো মায়ের দারুণ মনে ধরেছিল। তাই এক কথায় রাজি হয়ে গেছিল মা। আর কনকও চাইছিল ওই গ্রামটা ছাড়তে। তাই ও নিজেও এই ব্যবস্থা মেনে চলে এসেছিল রাইমা দিদির সাথে। এখানে এসে সারাদিন বাড়ির মধ্যে বসে থেকে, কাজকম্ম করে আর রাইমার ফাই ফরমাস খেটেই চলে যেত ওর দিনগুলো যদি না হঠাৎ করে একদিন বাড়ির দোরগোড়ার কাপড় কাচার সাবান বেচতে অরুণ আসত এখানে, যদি না অরুণের হঠাৎ জল তেষ্টা পেত সেদিন। অরুণের সাথে ওর প্রেম হওয়াটা খুব অপ্রত্যাশিত হলেও এটাই এখন ওর জীবনে চরম ভাবে সত্যি, সে যে যাই বলুক।

ঘ্যারঘ্যার করে আবার হঠাৎ মোবাইলটা ভাইব্রেট হল কনকের। খুব সন্তর্পণে নিজের লুকিয়ে রাখা মোবাইলটা টেনে বের করল কনক।

—'কী করছিলে কনক? সব ঠিক তো ওদিকে?' ওপাশে অরুণের গলা।

—'হ্যাঁ অরুণ। ওরা আমায় পাগল সাজিয়ে তোমার অস্তিত্ব মিথ্যা করার চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছে। আমাদের ভালোবাসাকে মিথ্যা করার চেষ্টা আমি সফল হতে দেব না অরুণ। তুমি যেমন বলেছ আমি তেমনই চলছি।'

—'ভাবুক ভাবুক। ওর সবটাকে মিথ্যা ভাবুক। তাতেই তো আমাদের সুবিধা। ওরা যদি ভাবে আমি মিথ্যা, আমার ভালোবাসা মিথ্যা তাতেই তো আমি আরও বেশি সহজে লুকিয়ে তোমায় নিয়ে পালাতে পারব। সামনের অমাবস্যাই তো আমার স্বপ্নপূরণের দিন। সেদিনই তো তোমায় আমার কাছে নিয়ে আসব। পুরোপুরি নিজের করে নেব তোমায়।'

—'সত্যি বলছ অরুণ? আমাদের নিজেদের সংসার হবে? তুমি আমার হয়ে যাবে বরাবরের জন্য! উফফ! আমি যে ভাবতেই পারছি না।' নিজের মোবাইল ফোনটায় পরম আশ্লেষে চুমু খেতে থাকল কনক। ওর সারা শরীরে যে বিদ্যুতের শিহরণ খেলে যাচ্ছে। এবার ও যে পাবে ভালোবাসার উষ্ণ ছোঁয়া। কিন্তু খুশিতে পাগল মেয়েটা ফোনে চুমু খেতে খেতে টেরই পেল না যে অপর প্রান্ত কিন্তু ততক্ষণে নীরব নিথর হয়ে গেছে।

২

বাড়ির একতলার ড্রয়িং রুমে চিন্তিত মুখে বসেছিল রাইমা। উফফ! কী সাংঘাতিক ঝামেলা হয়ে গেল এই কনকটাকে সঙ্গে নিয়ে এসে। একে সাথে আনার ইচ্ছা কোনোদিনই রাইমার ছিল না। সবটাই বাবার জোরের জন্য হল। আরে! রাইমা বাচচা মেয়ে নাকি যে এখানে এসে থাকতে পারবে না একা। কিন্তু কি আর করা যাবে, বাবার অলরেডি একটা ছোটো হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে তারপর থেকে বাবার সাথে আর কোনো ব্যাপারেই তর্ক করে না রাইমা। কোনো ব্যাপারেই আর টেনশন দিতে চায় না বাবাকে। এমনিতেই তো ব্যবসার জন্য হাজার চাপ বাবার। আর সেইজন্যই তো আজ

www.banglabookspdf.com

অবধি বাবাকে বলতে পারল না শেখরের কথাটা। আর আজও বলতে পারছে না কনককে নিয়ে এসে ঠিক কী মহা ঝামেলায় পড়েছে ও। কনকের ছোটোবেলায় সেই দুর্ঘটনার পর থেকে ও একটু গুটিয়ে গেছিল, কারো সাথে মিশত না বা হীনমন্যতায় ভুগত সেটা তো বরাবরই জানত সবাই। আর সেইজন্যই তো ওকে প্রথম আনতে চায়নি রাইমা। কিন্তু একী! এখন তো দেখা যাচ্ছে মেয়েটা সম্পূর্ণ মানসিক বিকার গ্রস্ত। মেয়েটা স্কিতজোফ্রেনিয়ার স্বীকার রীতিমত। নিজের কাল্পনিক দুনিয়া বানিয়ে নিয়ে সেখানেই বাস করে। কাল্পনিক এক অরুণকে আশ্রয় করে নিয়ে সারাক্ষণ প্রেম করছে তার সাথে। নিজের হাতটাই কাল্পনিক মোবাইল বানিয়ে সারাক্ষণ অদৃশ্য সেই মোবাইলে চলছে প্রেমালাপ। এ রাইমাকে কি দেখবে! রাইমারই তো সব কাজকম্ম লাটে উঠতে বসেছে এর পাগলামির গুঁতোয়। সাইক্রিয়াট্রিকের সাথেও কথা বলেছে রাইমা। উনি বলেছেন এমনটা হয়। কনকের মতো কিছু না পাওয়া, সমাজের কাছে বঞ্চিত আর শারীরিক কোনো ব্লকেজ থাকা মেয়েদের মনের মধ্যে নাকি অনেক সময় আস্তে আস্তে এই ধরণের বিকার গড়ে উঠতে পারে। নিজেদের প্রত্যাশা আর বাস্তব পরিস্থিতি এই দুয়ের মধ্যে চূড়ান্ত বৈসাদৃশ্যই এর প্রধান কারণ। কনককে একবার দু-বার জোর করে বা ভুলিয়ে ভালিয়ে রাইমা নিয়েও গেছিল সাইক্রিয়াট্রিকের কাছে। কিন্তু না। সে কোনো সহযোগিতা করলে তো! দিন দিন কনকের পাগলামি চরম থেকে চরমতম হয়ে উঠেছে। এমনকী লাস্ট কয়েকদিনে বেশ হিংস্রও হয়ে উঠেছে ও। প্রথমে রাইমা ভেবেছিল সবটা ও একাই সামলে নেবে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে না, একা সবটা সামলান যাবে না। পরিস্থিতি আস্তে আস্তে হাতের বাইরে যাচ্ছে। তাই শেখরকে সব জানিয়েছে ও।

এই শেখর আসলে ওর বাবারই এক কর্মচারী। ব্যবসার কলকাতার দিকটা দেখে ও। ওর মতো সৎ ছেলে আজকের দিনে প্রায় বিলুপ্ত। ওর এই সততা আর নিষ্ঠাই রাইমাকে আকৃষ্ট করেছে ওর প্রতি। কলকাতায় রাইমার থাকার জন্য এই বাড়িটার ব্যবস্থাও ওই করে দিয়েছিল। কলকাতায় থাকার জন্য রাইমার যতটুকু দেখাশুনা দরকার তার জন্য শেখরই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বাবাকে আর কীভাবে বোঝায় সেটা রাইমা। কনকের এই সমস্যাটার কথা গত দু-চারদিন আগে প্রথম ওকে জানায় রাইমা। প্রথমে শুনে শেখরও রাইমার মতোই প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। কিন্তু গত কাল থেকে ও যেটা বলছে সেটা জাস্ট ওর থেকে আশা করেইনি রাইমা। আজকের এই ২০১৮ সালে দাঁড়িয়ে শেখরের মতো একটা আধুনিক ছেলে কীভাবে এমন কথা বলতে পারে! না, এসব ভাঁওতায় বিশ্বাস করতে পারে না রাইমার মতো একটা শিক্ষিত যুক্তিবাদী মেয়ে।

কে এই মনিকা মাইতি? সে কীভাবে উৎঘাটন করতে পারে কনকের স্কিতজোফ্রেনিয়ার রহস্য? আর শেখর যেগুলো বলছে সেগুলো কি আদৌ সত্যি হওয়া সম্ভব নাকি? এই মনিকা মাইতি নাকি আসলে শেখরের প্রতিবেশী। সেই নাকি এই বাড়িটার আসল মালিক। সেই নাকি এই বাড়িটা ঠিক করে দিয়েছিল রাইমার থাকার জন্য।

পাশের ঘরেই কনক রয়েছে। রাইমা আলগোছে উঠে দরজাটার অল্প ফাঁক দিয়ে চোখ রাখল ঘরের ভিতর। অল্প ফ্যাকাশে আলো জ্বলছে ঘরে। তাতেও দেখা যাচ্ছে কনক নিজের হাতটাকে মোবাইলের

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

ভঙ্গিতে আঁকড়ে পাগলের মতো কথা বলছে—

—'তুমি বিশ্বাস কর অরুণ। আমি ওদের কারো কথা মানি না। আমি জানি তুমি আছ। ভীষণভাবে আছ। আর আমি তোমার কাছে যাবই আমাদের নির্ধারিত দিনে। আমি মরতেও ভয় পাই না, তাই এরা আমায় আর কি ভয় দেখাবে! আমার জীবনে তো কিচ্ছু নেই। তাই তোমায় পাবার জন্য, এই শূন্য জীবনে নেমে আসা ভালোবাসার উষ্ণ ছোঁয়া পাবার জন্য এই যদি আমায় মরতেও হয় তাও আমি রাজি। কোনো কিছু আমায় থামাতে পারবে না। কেউ আমায় আটকাতে পারবে না এই আমি বলে রাখলাম।'

নিজের অজান্তেই কেমন যেন কেঁপে উঠল এবার রাইমা। এ কে? এ তো ওর চেনা সেই সহজ সরল ভীতু কনক নয়। এ যে কনকের বেশে যেন অন্য কেউ। অন্য কোনো দানোয় পাওয়া শক্তি। ভাবনাটা মনে আসতেই নিজেকেই নিজে কষে ধমক লাগাল রাইমা। না, এসব বোকা বোকা ভিত্তিহীন আর আজগুবি ভাবনার একফোঁটা ছায়াকেও প্রশ্রয় দেবে না ও। ও একজন যুক্তিবাদী আর বিজ্ঞান বাদী মেয়ে। এসব ভাবনা ওর জন্য নয়।

৩

রাইমা মুখ নীচু করে বসে রয়েছে মেঝেতে আর ওর দু-চোখ ভেসে যাচ্ছে জলে। ওর সামনেই মেঝেতে শোয়ানো রয়েছে কনকের নিথর দেহটা, যেটা এই মুহূর্ত আপাদমস্তক সাদা চাদরে ঢাকা। কনকের দেহটা নাকি বীভৎস আকার নিয়েছে। রক্তশূন্য পুরো ফ্যাকাশে এমন ডেডবডি নাকি চোখে দেখা যায় না। গত চার পাঁচ দিন ধরেই মিসিং ছিল কনক। ওকে খোঁজা নিয়ে এই ক-দিন পাগল ছিল ও আর শেখর। এমনকী বাবাও চলে এসেছেন শিলিগুড়ি থেকে। গতকাল খুঁজে পাওয়া গেছে ওকে মানে ওর মৃতদেহকে। এই বাড়িরই অল্পদূরের ওই পুকুরটা থেকে। কিন্তু না, জলে ডুবে ওর মৃত্যু হয়নি। পুলিশ আর পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে কনকের গলার কাছে আঘাতের চিহ্ন আছে। কেউ ওর গলায় ধারাল কোনো অস্ত্রের আঘাত করে যেন এক দলা মাংস ছিঁড়ে নিয়েছে। তারপর দেহটা ছুঁড়ে দিয়েছে ওই জলে। কিন্তু কে? কে বা কারা খুন করতে পারে কনকের মতো একটা নিরীহ মেয়েকে? উত্তরটা তদন্তসাপেক্ষ এটা ঠিক। কিন্তু রাইমার মন যে অন্য কথা বলছে। আজ যে আর নিজের পুরোনো বিশ্বাসে স্থির থাকতে পারছে না ও। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে ওর সব যুক্তি আর বিজ্ঞান। তবে কি ওর জন্যেই মরে গেল কনক?

'রাইমা'... হঠাৎ আসা ডাকটায় চমকে গেল পরমা। দরজার দিকে চোখ চলে গেল ওর। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মনিকাদেবী। সেই রোগা চেহারা, সেই সাদা কালো কম্বিনেশনের শাড়ি ব্লাউজ। একে দেখেই রাইমার সেই অপরাধবোধটা দ্বিগুণ হয়ে ফিরে এল।

ওর মনে পড়ে গেল দিন পনেরো আগের সেই সন্ধ্যাটা, যেদিন প্রথমে মনিকা এসেছিলেন এই বাড়িতে।

শেখরের সাথে সেদিন এসেছিলেন প্রথম তিনি। শেখর বলেছিল ওর মুখে কনকের সমস্যার কথা শুনে উনি কিছু বলতে চান। তাই এসেছেন।

www.banglabookspdf.com

—'বলুন কী বলবেন...' বেশ গম্ভীরভাবেই বলেছিল রাইমা। বছর বিয়াল্লিশের আধা বুড়ি চেহারার মহিলাটিকে কেন যেন সেদিন বেশ অদ্ভুত লেগেছিল ওর।

—'প্রথম যেদিন শেখর আমায় বলে এ বাড়িতে ভাড়া নিতে চায় একটি অল্প বয়স্ক মেয়ে সেদিনই আমি শেখরকে দুটি প্রশ্ন করেছিলাম। ১। মেয়েটির নাম কী? ২। মেয়েটির কোনো শারীরিক খুঁত বা অসুবিধা আছে কি না। কি মনে আছে তো শেখর?' অল্প মাথা নাড়ল শেখর।

—'কেন এমন কথা বলেছিলাম সেটা জানানোর আগে তোমায় আমার দাদার ব্যাপারে একটু বলা দরকার। আমার দাদা রবি মাইতি। যে মারা যায় বছর পয়ত্রিশ আগে। সে আমার নিজের দাদা ছিল না। ছিল বৈমাত্রেয় ভাই। আমার বাবার প্রথম পক্ষের ছেলে। রেবা মাইতি মানে আমার বাবার প্রথম পক্ষের স্ত্রী-র স্বভাব ভালো ছিল না। রবি একদিন তাকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় ধরে ফেলে তার প্রেমিকের সাথে। বলাই বাহুল্য যে এই ঘটনা সাংঘাতিক নেগেটিভ প্রভাব ফেলে রবির শিশু মনে। তারপর থেকেই ওর মানসিক বিকার সৃষ্টি হয় নানারকম। ইতিমধ্যে বাবার জীবনে আসে আমার মা আর আমি। সেটা রবি আরও মেনে নিতে পারে না। ওর মনে হতে থাকে সকলেই ওর শত্রু। সবাই ওর জীবন নষ্ট করছে। তবুও আস্তে আস্তে বড়ো হতে থাকে ছেলেটা। নানা কারণেই বয়স বাড়ার সাথে সাথে মেয়েদের প্রতি ঘৃণাটাও আরও ওর বাড়তে থাকে। সবাই ভেবেছিল বিয়ে দিলে হয়তো শুধরে যাবে। তাই বিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সে বিয়েও টেকে না। ওর বউ বউভাতের পরের রাতেই চলে যায়। তারা ডিভোর্স চেয়ে পাঠায় আর অভিযোগ করে রবি পাগল আর পুরুষত্বহীন। এই ঘটনার পরেই আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে না দাদা। পুরোপুরি পাগল হয়ে যায়। সব সময় বিড়বিড় করতে থাকে আপন মনে। তখন আমাদের বাড়ির কাছে একটা মসজিদ ছিল। হঠাৎ দাদা শুরু করে সেই মসজিদে যাতায়াত। এমনকী শ্মশানে আনাগোনাও ধরেছিল ও। ওর মনে তখন এক আজগুবি বদলার ভাবনা।

তারপর কোথা থেকে কি হয়ে গেছিল জানি না। একদিন গভীর রাতে, যখন আমরা সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তখন দাদা আমাদের বাড়ির নিরীহ কাজের মেয়েটার ঘরে ঢুকে ওকে খুন করে। সেই মেয়েটার ভয়াল আর্ত চিৎকারে যখন সবাই ছুটে যায় ওর ঘরের দিকে তখন সবাই বীভৎস এক দৃশ্য দেখে। ধারালো ছুরি দিয়ে দাদা খুবলে দিয়েছে কমলির গলার কাছটা। আর তারপর সেই খোবলানো মাংস আর রক্ত নিজের মুখের ভিতর ঠাসছে দাদা।'

—'প্লিজ চুপ করুন। কেন বাড়ি বয়ে এসে এসব জঘন্য গল্প শোনাচ্ছেন আমায়?' রাইমার ধমকে দু-মুহূর্তের জন্য সেদিন চুপ হয়েছিলেন ভদ্রমহিলা। তারপর আবার বলতে শুরু করেছিলেন—

—'শোনাচ্ছি কারণ, এই সব ঘটনার সাক্ষী এই বাড়িটাই যেখানে এখন তুমি থাকছ। প্লিজ বলতে দাও আমায়। সেদিনকার সেই ঘটনার পর দাদাকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তবে দাদা চলে গেলেও দাদার লেখা কয়েকটা ডায়েরি থেকে যায় এই বাড়িতেই। সেই ডায়েরি পরে আমার বাবা মা জানতে পেরেছিলেন দাদার মারাত্মক সব অভিসন্ধির কথা। দাদা খুব প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠেছিল মানসিক বিকার আর প্রতিকূল পরিস্থিতির চাপে। নিজের সেই বদলার ইচ্ছা মেটাতে দাদা

www.banglabookspdf.com

বোধ হয় দ্বারস্থ হয়েছিলেন ভুটিয়া বাবা নামে কোনো পীর বা সাধুর। অবশ্য এমনও হতে পারে যে ডায়েরিতে উল্লেখিত এই ভুটিয়া বাবা নেহাতই দাদার কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু মোদ্দা কথা হল সেই সময়ে দাদা শুরু করেছিল শয়তানের উপাসনা বা নেগেটিভ শক্তির আরাধনা। দাদা বোধ হয় চেয়েছিল আস্তে আস্তে আমাদের এই পুরো বাড়িটাকেই কালো শক্তির আঁতুড়ঘর বানিয়ে তুলতে। দাদার ডাইরির কোনো এক জায়গায় লেখা ছিল 'পঞ্চ ব্যঞ্জন আহুতির কথা।' এই পঞ্চ ব্যঞ্জন আহুতি বলতে দাদা বুঝিয়েছিল এমন পাঁচ জন মেয়েকে খুন করার কথা যাদের নামের শুরু প্রথম ব্যঞ্জন বর্ণ অর্থাৎ 'ক' দিয়ে আর সেই মেয়ের থাকতে হবে কোনো শারীরিক খুঁত। অমাবস্যার রাতে এমন পাঁচটা মেয়েকে খুন করে তার মাংস আর রক্ত খেলেই নাকি দাদা হয়ে উঠবে অসীম ক্ষমতার অধিকারী আর সব মেয়েই নাকি তাহলে হবে দাদার পরাভূত। কমলি মানে আমাদের সেই কাজের মেয়েটার বাঁ-পায়ের দুটো আঙুল ছিল না। আর তারা নামও ছিল 'ক' দিয়ে। তাই তাকে হতে হয়েছিল দাদার মানসিক ব্যাধির শিকার। পাগলা গারদে যাবার অল্প কিছুদিন পরেই স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু হয় দাদার। আর তারপরে এই বাড়িতেও নাকি ঘটতে থাকে নানা অস্বাভাবিক ঘটনা। তখন বাবা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যান অন্য জায়গায়। এ বাড়ি লেগে যায় ভাড়া দেবার কাজে। বিগত পঁয়ত্রিশ বছরে এ বাড়িতে সব মিলিয়ে প্রায় দশ বারোটা পরিবার থেকে গেছেন। কারোরই কোনো সমস্যা হয়নি শুধু মিস্টার অনিল সাহা ছাড়া।'

—'কে অনিল সাহা?' রাইমার প্রশ্নে একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন মনিকা।

—'অনিল সাহা আর তার বউ তাদের মেয়েকে নিয়ে ভাড়া আসে এ বাড়িতে বছর কুড়ি আগে। ওদের মেয়ের নাম ছিল করুণা আর মেয়েটা ছিল অন্ধ। এই বাড়িতে আসার পর থেকেই মেয়েটির মধ্যে নানা সমস্যা শুরু হয়। অন্ধ নিরীহ মেয়েটা হঠাৎ স্লিপ ওয়াকিং-এর শিকার হয়। কোনো এক অপার্থিব দিবাকরের ভালোবাসার বাঁশির সুরের টানে অন্ধ মেয়েটা রাত বিরেতে ছুটে যায় ঘর ছেড়ে অজানা অন্ধকারের দিকে। কারো কোনো নিষেধ তাকে থামাতে পারে না। এই ঘটনা শোনার পরই আমার সেদিনেও মনে পড়ে যায় দাদার সেই পুরোনো ডায়েরির পাতাগুলো, মা বাবার মুখে শোনা দাদার সেই বীভৎস অভিসন্ধির কথাগুলো। একটা শারীরিক খুঁত যুক্ত মেয়ে যার নাম 'ক' দিয়ে। মুহূর্তে ভাবনার একটা নতুন দিক খুলে যায় আমার মধ্যে। সবটাতো মিলে যাচ্ছে দাদার সেই ডায়েরির লেখার সাথে। দাদার অতৃপ্ত আত্মা হয়তো আজও খুঁজে বেড়াচ্ছে তার সেই অসমাপ্ত প্রতিশোধ। হয়তো সেইজন্যই কমলির মতো করুণাও হতে চলেছে দাদার নিশানা। আজ রবি অশরীরী। তাই ওর ক্ষমতার পরিধিও আজ বিশাল। হয়তো তাই সে আজ এত বছর পর আবার যখন হুবহু সেই রকমই একজন মেয়েকে পেয়েছে এই বাড়িতে তাই ছলে বলে নিজের আয়ত্তে কাবু করতে চাইছে তাকে। মেয়েটাকে শেষ করে নিজের পঞ্চ ব্যঞ্জন আহুতির একটা উপকরণ বানাতে চাইছে তাকে। আর অদ্ভুত ব্যাপার, করুণা যে ছেলের কথা বলে ঘর ছেড়ে ছুটে যায় তার নাম দিবাকর। যেটা সূর্যের নাম। আর রবি মানেও যে সূর্য সে কে আর না জানে। আমি আমার এই ধারণা আর বিশ্বাসের সবটা সেদিন বলেছিলাম অনিল বাবুকে। না এসব কথার কোনো বাস্তব ভিত্তি বা সাক্ষ্য

www.banglabookspdf.com

প্রমান হয়তো সেদিন আমি দিতে পারিনি, কিন্তু তবুও ওরা মেনেছিলেন এই কথাগুলো। এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন। কিন্তু তবুও শেষ রক্ষা হল না। যাবার দিনের ঠিক আগের রাতই ছিল ঘোর কালো অমাবস্যার রাত। সে রাতে কখন যেন একটু চোখ লেগে এসেছিল অনিল বাবু আর তার মিসেসের। আর ঠিক সেই সময়েই বোধ হয় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছিল করুণা সেই দিবাকরের বাঁশির সুরের টানে। তিনদিন মেয়েটার কোনো খবর পাওয়া যায়নি। তারপর ওর লাশ পাওয়া যায় এ বাড়িরই অল্প দূরের ওই ওয়াটার বডিটা থেকে। সাদা ফ্যাকাসে রক্ত শূন্য একটা দেহ। গলার কাছে খুবলানো মাংস। যেন কেউ পরম আক্রোশে ছিঁড়ে নিয়েছে মাংস পিণ্ড। ঠিক যেমনটা হয়েছিল বহু বছর আগে আমাদের বাড়ির কাজের মেয়ে কমলির সাথে।' একনাগাড়ে এতটা বলে জলের গ্লাসে মনিকাদেবীর চুমুক দিতে যাবার মুহূর্তেই গম্ভীর গলায় বলে উঠেছিল রাইমা—

—'ম্যাডাম, আপনি যেটা শোনালেন ভূতের গল্পে প্লট হিসাবে সেটা অসাধারণ তাতে কোনা সন্দেহ নেই। কিন্তু কি জানেন তো ভূতের গল্প কোনো কালেই আমার একদম ভালো লাগে না। আসলে আমি কট্টর ভাবে যুক্তিবাদী। সায়েন্সের ছাত্রী। তাই ভূত প্রেতের আজগুবি তত্ত্বে একদম বিশ্বাস করি না। মনে হয় পুরো ব্যাপারটাই ধাপ্পা। আপনার দাদার সাথে করুণার মৃত্যুর কোনো যোগসাজশ অন্তত আমার তো মাথায় এলে না। অন্ধ মেয়ে। মানসিক সমস্যার শিকার হয়ে মাঝরাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল। কোনো মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে তার মৃত্যু হওয়াটা অবশ্যই খুব দুঃখজনক, কিন্তু ভূতুড়ে নয়। হয়তো কাকতালীয় ভাবে তার সেই মৃত্যুর আঘাতের সাথে বহু বছর আগে আপনাদের বাড়ির মৃত কাজের মেয়ের মৃত্যুর কোনো মিল ছিল। কিন্তু তা বলে তারা এক সূত্রে গাঁথা হতেই পারে না।'

—'প্লিজ রাইমা, তুমি একটু বোঝার চেষ্টা কর। যুক্তি আর বিজ্ঞানের বাইরেও অনেক কিছু থাকে। আর তা ছাড়া বিজ্ঞানেই তো মেনে নেওয়া হয়েছে নেগেটিভ এনার্জির অস্তিত্বকে। তাই নয় কি? প্লিজ তুমি মরতে দিও না কনককে। ওর সামনে এখন যে বড়ো বিপদ। আগামী অমাবস্যার আগেই তুমি প্লিজ ওকে নিয়ে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাও। নাহলে হয়তো... তা ছাড়া তুমি কি লক্ষ্য করেছ কনকের কাল্পনিক প্রেমিকের নাম অরুণ। সেও কিন্তু সূর্য বা রবিরই নামান্তর। কনকের সারা গায়ে পোড়া আর ওর নামও শুরু...'

—'ব্যস মনিকাদেবী। আর নয়। আপনার এই সব আজগুবি কাহিনি আর আমি সত্যি বরদাস্ত করতে পারছি না। এভাবে ভয় দেখিয়ে আমাদের নির্ধারিত সময়ের আগে বাড়ি ছাড়া করাটা আপনি যতটা সহজ মনে করছেন, তত সহজে হবে না। আমার বোনের অসুস্থতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে... প্লিজ। আপনি এখন আসতে পারেন।'

সেদিনকার নিজের সেই উদ্ধত ব্যবহারের জন্য আজ মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে রাইমার। কেন যে সেদিন ও একটুও মানল না কথাগুলো! হয়তো তাহলে আজও কনক... না, রাইমা আজও জানে না মনিকাদেবীর কথাগুলো কতখানি সত্যি আর কতটা সত্যি নয়। কিন্তু এটা তো ও জানে

www.banglabookspdf.com

কনক সত্যি মিসিং হয়েছিল সেই অমাবস্যার রাত থেকেই। এটাও তো সত্যি যে ঠিক যেমন মৃত্যুর কথা বর্ণনা করেছিলেন মনিকাদেবী সেভাবেই মারা গেছে কনক।

মনিকাদেবী আজ ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বসলেন রাইমার পাশে। আলতো করে হাত রাখলেন ওর পিঠে। আবার জোরে ডুকরে কেঁদে উঠল রাইমা। আপনা থেকেই ওর হাত দুটো জোর হয়ে গেল মনিকা মাইতির সামনে।

—'রাই মামনি'... গলার স্বরে চমকে উঠল একটু রাইমা। সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বুলু পিসি মানে কনকের মা। যার সবচেয়ে বড়ো অপরাধী আজ রাইমা। ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে কিছু বলতে যাচ্ছিল রাইমা, কিন্তু তার আগেই বলল বুলু পিসি—

—'না রে মা। তোর কোনো দোষ নেই আমি জানি। ও মেয়ের মাথায় যে দোষ গজিয়েছে তা তো মা হয়ে আমি নিজেই কোনোদিন টের পাইনি। নিজের মাথার দোষেই আজ হতভাগী'... ফুঁপিয়ে উঠল বুলু পিসি। তারপর আবার বলল— 'আমি আজ কেয়াকে রেখে যাচ্ছি রে মা। এবার থেকে কনকের মতো ওই তোর...'

অপাঙ্গে একবার কেয়ার দিকে তাকাল এবার রাইমা। একদম কনকেরই ছায়া। সেই পোড়া শরীর আর মুখ, সেই বোকা বোকা ভিতু চোখ যাতে লেগে আছে হাজারো না মেটা আশার আগুন। সেই 'ক' দিয়ে নাম...

—'না না না'... পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল রাইমা। না কেয়াকে নিয়ে আর কোনো রিস্ক নেবে না ও যুক্তি বা বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে। কে জানে! সত্যি হয়তো বিজ্ঞানের বাইরেও কোনো জগত আছে। কে বলতে পারে। আমরা আর কতটুকুই বা জেনে উঠতে পেরেছি!

—'তবে কি তুই কলকাতায় একা থাকবি নাকি এখন থেকে? পাগল হলি?' প্রশ্নটা এল বাবার থেকে।

নাঃ আর দেরি নয়। আজই আসল দিন হঠাৎ মনে হল রাইমার।

—'না আমি কলকাতায় আমার বরের সাথেই থাকব।'

—'বর মানে?' চমকে উঠল বাবা।

—'বর মানে শেখর। আমি ওকে ভালোবাসি অনেকদিন থেকেই। ওকেই বিয়ে করব ঠিক করেছি। প্লিজ তুমি অমত কর না বাবা। প্লিজ মেনে নাও আমাদের।'

দু-মুহূর্ত চুপ থাকলেন ভদ্রলোক। তারপর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা শেখরের হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় ধরে বললেন— 'অমত করব কেন রে মা! এমন সৎ আর নিষ্ঠাবান ছেলেই তো তোর পাশে আমি চেয়েছিলাম। পয়সা কড়ি দিয়ে তোর বাবা মানুষকে বিচার করে না সেটা তুই আজও বুঝলি নারে!'

বুকের ভিতর থেকে মস্ত বড়ো একটা পাথরের বোঝা যেন নেমে গেল রাইমার। কিন্তু ওর যতটা খুশি হবার কথা তা যে আজ হওয়া সম্ভব নয়। আর চোখের সামনে যে এখনও জ্বলজ্বল করছে কনকের সেই পোড়া মুখটা, ভালোবাসার পিপাসায় কাতর ওর চোখ দুটো। আর সেই মুখে মিশে

www.banglabookspdf.com

যাচ্ছে আর একটা অন্ধ, প্রেমহীন মেয়ের মুখ। অন্য একটা মুখও যেন আস্তে আস্তে ফুটে উঠছে এবার রাইমার চোখের সামনে। একটা সর্বহারা ছেলে, দু-চোখে যার প্রতিশোধের আগুন।

—'ভগবান, আজ আর আমি একার সুখ চাই না গো। ভালোবাসা না পাওয়া ওই মানুষগুলোর আত্মাকেও তুমি শান্ত কর ঠাকুর। কনক, করুণা, রবি ওরা সবাই যেখানেই থাকুকু যেন ভালো থাকে। একটু ভালোবাসা, একটু উষ্ণতা খুঁজে ফিরে আর যেন কোনোদিন মরতে না হয় কাউকে ওদের মতো।' নিজের মনেই অস্ফুটে প্রার্থনা করল রাইমা।

—

[পঞ্চ ব্যাঞ্জন আহুতি সম্পূর্ণ কাল্পনিক তত্ত্ব। গল্পের প্রয়োজনে এই কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।]

—

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

বাসন্তী স্পর্শ

১

—'এইবার শুরু হচ্ছে সেকেন্ড ব্যাচের অঞ্জলি। যারা যারা অঞ্জলি দেবেন এইদিকে এগিয়ে এসে ঝুড়ি থেকে ফুল নিয়ে নিন প্লিজ...' মাইক ছাড়াই বেশ গমগমে শোনাল অরণ্যের গলাটা। মাইক ছাড়াই মাইক ফিটিং গলা ওর। প্রতি বছরই তাই পাড়ার যে কোন পুজোর অঞ্জলিকালীন অ্যানাউন্সমেন্টের দায়িত্বটা ওকেই সামলে দিতে হয়। আর সরস্বতী পুজো তো বটেই। অরণ্য জন্ম থেকেই এই পাড়াতে। উত্তর কলকাতার এই দিকগুলোতে পাড়া কালচারটা এখনও বেশ ভালোভাবেই বিদ্যমান। তবে হ্যাঁ পুরোনো সব জিনিসই তো আস্তে আস্তে ভাঙনের পথে হাঁটছে পাশ্চাত্য ভাবধারার অবাধ অনুপ্রবেশে, তাই হয়তো একদিন এই ছোটো পাড়াটার সব মানুষগুলোর এই এক অদৃশ্য মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে থাকাটাও ইতিহাস হয়ে যাবে। কিন্তু অরণ্য ভাবতে চায় না সেই দিনটার কথা, ভাবতে পারে না। এই পাড়া, পাড়ার বন্ধুরা, একসাথে শীতকালে ক্রিকেট খেলা, পিকনিক করা, দল বেঁধে সরস্বতী পুজোর চাঁদা তোলা, প্যান্ডেল বেঁধে পুজো করা, ঠাকুর আনা, বিজয়ী সম্মিলনী, দূর্গাপূজার হইহই, কালীপূজার বাজি ফাটানো, একসাথে পাড়ার মোড়ে আড্ডা, মেয়েদের দেখে হাঁ করে ঝারি মারা সব রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে ওর। এগুলো বাদ দিয়ে অরণ্যর কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে নাকি! আর এখন... এখন তো এই পাড়াটাই ওর কাছে স্বর্গ, স্বপ্ন সব কিছু। তাকে দেখার পর থেকে অরণ্য কি ছাই আর নিজের মধ্যে আছে নাকি!

হ্যাঁ এই কয়েক মাস ধরে অরণ্যের যে কি হয়েছে সেটা ও নিজেই বুঝতে পারছে না। লেখাপড়ারও তেমন হনু না হলেও মেয়েদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হতে কোনোদিনই ওর তেমন অসুবিধা হয়নি, আর তার প্রধান কারণই ছিল ওর বেজায় সুন্দর চেহারাটা।' পেহেলে দর্শনধারী ফির ফি গুনবিচারি' এই প্রবাদটা বারবার সত্যি হয়েছে অরণ্যর কাছে। তাই ওর বাকি বন্ধুরা মেয়েদের নিয়ে যেমন হ্যাংলাপনা করে তেমনটা ওকে কোনোদিনই করতে হয়নি। মেঘ না চাইতেই জল যার জন্য সব সময় মজুত তার আর চাতক হবার কিই বা প্রয়োজন আছে।

—'এই অরণ্য দেখ রে, কে আসছে!' ওর নিজের ভেতর থেকেই কে যেন ছুঁড়ে দিল কথাটা আর অমনি ওর শরীরের সব কটা স্নায়ু টানটান হয়ে গেল ভরপুর উত্তেজনায়।

হ্যাঁ সে আসছে। বাসন্তী রঙের শাড়ি আর কপালে লাল টিপ। অরণ্যর মনে হল হঠাৎ বোধ হয় পৃথিবী তার কক্ষপথে স্থির হয়ে গেছে। বাতাস এক জায়গায় রুদ্ধ হয়ে গেছে। এক অসহ্য রকম ভালো লাগায় দমটা কেমন বন্ধ হয়ে গেল অরণ্যর। এত সুন্দর! এত সুন্দর কী করে লাগতে পারে

www.banglabookspdf.com

কোনো মেয়েকে! বসন্ত পঞ্চমীর সকালে মনে হচ্ছে যেন প্রকৃতির কোল থেকে টুপ করে খসে পড়েছে সদ্য ফোটা একটা পলাশ ফুল।

ভ্যাবলার মতো হাঁ করে ফুলের ঝুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অরণ্য। ভুলেই গেল সবাইকে অঞ্জলির ফুল বিতরণ করতে। সাক্ষাৎ বাগান যদি এসে কারো সামনে দাঁড়ায় তাহলে সে কি করে ঝুড়ি থেকে দু-চারটে কুচো ফুল বিলি করতে পারে! সে একদম অরণ্যর কাছ ঘেঁসে এসে দাঁড়াল দু-সেকেন্ডের জন্য। এক মুঠো ফুল তুলে নিয়ে হাতজোড় করে ডুবে গেল অঞ্জলির মন্ত্রে।

উফফ! ওই দু-সেকেন্ডেই যদি থেমে যেত পৃথিবীটা তাহলে বুঝি অরণ্যর সবটুকু পাওয়া হয়ে যেত। নিয়মমাফিক মন্ত্রোচচারণে চলছে বাগদেবীর অঞ্জলি। আজ প্রথমবার অরণ্য সমানে একমনে ডেকেই চলেছে শ্বেতপদ্মাসনাকে।

—'হে মা, আজকে তোমার পুজোর এই বিশেষ দিনে আমি যেন বিফল না হই মা।' আসলে অরণ্য ছোটোবেলা থেকেই পড়াশুনায় খুব একটা ভালো না। ছবি আঁকাই ওর নেশা। তাইতো মা বলেন—

—'বাবা গরিব বিধবার ঘরের শিবরাত্তিরের সলতে তুই, পড়ায় মন দে বাবা। ছবি এঁকে কি আর আমাদের মতো ঘরের ছেলেদের পেট চলে রে?' কথাটা হয়তো ঠিক, তবুও কে শোনে কার কথা। পেটে ভাত জুটছে দু-বেলা আরামসে, বন্ধু বান্ধব নিয়ে ফুর্তির জীবন, মেয়েদের কাছেও বেশ ভালোই পাত্তা আছে নিজের কার্ত্তিক মার্কা চেহারাটার জোরে। ব্যস! আর কি চাই। কে চাপ নেয় লাইফে। কিন্তু কার জন্য কি যে লেখা থাকে কে আর তা বলতে পারে।

—'জানিস ভাই এখন যেখানে যাচ্ছি সেখানে একটা দারুণ মেয়ে এসেছে।'

—'মানে?' চোখ কুঁচকে সেদিন মনোজের কথায় প্রশ্ন করেছিল অরণ্য।

—'মানে এখন তো আমরা সুবীর কাকুর বাড়িতে যাচ্ছি পুজোর চাঁদা নিতে। ওখানে একতলায় পুরোনো ভাড়াটেরা চলে গেছে। তার বদলে নতুন যে এসেছে তার যা একটা মেয়ে আছে না, পুরো খাসা জিনিস। মনে হয় মা দুর্গা ফুল অ্যাটেনশন দিয়ে পিসটাকে রেডি করেছে।'

প্রতিবারই পাড়ায় পুজোর চাঁদা নিতে বেরিয়ে বিভিন্ন বাড়ির আইবুড়ো মেয়েদের নিয়ে নানা আলোচনাই হয় ছেলেদের মধ্যে। কিন্তু এসব নিয়ে তেমন মাথা কোনোদিনই ঘামায় না অরণ্য। তাই সেদিনও মনোজের কথায় বেশি পাত্তা দেয়নি। কিন্তু সুবীর কাকুর ভাড়াটের বাড়িতে কলিং বেল টেপার পর সেদিন যে দরজা খুলেছিল তাকে দেখে ব্যোমকে গেছিল অরণ্য। ছবির বইয়ের বাইরেও যে এত সুন্দর মেয়ে থাকতে পারে তা ধারণা ছিল না ওর।

দুধ সাদা গায়ের রং, গোলাপি ফিনফিনে ঠোঁট, সরু ভুরু, টানা চোখ আর আকাশি সালোয়ার সব মিলিয়ে সেদিন সে সুনামির মতো আছড়ে পড়েছিল অরণ্যর বুকের ভিতর।

—'এই কিরে তুইও...' অরণ্যর অল্প হা হয়ে যাওয়া মুখটা দেখে সেদিন বলেছিল মনোজ।

—'শোন ভাই, ওর বাপটা পুরো হিটলারের জাতভাই। আর ওর দাদাটা পুরো খলনায়ক পার্ট টু। তাই বলছি শুধু দেখা ছাড়া আর কিছু ভুলেও ভাবিস না। দেখবি যত জ্বলবি, লুচির মতো ফুলবি।

www.banglabookspdf.com

তবে এ মেয়ে নিজেও বহুত সেয়ানা। কাউকে পাত্তা দেয় না।'

—'চুপ করবি তুই?' মনোজের ফালতু ফ্যাচ ফ্যাচ এক ধমকে থামিয়ে দিলেও নিজের মনকে সেদিনের পর থেকে আর বশে করতে পারেনি অরণ্য।

পাড়ার সব ছেলেই বলে ও নাকি খুব দেমাকি। ভুল করেও কোনো ছেলের দিকে একবার তাকায় না। কিন্তু অরণ্যর কি তাহলে সবটাই দেখার আর বোঝার ভুল? অরণ্যর সাথে যতবারই দেখা হয়েছে তার ততবারই ও খেয়াল করেছে যে মেয়েটার চোখ ছুঁয়ে যায় ওকে। ওর ওই গোলাপ পাপড়ি মার্কা ঠোঁটে কেমন যেন একটা হালকা মায়াবী হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায় প্রতিবার অরণ্যকে দেখার পর। না এসব কথা কাউকে বলতে পারেনি অরণ্য। কে জানে যদি সবটাই বোঝার ভুল হয়ে থাকে।

কিন্তু গত একসপ্তাহের ব্যাপারটা? হঠাৎ গত এক সপ্তাহ থেকে শুরু হয়েছে এক অদ্ভুত ব্যাপার। বারবার উড়ো ফোন আসছে অরণ্যদের ল্যান্ড ফোনে। ওপার থেকে কেউ কথা বলে না। চুপ থাকে। সে ওরা যতই হ্যালো হ্যালো করে গলা ফাটাক না কেন। মা তো ভারি বিরক্ত। কিন্তু গত পরশুদিন! ফোনটা বাজছিল অনেকক্ষণ। মা বাড়িতে ছিল না।

—'হ্যালো' গম্ভীর স্বরে ফোন তুলেছিল অরণ্য। মনেই হয়েছিল নির্ঘাত ওই উড়োফোনটা।

—'কি শুধু ঝাড়ি মেরে মেরেই কাটিয়ে যাবে নাকি পরের স্টেপেও এগোবে?' ফিনফিনে গলাটায় চমকে গেছিল অরণ্য।

—'কে? কে বলছেন?' কেঁপে গেছিল ওর গলাটা।

—'সরস্বতী পুজোর দিন সন্ধ্যাবেলা, রমেনদের ফাঁকা বাড়িটার পিছনে আমি থাকব। ঝাড়ির পরের স্টেপে এগোতে চাইলে চলে এসো। একা আসবে কিন্তু। জানোই নিশ্চয় সরস্বতী পূজাটাই বাঙালি ছেলে-মেয়েদের ভ্যালেন্টাইন ডে।' কট করে কেটে গেছিল ফোনটা আর বুকে হাজার সুনামির তোলপাড় নিয়ে ধপ করে বসে পড়েছিল অরণ্য। গলাটা কার... কেউ কি মজা করছে ওর কোনো বন্ধুই কি? মেয়েরা ওর প্রতি বেশ মনোযোগী হয় ঠিকই তবে এভাবে ফোন! হঠাৎ মনের কোণে উঁকি দিয়েছিল সেই ভাবনাটা। আচ্ছা সে নয়তো? ইদানীং কালে তাকে ছাড়া আর কার দিকেই বা তাকিয়েছে অরণ্য যে ঝাড়ি মারার প্রশ্ন উঠবে। গোটা এক সপ্তাহ ঘুমাতে পারেনি অরণ্য। ফাইনালি এসেছে সেই দিন আজ। উফফ! কখন যে সন্ধ্যা হবে!

অঞ্জলি শেষ। ফুল ছিটিয়ে মণ্ডপ ছেড়ে সব বেরোচ্ছে একে একে। আবার! আবার তার চোখে চোখ পড়ল অরণ্যর। আবার সেই এক দৃষ্টি আর হাসি। উফফ!

—'দাদাবাবু... পুরুত মশাই এসে গেছেন।' বারিনের ডাকে একলাফে বিশ বছরের পুরোনো অতীত ছিঁড়ে বাস্তবে এসে নামলেন অরণ্য বসু রায়।

—'হ্যাঁ আসছি বসতে বল।' অরণ্য বাবু একাই থাকেন। সঙ্গী শুধু এই বারিন। বিয়েটা আর করে ওঠা হয়নি। মা মারা যাবার পর থেকেই সেই পুরোনো ডেরা আর পাড়া ছেড়ে বাস এই নতুন ঠিকানায়। এখন এই আঁকার স্কুল আর এখানকার বাচচারাই অরণ্য বসু রায় এর জীবন। চল্লিশ ছুঁই

www.banglabookspdf.com

ছুঁই অরণ্য ঘোর বাস্তববাদী আর গম্ভীর মানুষ। কিন্তু আজও এই সরস্বতী পূজার গন্ধটা কেমন যেন মনে কেমন করিয়ে দেয় আপাত গম্ভীর লোকটার। যদিও আজ কাল তো সব বড়োই মেকি, সেই আগের মতো কিছুই নেই আর। কিন্তু এই আঁকার স্কুলে আজও বড়ো করে সরস্বতী পূজাটা চালু রেখেছেন অরণ্য।

প্রতিবার এই সরস্বতী পূজাটা এলেই অরণ্য যেন আবার ফিরে যান সেই পুরোনো সময়টায়। একটা অকৃত্রিম ভালো লাগা নিমেষের জন্য হলেও ভর করে ওকে। কিন্তু তারপরেই... তারপরেই ভেসে ওঠে সেই দৃশ্যটা।

মেয়েটাকে প্রায় হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে ট্যাক্সিতে তুলছে ওর বাবা আর দাদা আর দূরে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ছেলে যে বুঝতে পারছে আস্তে আস্তে অন্ধকার এবার ছেয়ে ফেলবে তার জীবন।

২

রমেনদের ফাঁকা বাড়িটার পিছনে একলা দাঁড়িয়ে গোধূলির আলো গায়ে মেখে নিচ্ছিল মোহর। বুকের ভিতর একটু একটু ধুকপুকুনি আর অনেকটা উত্তেজনা মিশে কেমন যেন অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে ওর। কে জানে ঠিক করছে কি না ও। কিন্তু ও যে সত্যি বড্ড ভালোবেসে ফেলেছে তাকে দূর থেকে দেখতে দেখতেই। কিন্তু সে এখনও আসছে না কেন? আসবে না নাকি? সবাই বলছিল আজ নাকি ওকে অসাধারণ সুন্দর লাগছে। মোহর জানে ও খুব সুন্দরী। প্রতি বছরই সরস্বতী পুজোর দিনে সাজগোজ করে ওর সেই সৌন্দর্যে আলাদা মাত্রা যোগ হয়। কিন্তু এইবার এর এই সরস্বতী পুজোর দিনটার তো ব্যাপারই আলাদা। তাই খুব যত্ন নিয়ে নিখুঁত ভাবে সেজেছে ও আজ। কিন্তু যার জন্য এত কিছু সেই যদি...

মোহরের মনটা বারবার এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। উড়ে উড়ে যাচ্ছে তাকে চেনার জানার সেই শুরুর দিকের সময়টাতে। এই তো কয়েকমাস আগেরই কথা ছিল—

—'মোহর, এই মোহর... মোহর...' রিমিদি'র বাজখাঁই চিৎকারে অঙ্কের খাতা থেকে মুখ তুলল মোহর। রিমিদি সুবীর কাকু মানে ওদের বাড়িওয়ালার মেয়ে। এই বাড়িতে সবে কয়েক মাস হল এসেছে ওরা। আর আসতেই ওর খুব ভাব হয়ে গেছে রিমিদের সাথে, যদিও রিমিদি ওর থেকে বছর কয়েকের বড়ো। ওর বিয়ের কথা চলছে এখন।

—'কী হয়েছে রিমিদি?'

—'আরে! তুই এখনও এখানে কী করছিস? বিজয়া সম্মিলনীর ফাংশানে যাবি না?'

—'না রিমিদি। আমি গান, নাচ, আবৃত্তি কিছুই পারি না। তাই আমি গিয়ে কী করব বল। তা ছাড়া বাবা অনেক অঙ্কের টাস্ক দিয়ে গেছে।'

—'আরে নাচ গান পারিস না তো কি হয়েছে তুই এমনি চল। তা ছাড়া তুই তো সুন্দর আঁকিস তোর আঁকা দে।'

—'বিজয়া সম্মিলনীতে আঁকা? মানে?'

www.banglabookspdf.com

—'আরে হ্যাঁ রে যেখানে ফাংশান হচ্ছে, তার পিছনেই ছোটো একটা জায়গা ঘিরে আমাদের অরণ্য এর আঁকার এক্সিবিশন করছে পাড়ার কাকুরা। অরণ্য আমাদের পাড়ার একমাত্র মাইকেল অ্যাঞ্জেলো কিনা... তা সেখানেই না হয় তুইও... চল চল দেখবি চল। তোর দেখতে ভালো লাগবে। আরে শিল্পীর কদর তো শিল্পীই বোঝে।'

ওর হাত ধরে সেদিন হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেছিল রিমিদি। আসলে মোহরও আঁকতে খুব ভালোবাসে। লুকিয়ে লুকিয়ে আঁকেও মাঝে মাঝে। অদ্ভুত একটা আনন্দ হয় গোটা একটা ছবি তৈরি হয়ে যাবার পর। সাদা খাতার পাতায় নিজের মনের ভাবনা আর রং তুলির আঁচড়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করার আনন্দই আলাদা।

কিন্তু বাড়িতে মা ছাড়া কেউ জানেন না ওর এই আঁকার বাতিকের কথা। বাবা জানলে খুব রাগ করবেন। এই সব অর্থহীন বিলাসিতা বাবার পছন্দ না।

—'উফফ! ছবিগুলো কি দারুণ গো রিমিদি। বিশেষ করে মডার্ন আর্ট এর থিম আর ভাবনাগুলো অসাধারণ। পুরো পেশাদার লেভেলের। এত ভালো কে আঁকে গো?'

—'ওই তো অরণ্য। আমাদের পাড়ার গ্রেট শিল্পী।' রিমিদি সেদিন যে ছেলেটাকে আঙুল তুলে দেখিয়েছিল তাকে দেখে একটু চমকে গেছিল মোহর। বাদামী টি-শার্ট আর ছাই রঙের জিন্স পরা ওই ছেলেটাকে তো ও চেনে। এ আবার এমন আঁকতেও পারে! এই হ্যানডু মার্কা ছেলেটাই তো সেদিন ওদের বাড়িতে দুর্গা পূজার চাঁদা চাইতে গিয়ে হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়েছিল। পুজোর প্রায় সব দিনেই মোহর লক্ষ্য করেছিল ছেলেটা নিখুঁত ভাবে ঝাড়ি মারছে ওকে। মোহর এমনিতে এই সব ঝারিবাজদের পাত্তা না দিলেও একে বেশ ভালোই লেগেছিল কেন কে জানে। বোধ হয় এই ছেলেটারই সেদিন পাড়ার মোড়ে পড়ে থাকা ওই বুড়ি ভিখারিটা বমি করছে দেখে ওকে ওষুধ খাওয়ানোর দৃশ্যটা দেখে মোহরের ভালো লেগে গেছিল। এই ছেলেটা আবার এত ভালো আঁকে?

সেদিনের পর থেকেই মোহরের মনটা বেশ বেয়াড়াপনা শুরু করেছিল। আর ও ছেলেও তো আর কম না। যখনি যেখানে দেখা হচ্ছে হাঁ করে মন্ত্র মুগ্ধের দৃষ্টি ছুঁড়ে দিচ্ছে মোহরের দিকে। এদিকে আবার তার মেয়ে বন্ধুরও শেষ নেই।

সে তো মোহরকে কিছু বলবে না বুঝে গেছিল মোহর। এদিকে ওর সাথে প্রেম করার ইচ্ছাটাও আর চেপে রাখতে পারছিল না ও। তাই নিজেই ফন্দি বের করেছিল একটা। সেই ফন্দি মতোই প্রথমে ওর বাড়ির ফোন নম্বর জোগাড় করে শুধু ব্ল্যাঙ্ক কল, আর অবশেষে নিজের পরিচয় গোপন রেখে এই অভিসারের আমন্ত্রণ। কিন্তু সে আসবে তো?

হঠাৎ একটু চমকে উঠল মোহর। হ্যাঁ সে আসছে। এগিয়ে আসছে এদিকেই। মোহরের বুকের ভিতর যেন দামামা বাজছে এবার। ও ভীষণ রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে। প্রেম তো দূর, কোনোদিন কোনো ছেলের সাথে ভালো করে কথাই বলেনি; শুধু বন্ধুদের মুখে তাদের প্রেমের আর প্রেমিকদের গল্প শুনতে শুনতে নিজের মনের মানুষের ছবি সাজিয়েছে নিজেরই হৃদয়ের ক্যানভাসে। আর সেই ছবিটাই কেমন যেন মিলেমিশে এক হয়ে গেছে আজ অরণ্য বলে এই ছেলেটার সাথে।

www.banglabookspdf.com

অরণ্য এসে থমকে দাঁড়াল এবার। ভেবলে যাওয়া আর হাঁ করা মুখ নিয়ে তাকিয়ে আছে মোহরের দিকে। যেন সব কথা হারিয়ে গেছে ওর।

কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে মোহরই মুখ খুলল—

—'আমায় আশা করনি বুঝি? অন্য কাউকে আশা করেছিলে? এমন কেউ যাকে খুব পছন্দ তোমার? আমায় পছন্দ নয় তাই তো?'

—'না মানে... আসলে...' কথা জোগাচ্ছে না ছেলেটার মুখে।

—'তাহলে কি? শোন আমার তোমাকে ভালো লাগে। সেটা বলতেই ডেকেছি আজ। জানি না তোমার আমায় ভালো লাগে কি না...'

—'লাগে... আমারও তোমায় খুব ভালো লাগে মোহর। মানে আমি তোমায় ভালোবাসি মোহর।' অরণ্যর কথাটা বলার ধরনে এবার হেসে ফেলল মোহর। সেই দেখে যেন আর ও ঘাবড়ে গেল ছেলেটা।

মোহর এবার ছুটে গিয়ে দু-হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল অরণ্যকে। অরণ্যও আস্তে আস্তে আঁকড়ে ধরেছে মোহরকে। একটা ফিকে আলোর বাসন্তী বিকেল আর পলাশ ফুলের গন্ধ সেই সাথে একটু দূর থেকে মাইকে ভেসে আসা বাংলা ছবির গান— এই নিয়েই শুরু হয়ে গেল প্রেমটা। অরণ্য আর মোহরের ভালোবাসার গল্প।

বিচ্ছিরি ক্যাঁচক্যাঁচ করে ব্রেক কষল ওলাটা। ঝাঁকুনিতে কেঁপে গেলেন মোহর দত্ত। বহু বছর পর আবার এই সরস্বতী পূজার গন্ধ স্পর্শ করছে মোহরকে। তাই হুড়মুড় করে অতীত মনের জানলার কাঁচ ভেঙে আছড়ে পড়ছে হৃদয়ে। মোহর দত্ত বেঙ্গালোরেই থাকেন। একটা নামি কর্পোরেট কোম্পানির উচ্চপদে আসীন। একা। হ্যাঁ মোহর একদম একা। বাবার পছন্দে বিয়ে করেছিল ও। কিন্তু সে বিয়ে টেকেনি। তারপর থেকে ওই কেজো শহরে কাজ নিয়ে একা থাকতেই ভালোবাসে ও। বাবা মা-ও আর নেই এখন। আর দাদা বউদির সাথে তো ওর কোনোদিনই বনে না। আজ বেশ অনেকগুলো বছর পর কলকাতায় এসেছে। রুমলি আর চিনির কথায়। রুমলি মোহরের বেস্ট ফ্রেন্ড সেই কলেজ থেকে আর চিনি ওর মেয়ে। ওরা আগে বেঙ্গালোরেই থাকত। সম্প্রতি ফিরেছে এখানে। চিনিকে ও বড্ড ভালোবাসে আর চিনিও ওকে। সেই চিনিরই দশ বছরের জন্মদিনে না এসে কি আর উপায় আছে মোহরের। তা যে যতই কাজ থাক। কাল জন্মদিন মেয়েটার। তাই আজ চিনিকে নিয়ে বেশ করে শপিং করবে ও। কিন্তু আজ এই সরস্বতী পূজার দিনে আবার এই কলকাতার গন্ধ আর না পেলেই বোধ হয় ভালো হত। হলুদ শাড়ি আর পাঞ্জাবি, হাতে হাত চোখে চোখ উনিশ কুড়ি গুলো যে ওকে বারবার ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিশ বছর আগে। ও যে সত্যি আর মনে করতে চায় না ওই মেরুদণ্ডহীন, কাপুরুষ কীটটাকে। কেন যে মনটা এত অবুঝ!

এই কাপুরুষটাকেই ভালোবেসেছিল একদিন মোহর। ভিক্টোরিয়ার মাঠে বসে প্রথম চুমু খেয়েছিল, হাতে হাত রেখেছিল। ছ-ছটা মাস প্রেম করার পরেও কি মোহর নিজের হয়নি তার? না হয়নি নিশ্চয়। তাহলে কি সেদিন বিনা প্রতিবাদে সে মোহরকে ওভাবে হারাতে পারত? না পারত না। কিছু

www.banglabookspdf.com

একটা করতই? মোহরের চোখের একলক্ষ আকুতিকে এভাবে নস্যাৎ করে দিতে সে পারত না সেদিন।

—'ম্যাডাম আ গেয়া।' ওলা ড্রাইভারের ডাকে আবার বাস্তবে ফিরলেন মোহর দত্ত। ভাড়া মিটিয়ে নেমে এলেন রাস্তায়। হ্যাঁ এই তো সবুজ সাথী ক্লাব। এর দুটো বাড়ি পরই তো বলল রুমলি। আসলে প্ল্যানটা মোহরেরই বানানো। চিনির এখানেই আঁকার স্কুল। আজ কি সব ফাংশান আছে এখানে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে। তাই চিনিকে এখান থেকে পিক করেই সোজা ও চলে যাবে শপিং এ। উফফ! না। এই বসন্ত পঞ্চমীর বাসন্তী বিকেলের বাতাসটা আর গন্ধটা নিতে পারছে না মোহর। এবার তাড়াতাড়ি চিনিকে পিক করে নিয়েই দৌড় লাগাতে হবে ওকে মেকি শৈত্য ঘেরা, কাঁচ ঘেরা আধুনিক শপিং মলের জঙ্গলে।

—'ও স্যার, চলো না যাবে না।' ...আবার সেই একই বায়না আরাত্রিকার।

—'তুই যা বাবু, আজ আমার সত্যি কাজ আছে। পরে না হয় অন্য দিন...'

—'ধুর পরে অন্যদিন কি আর সিন্ডারেলা আন্টি আসবে নাকি আমার! সিন্ডারেলা আন্টি তো বেঙ্গালুরুতে থাকে। একা একা। জানো তো সিন্ডারেলা আন্টির কেউ নেই। খুব কষ্ট ওর। তাও তুমি যাবে না একবার?' এবার মুখ ভার আরাত্রিকার।

—'আচ্ছা চল। একবার দেখা করে আসি।' অরণ্য এবার পা বাড়ালেন ছাত্রীর পিছু পিছু। আসলে এই মেয়েটাকে বড্ড ভালোবাসেন অরণ্য বসু রায়।

নিজের ছবির দুনিয়া আর নিজের হাতে গড়া 'জলছবি' এই দুই নিয়েই এখন অরণ্যর জীবন। এই অঙ্কন একাডেমির প্রতিটা ছাত্র ছাত্রীকেই খুব ভালোবাসেন অরণ্য। তবুও কেউ কেউ একটু বেশি প্রিয় তো হয়েই যায়, যেমন এই আরাত্রিকা। নতুন ছাত্রী হলেও বড্ড মায়া পড়ে গেছে মেয়েটার ওপর।

প্রতি বছরের মতো এবারও সরস্বতী পূজা উপলক্ষে 'জলছবি'তে বেশ কিছু অনুষ্ঠান আর খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা রেখেছিলেন অরণ্য। এই আরাত্রিকা আজ এসে থেকেই বায়না জুড়েছে সকাল থেকে তার কোন সিন্ডারেলা আন্টি নাকি আসবে আজ তাকে নিতে, তার সাথে একবার দেখা করতেই হবে অরণ্যকে।

সিঁড়ি দিয়ে খটখট করে নামছিলেন অরণ্য। শেষের স্টেপে এসে হঠাৎ কেমন স্থবির হয়ে গেল পা। কে দাঁড়িয়ে সামনে। সে! এত বছর পর আজ এখানে এভাবে...! সব গুলিয়ে যাচ্ছে অরণ্যর। হাঁটু দুটো কাঁপছে।

ধাঁ করে অনেক পুরোনো কিছু দৃশ্যের কোলাজ ফুটে উঠছে চোখের সামনে।

উনিশ বছরের অরণ্য আর তার সামনে তার স্বপ্ন। অরণ্য তার হাত ছুঁয়ে বসে আছে কফি হাউসে। উফফ! অসাধারণ অনুভূতি। কেমন যেন স্বপ্ন আর বাস্তবের মিশেল লাগছে সবটা। সত্যি তাহলে মোহর আজ শেষ পর্যন্ত অরণ্যর ক্যানভাসেরই ছবি! না বিশ্বাসই হয় না যেন মাঝে মাঝে।

ষোল বছরের মেয়েটা অনেক কথা বলে চলেছে হাবিজাবি। সব মাথায় ঢুকছেও না অরণ্যর। ও তো শুধু ডুবে আছে ওই দীঘির মতো গভীর আর স্বচ্ছ চোখ দুটোতে। ও তো শুধু কয়েদ করতে

www.banglabookspdf.com

চাইছে মোহরের ওর হাত ছুঁয়ে থাকা মুহূর্তটাকে নিজের হৃদয়ের মধ্যে।

—'এই তুই মোহর না? মৃণালের বোন না তুই?' হঠাৎ ছন্দপতন। ওদের টেবিলের সামনে হঠাৎ এগিয়ে এসেছে রুক্ষ আর কঠিন চেহারার দুটো ছেলে।

মোহরের মুখ পলকে শুকিয়ে আমসি।

—'কে দাদা আপনারা?' বেশ তেজ নিয়েই বলল অরণ্য।

—'ওরা আমার দাদার বন্ধু।' উত্তর এল মোহরের কাছ থেকে।

ছেলেগুলো একটা অদ্ভুত দৃষ্টি হেনে চলে গেল এবার। সাথে সাথে মোহরও প্রায় ছুট লাগাল।

—'আমি আসি আজ। মনে হয় আজ আমার কপালে খুব দুঃখ আছে।'

না অরণ্য তখনও জানত না এই মোহরের শেষ কথা ওর জন্য। ও তখনও জানত না পরিস্থিতি ঠিক কতটা খারাপ হতে চলেছে। ওর জীবনে যে অন্ধকার নামতে চলেছে সেটা সেদিন রাতে প্রথম বুঝেছিল ও।

রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ হঠাৎ দরজার ধাক্কা। মা তো মারাত্মক ভয় পেয়ে গেলেন। দরজা খুলে অরণ্য দেখল বেশ ষণ্ডা টাইপ কয়েকটা ছেলে।

—'এই শোন মৃণালের বোনের সাথে একদম বেশি বাড়াবাড়ি করার চেষ্টা করবি না বুঝলি। মেরে পুরো তোর মুখের জিয়োগ্রাফি পাল্টে দেব শয়তান। বেশি হিরোগিরি দেখাবে কি মরবে... বুঝেছ?'

—'একী! কে আপনারা? এভাবে কথা বলছেন কেন?'

অরণ্যর কথার উত্তর না দিয়ে গলা তুলে তারা বলল—

—'শুনুন মাসিমা ছেলেকে সামলান। ভুল জায়গায় হাত দিয়েছে এবার। মোহরের দিকে আর তাকালে ওকে আর ছবি আঁকতে হবে না, আমরাই ছবি করে আপনার দেওয়ালে টাঙিয়ে দেব ওকে।'

যেমন হুড়মুড় করে এসেছিল ওরা, তেমনি হুড়মুড় করে চলে গেল।

ঘরের ভিতর এসে অরণ্য দেখেছিল অপমান আর আতঙ্কে কালো হয়ে গেছে মায়ের মুখ। সেদিন আর একটাও কথা বলেনি মা। সোজা নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

অরণ্যও নিজের বিছানায় শুয়ে খানিকক্ষণ ছটফট করে ঘুমিয়ে পড়েছিল একসময়।

—'অরণ্যদা, অরণ্যদা সর্বনাশ হয়ে গেছে জান।' ভোর হতেই ঘুম ভেঙেছিল পাড়াতুতো ভাই সমীরের ডাকে।

ধড়মড় করে উঠে বসেছিল অরণ্য।

—'কী হয়েছে বল?'

—জানো মোহরদি-কে জোর করে ওর বাবা আর দাদা অনেক দূরে ওর পিসির বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছে। তুমি শিগগির চল। কিছু একটা কর। মোহরদি পাগলের মতো কাঁদছে।'

—'হ্যাঁ এখুনি চল।' বেরোচ্ছিল অরণ্য।

—'শুনে যা...' মায়ের গম্ভীর গলায় বেরোতে গিয়েই থমকে গেছিল অরণ্য।

www.banglabookspdf.com

—'যদি তুই মোহরকে আটকাতে একটা কিচ্ছু করিস তাহলে জানবি মরা মুখ দেখবি তুই আমার। শেষ করে দেব আমি নিজেকে যদি আর কোনো ঝামেলায় নিজেকে জড়াস তুই।'

—'মা একী বলছ তুমি?' আর্তির মতো করে বলেছিল অরণ্য। কিন্তু মা ততক্ষণে ঘরে ঢুকে দরজা আবার বন্ধ করে দিয়েছে।

অরণ্য ঘর থেকে বেরিয়েছিল ধীর পায়ে। মোহরদের বাড়ির সামনে গিয়ে দেখেছিল হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে ওকে ট্যাক্সিতে তুলছে ওর বাবা আর দাদা। অঝোরে কাঁদছে মেয়েটা। অরণ্যকে দেখেই চিকচিক করে উঠেছিল ওর চোখ, একটুকরো ভরসার আশায়।

কিন্তু না। ও তো সেদিন দেখতেই পায়নি অরণ্য বাঁধা ছিল অদৃশ্য শেকলে। তাই অরণ্যর চোখের সামনে থেকেই সেদিন চিরতরে হারিয়ে গেছিল মোহর।

—'স্যার এটাই আমার সিন্ডারেলা আন্টি।' আরাত্রিকার ডাকে আবার ফিরল অরণ্য থেকে অরণ্য বসু রায়।

এই তাহলে আরাত্রিকার সিন্ডারেলা আন্টি, যে একা আর খুব দুখী। কিন্তু কেন? কে দুঃখ দিতে পারল এমন সোনার প্রতিমাকে। বয়সের ভারে অল্প স্থুল আর চুলে দু-একটা রুপালী রেখা লেগেছে বটে, কিন্তু এখনও যে কোনো লোকেরই চোখ ফেরানো দায় হবে। সিন্ডারেলা! একদম ঠিক নাম দিয়েছে ওর আরাত্রিকা। সত্যি যেন রূপকথার গল্প থেকে উঠে আছড়ে পড়েছিল সে অরণ্যর জীবনে।

তার চোখে কি জল চিকচিক করছে? নাকি অরণ্যর দেখার ভুল এটা?

—'মোহর... মোহর... তুমি? মানে আমি...' সব কথা হারিয়ে গেছে অরণ্যর? ঠিক বিশ বছর আগের এমনই একটা সরস্বতী পূজার বিকেলে যেভাবে সব কথা হারিয়ে ফেলেছিল অরণ্য।

মোহর বোধ হয় এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না নিজেকে। কোনোভাবে কান্না চাপছে দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

—'কেমন আছ? বউ বাচ্চা নিয়ে বেশ সুখে আছ তাই না?'

—'না। সুখ কি করে পাব বল। সুখ তো বিশ বছর আগেই আমায় ছেড়ে চলে গেছিল আর আমি তাকে আটকাতেও পারিনি অদৃশ্য এক শেকলে আটকা পরে। যাক সে কথা, আমি জানি তুমি আমায় ঘেন্না কর। আমায় মেরুদণ্ডহীন ভাব। আমি হয়তো সত্যি তাই। সেই জন্যই তো আজও একা বসে প্রতিটি রাতে শুধু নিজের মনকে খুঁড়ি আর বারবার হতাশায় আছড়ে পড়ি। কিন্তু তবুও আমি... মানে আমি...' গলা বুজে গেছে এবার অরণ্যর।

মোহরের চোখের সামনে ফুটে উঠছে আস্তে আস্তে একটা মুখ। বিশ বছর ধরে ওর মনে বারবার উঁকি মারা একটা মুখ, যে মুখটা অযত্নে, হতাশায় আজ পুরোপুরি বিধ্বস্ত।

—'ভেতরে আসবে না? আমার ঘরে লক্ষ্মী এসে ধরা না দিলেও সরস্বতীকে এনে পূজা করি প্রতিবছর।' অরণ্য বলল কাঁপা গলায়।

আরাত্রিকা মানে চিনি খুব অবাক হয়ে দেখছে দুজনের দিকে।

www.banglabookspdf.com

—'চল।' ছোটো করে বলল মোহর। কিন্তু ঢুকতে গিয়েই চৌকাঠে আটকে গেল পা-টা। আসলে শাড়ি পরার অভ্যাসটা চলে গেছে তো। পড়েই যাচ্ছিল মোহর। কিন্তু তক্ষুনি... তক্ষুনি এসে হাত ধরে ওকে সামলে নিল ওর জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া সেই ছেঁড়া পাতাটা, যে পাতাটায় লেখা ছিল মোহরের প্রেমের গল্পটার শেষ লাইনগুলো। আস্তে আস্তে কোথা থেকে যেন ঢুকে পড়ছে নাম না জানা ফুলের গন্ধ। কেমন যেন বসন্ত বাতাস এর অস্তিত্ব টের পাচ্ছে প্রাণের ভেতর মোহর। আর অরণ্য? অরণ্য বুঝতে পারছে হ্যাঁ বসন্ত পঞ্চমীটাই বাঙালির সত্যিকারের ভ্যালেন্টাইন ডে। ভালোবাসাকে নিজের করে পাবার দিন। ভালোবাসার তো কোনো বয়স হয় না, সময় হয় না। ভালোবাসা তার নিজের নিয়মেই চিরসবুজ। তাই আজ আবার ওদের বাসন্তী রঙে রঙিন হবার দিন। পুরোনো রং-কে ফিরে পেয়ে সেজে ওঠার দিন।

অরণ্য দেখতে পাচ্ছে ওর মনের ক্যানভাসে ফুটে উঠেছে একটা ছবি। পলাশ রঙের শাড়ি পরে একটা মেয়ে আর হলুদ পাঞ্জাবি পরা একটা ছেলে বসে রয়েছে একে অপরের হাত ছুঁয়ে। তাদের চুলে রূপালী রেখা, কিন্তু হৃদয় জুড়ে অনন্ত সবুজের ছড়াছড়ি।

—

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

ধূসর অনুভূতিরা

১

তারিখ: ২৫ মে

লিলির কথা

সুলেখা ম্যাডামের লেকচারের বিন্দু বিসর্গও কানে ঢুকছিল না লিলির। ভীষণ উশখুশ করছে মনটা, বার বার চোখ চলে যাচ্ছে ঘড়ির দিকে। ক্লাসটা শেষ হলেই আগে গিয়ে একবার খোঁজ নিতে হবে অভীকের। আজ তিনদিন হল অভীক আসছে না কলেজে। কি যে হল ছেলেটার কে জানে! ও তো এমন হুট হাট করে কামাই করে না। কাল দু-বার ফোন ও করেছিল লিলি। কিন্তু ধরেনি ও। কল ব্যাকও করেনি। একদম ভালো লাগছে না লিলির। এমনিতেই অভীকের সাথে একদিন দেখা না হলেই ওর ভীষণ অস্থির লাগে সেখানে এভাবে তিন দিন কোনো খবর নেই...। তবে এই তিন দিনে একটা জিনিস বুঝতে পেরেছে লিলি। ও বেশ বুঝতে পেরেছে যে এখন ও অভীককে সত্যি খুব ভালোবেসে ফেলেছে। তাই অনেক হয়েছে এই মনের কথা চেপে রাখা। এবার ও মনের কথা জানিয়েই দেবে দু-বছর সিনিয়র ছেলেটাকে।

লিলি আবার ঘড়ি দেখল। ক্লাসটা শেষ হতে আর মিনিট সাতেক বাকি আছে। আনমনে জানলার বাইরে চোখ ফেরাল লিলি। বাইরে করিডোরের প্যাসেজ থেকে ঝট করে সরে গেল একটা লাল টি-শার্ট। কেউ কি লুকিয়ে দেখছিল লিলিকে বাইরে থেকে? কে? ওই লাল টি-শার্ট এর মালিক? ওরকম একটা লাল শার্ট তো অভীকই পরে তাই না? তার মানে কি অভীকই? লিলির সারা শরীর জুড়ে যেন এক লক্ষ-প্রজাপতি উড়ে গেল। আর ঠিক তখনই ওর নাকে এসে ঝাপটা মারল খুব পরিচিত এক মুঠো মাস্কের গন্ধ। আর কোনো সংশয় রইল না লিলির। হ্যাঁ সে...। হ্যাঁ এটা সেই...। খুব কাছেই রয়েছে সে। লিলি দু-চোখ বন্ধ করে বড়ো করে নিশ্বাস নিল একটা।

কিন্তু... কিন্তু...। মাস্কের সুন্দর গন্ধটা আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে...। কেমন যেন বিটকেল গা গুলানো একটা গন্ধে বদলে যাচ্ছে গন্ধটা। কীসের গন্ধ এটা? চোখ খুলল ও।

উফফ! বাসে বসে বসেই চোখটা বুজে এসেছিল লিলির। আসলে শরীরটা বড্ড খারাপ আজ। এই বিদঘুটে গরম, চারপাশের উৎকট ঘামের গন্ধ তবুও তন্দ্রা এসে গেছিল। আর তার সাথে চলে এসেছিল অনেকগুলো বছর আগে হারিয়ে যাওয়া একটা দিনের স্বপ্ন।

এমনিতেই অফিস থেকে ডিরেক্ট এই বাসটা ধরে বাড়ি ফিরতে প্রায় সোয়া এক ঘণ্টা লেগে যায় লিলির। তার মধ্যে আজ আবার কি একটা রাজনৈতিক দলের মিছিল টিছিলের জন্য সেই সময়ের মেয়াদটা আরও বাড়ল। বাস যেন আর নড়ছেই না আজ। ঘামে ভিজে সপ সপ করছে লিলির

www.banglabookspdf.com

কুর্তিটা। আজ আসলে অফিস থেকে একটা হাফ ডে অফ নিয়েছে ও। মামা আর মামি আসবেন আজ ওদের ছেলের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে। অনেক দূর থেকে আসবেন ওরা। তাই রাতে ওদের ডিনার করে যেতে বলেছে লিলি। আর সেই জন্যই আজ অফিস থেকে একটা হাফ ডে অফ নেওয়া। অফিসের কথা মনে পড়তেই দাউ দাউ করে আবার মাথায় আগুন জ্বলে গেল। কি অকথ্য অপমান আজ করল ওকে প্রবীর দত্ত। বস হয়েছে বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে? গত সপ্তাহে জ্বরের জন্য দুটো ছুটি নিতে হয়েছিল লিলিকে এটাই যে লোকটার গায়ের জ্বালার আসল কারণ সেটা ভালোই জানে লিলি। কিন্তু বলার সময় সেটা একবারও বলল না। আঁতে ঘা দেওয়া যত রকম কথা হয় সেগুলোই বলল। লিলির পারফরমেন্স বাজে, টার্গেট রিচ করতে ও ফেল করে, ও ক্লায়েন্টের সাথে ঠিক ভাবে ব্যবহার করতে জানে না। ওকে রেখে কোম্পানির নাকি কোনো লাভই হচ্ছে না এই সব যত রকম বাজে কথা হয় আর কি...। অপমানে কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে লিলির। ঝাড়া দুটো বছর মন প্রাণ ঢেলে কাজ করার এই পুরস্কার! এই অফিসে কাজের জন্য বাবলার সাথেও কত বার ঝগড়া হয়েছে। বাবলা হয়তো অফিস থেকে ছুটি নিয়ে ঘুরতে যেতে বলেছে কিন্তু ও যায়নি। অফিসের বেশির ভাগ লোকই সারাক্ষণ প্রবীর দত্তকে গালিগালাজ করে আর অভিশাপ দেয়। কিন্তু লিলি তেমনটা কোনোদিনই করেনি। কারণ এসব জিনিস লিলির ঠিক ভালো লাগে না। যাই হোক, লোকটা পয়সা তো দিচ্ছে। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে যে সত্যি সবাই ঠিকই করে ওকে অভিশাপ দিয়ে। সব সময় উল্টো পাল্টা টার্গেট আর প্রেশার দিয়ে নরক করে দিয়েছে সবার জীবন আর লিলির তো বটেই। এর আগেও বহু বার উল্টো পাল্টা নানা অপমান করেছে লোকটা লিলিকে, কিন্তু এবারটার বুঝি আর তুলনা হয় না। নাঃ, যে ভাবেই হোক লিলিকে ছাড়তেই হবে প্রবীর দত্তের অফিস। না হলে ও পাগল হয়ে যাবে। ইচ্ছা তো লিলির করছিল আজই লোকটার মুখে ছুঁড়ে দিতে রেজিগনেশান। কিন্তু...। না, এমনিতে চাকরি লিলির না করলেও চলে। কারণ ওর বাবা যথেষ্ট ভালো ভাবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। একে তো লিলি খুব কেরিয়ারিস্ট আর ওর আত্মসম্মানও প্রবল। বরের টাকায় ফুটুনি বেশিদিন ওর পোষাবে না। আর সব চেয়ে বড়ো প্রবলেম হল বাবলার মা। ওই মহিলার সাথে এক ফোঁটাও বনে না লিলির। সব কিছুতেই লিলির খুঁত খুঁজে নিয়ে লিলির সমালোচনা করাটাই ওই মহিলার হবি। কিন্তু কে সেটা বোঝাবে বাবলাকে? সত্যি বাবলার মতো মায়ের ভেড়া জীবনে কোনোদিন দেখেনি লিলি। যাই হোক, এখন তবু চাকরির অজুহাতে বরের সাথে কলকাতায় ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকতে পারে ও। কিন্তু চাকরি না থাকলে তো নিশ্চয় ওকে বাবলাদের দেশের বাড়িতে গিয়ে মানে শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে থাকতে বলবে সবাই। আর মাতৃ ভক্ত বাবলা যে ওর মায়ের হ্যাঁ-তেই হ্যাঁ মিলাবে সেটা ভালোই জানা আছে লিলির। সত্যি, দিন দিন বাবলার সাথে সম্পর্কটা বড্ড বেশি খারাপ হয়ে যাচ্ছে পারিপার্শ্বিক নানা কারণে। ছোটো ছোটো ভালো লাগা, প্রাণের আরাম সব হারিয়ে যাচ্ছে একে একে। যান্ত্রিক অভ্যাসের মতো চলছে ওদের সম্পর্ক। আর সাথে উপরি পাওনা শুধু নিত্য দিনের ঝগড়া ঝাটি। আর তার জন্যই বোধ হয় পুরোনো দিনের কথা, কলেজের সেই অভীকের সাথে কাটান মুহূর্তগুলোর কথা বড্ড বেশি মনে পড়ছে আজকাল।

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

বাসটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে চলছে। কতক্ষণে পৌঁছাবে কে জানে! জৈষ্ঠ্যের প্রখর তাপ জ্বালিয়ে দিচ্ছে সবার শরীর।

পিনপিন করে লিলির ব্যাগের মধ্যে বেজে উঠল ওর মোবাইল। ফোনটা হাতে নিয়ে দেখল স্ক্রিনে ফুটে উঠেছে বাবলার ফোন নম্বর।

—'বল...' শুকনো গলায় বলল লিলি।

—'আমার আজ ফিরতে অনেক রাত হবে। আমার অফিসের একটা জরুরি কাজ আছে। তাই আমি বেরোতে পারব না।' রুক্ষ স্বর বাবলার।

—'তার মানে?' দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠল লিলি।

—'তুমি জান না আজ আমার মামারা আসবেন, ভাইয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন দিতে। তুমি থাকবে না মানে?'

—'আমার কিছু করার নেই লিলি। তুমি শোন...'

—'কী শুনব আমি?' কবে থেকে বলে রেখেছিলাম আমি আজকের দিনটার কথা? পারতে এটা তোমার মায়ের সাথে করতে? আমি বুঝেছি তোমার মা বারণ করেছে আমার মামাদের সাথে দেখা করতে...'

কেটে গেল ফোনের লাইন। বাবলা কেটে দিয়েছে। কান্না পেয়ে গেল লিলির। কী বাজে এই বাবলা! লিলির একটা কথারও কোনোদিন দাম দেবে না ও। শুধু মায়ের কথায় চলবে! না, সত্যি আর বাঁচতে ইচ্ছে করছে না লিলির। চোখের কোল বেয়ে অজান্তেই জল গড়িয়ে পড়ল ওর। পরমুহূর্তেই খেয়াল হল বাস শুদ্ধ লোক তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

না, শক্ত হতেই হবে ওকে। লড়াই করতে হবে একলাই এই নিঠুর, কঠিন দুনিয়াটার সাথে।

banglabookspdf.com

২

তারিখ: ২৫ মে

বাবলার কথা

দিন দিন বড়ো বেশি অসহ্য আর ইনসেনসিবল হয়ে উঠছে লিলি। নইলে কেউ রাস্তার মধ্যে এভাবে চেঁচায়? ফোনটা কেটে দেবার পরেও কান মাথা জ্বলছিল বাবলার। হ্যাঁ এটা ঠিক যে আজকের দিনটার ব্যাপারে অনেক আগে থেকেই বলে রেখেছিল ও, কিন্তু বাবলাই বা কী করবে? সব কিছু তো আর বাবলার হাতে নয়। অফিসের এম ডি-র মা মারা গেছে আজ হঠাৎ করে। কোম্পানির সিনিয়র পজিশনের সকলেই তাই যাচ্ছে আজই দেখা করতে, সেখানে বাবলা কীভাবে এড়াবে এটা? শঙ্খ চ্যাটার্জী লোকটা এমনিতেই যথেষ্ট খ্যাপাটে আর খামখেয়ালী। ছোটো ছোটো ব্যাপারে লোকটা যে কারো সম্বন্ধে যেকোনো ধারণা তৈরি করে নেয়, এমত অবস্থায় এই সেনসেটিভ একটা ইস্যুকে কি কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায়? আর লোকটার বাড়ি এতটাই দূরে যে গাড়িতে যাতায়াত করেও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরাটা অসম্ভব। কিন্তু লিলি এতটাই জেদি আর অবুঝ যে এসব ও

www.banglabookspdf.com

বুঝবে না। ও কোনো ভাবেই বুঝবে না যে আজ ও না গেলে এখানে ওর বিরুদ্ধে পলিটিক্স করার কত বড়ো সুযোগ পেয়ে যাবে রনেন্দ্র, জগমোহন এর মতো কলিগ শত্রুরা।

মনটা ভীষণ তিক্ত লাগছে বাবলার। লিলির সাথে সম্পর্কটা দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। হাজার চেষ্টাতেও যেন কিছু ঠিক হচ্ছে না। কোনো কিছুই বুঝতে চায় না ও। শুধু নিজের জেদ আর ইগো। না বাবলার অফিসের সমস্যা বোঝে না বাড়ির। মায়ের সাথে বিন্দুমাত্র বনিবনা নেই। সব সময় নানা অভিযোগ। কে জানে মা সত্যি কি ওকে কিছু বলে নাকি সবটাই ওর কল্পনা। এদিকে বউ আর মায়ের এই অশান্তির মাঝখানে পড়ে বাবলার যে সত্যি কি অবস্থা হচ্ছে তা যদি কেউ বুঝত। সব সময় লিলির একই অভিযোগ, বাবলা ওকে বোঝে না; কিন্তু লিলি নিজে কি আদৌ বোঝে বাবলাকে? কোনোদিন নিজের ভাবনার বাইরে এসে বোঝার চেষ্টা করে বাবলা কি চায়? সারাক্ষণ শুধু নিজের জগত নিয়েই তো ব্যস্ত ও। না, বাবলার আর কোনো গুরুত্বই বোধ হয় বাকি নেই ওর কাছে।

শঙ্খ চ্যাটার্জীর বাড়ির দিকে ছুটে চলা গাড়িটা হঠাৎ ব্রেক কষে থামল। সামনে একটু জ্যাম। গাড়ির এসিটাও চলছে না ঠিক ঠাক। তাই জানলার কাঁচ নামিয়ে দিল বাবলা। কাঁচ নামাতেই এক দলা গরম শুকনো বাতাস এর সাথে একটা দৃশ্য এসে ঝাপটা মারল ওর চোখে। চমকে উঠল বাবলা। একটা মেয়ে। রাস্তার ধারের ছোটো সিনেমা হলটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয় অপেক্ষা করছে কারোর জন্য। পরনে হালকা সবুজ সালোয়ার। গরমের শুকনো হাওয়ার দমকে খোলা চুল কপালের উপর উড়ছে এলোমেলো। গাড়ি থেকে মেয়েটার মুখ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু তবুও মেয়েটা যে হুবহু প্রিয়াঙ্কার মতো সেটা বুঝতে পারল বাবলা।

জ্যাম ছাড়তেই আবার এগিয়ে গেল গাড়িটা। মেয়েটা চলে গেল বাবলার দৃষ্টি সীমার বাইরে। কিন্তু বাবলা ভুলতে পারল না। মেয়েটা যেন অবিকল প্রিয়াঙ্কার ছায়া। এক লহমায় বাবলার চোখের সামনে যেন ভেসে উঠল অনেকগুলো পুরোনো ছবি। প্রিয়াঙ্কার সেই ছেলেমানুষি মাখানো ভালোবাসার স্মৃতি হঠাৎ যেন জেগে উঠছে হৃদয়ের প্রকোষ্ঠে বহু বছর পর। ঠিক এভাবেই প্রিয়াঙ্কা অপেক্ষা করত ওর জন্য বিকেলগুলোতে সিনেমা হল বা কফিশপে। বাবলার দেরি করে পৌঁছানোর পর ও কোনোদিন খুব বেশি বকত না ওকে। বাবলা একটু রাগ করতেই কেঁদে ফেলত ছোটো বাচচা মেয়ের মতো। সেই প্রিয়াঙ্কাই হারিয়ে গেল বাবলার জীবন থেকে। হারিয়ে গেল ওর ভালোবাসা। কিন্তু কেন? কেন প্রিয়াঙ্কা হারিয়ে গেল এভাবে? বাবলা তো অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু একের পর এক ভুল বোঝা বুঝি, প্রিয়াঙ্কার বদলে যাওয়া কেন হল এ সব? নাকি বাবলারও দোষ ছিল অনেকটাই? কোনো সম্পর্কই কি একা কারোর দোষে নষ্ট হয়?

টিং টিং.. টিং টিং... ম্যাসেজ টোনের শব্দে ভাবনায় ছেদ পড়ল বাবলার। মোবাইলের দিকে দৃষ্টি ফেরাল ও। অপ্রয়োজনীয় একটা ম্যাসেজ। কিন্তু মোবাইলে ফুটে ওঠা আজকের ডেটটার দিকে চুম্বকের মতো কেমন যেন দৃষ্টিটা আটকে গেল ছেলেটার। আজ ২৫ মে, শুক্রবার। তার মানে এই বছর আবার ২৭ মে রবিবার পড়ছে। আবার...। এত বছর পর সেই এক রকম...।

www.banglabookspdf.com

বাবলার মন এক লাফে পিছিয়ে গেল অনেকগুলো বছর আগে। একটা ভীষণ গরম জড়ানো একটা দিনের শেষে বিকেলের দিকে ছাদে বসে ছিল বাবলা। একটু ঠাণ্ডা হাওয়ায় জুড়িয়ে নিতে চাইছিল প্রাণটা। হঠাৎ থর থর করে কেঁপে উঠল ভাইব্রেশন মোডে রাখা মোবাইল যন্ত্র।

—'হ্যাঁ বল প্রিয়াঙ্কা...'

—'কি করছিস? ব্যস্ত?'

—'হ্যাঁ ভীষণ ব্যস্ত ছাদে বসে হাওয়া খেতে... হে হে...'

—'শোন খুব দরকারি কথা। অনেকদিন থেকে বলব ভাবছি কিন্তু কীভাবে বলব ঠিক বুঝতে পারছি না। আসলে আমি মানে আমি...'

—'আরে! এত কিন্তু কিন্তু করছিস কেন? বল না কী বলবি...'

—'মানে... আমি তোকে লাইক করি বাবলা, মানে ভালোবাসি বলতে পারিস। তুইও আমায় পছন্দই করিস যদি আমি খুব ভুল না বুঝে থাকি। কিরে তাই তো? প্রেম করবি আমার সাথে?'

খুব হতচকিত হয়ে গেছিল বাবলা সেদিন। তবে সাথে খুশিও হয়েছিল বেশ। না, প্রিয়াঙ্কার প্রেমে পড়ে ও খাবি খাচ্ছে এমন কোনো ব্যাপার নেই ঠিকই, কিন্তু প্রিয়াঙ্কাকে খারাপ ওর লাগে না। দেখতে খারাপ না, পড়াশুনাতেও ভালো। এই বাজারে প্রেমিকার চয়েস হিসাবে মন্দ কি!

—'হুম। এক কাজ কর। আজকের দিনটাকে আমাদের লাভ অ্যানিভারসারি হিসাবে মার্ক করে রাখ।' খুব ছোটো উত্তর দিয়েছিল বাবলা।

হ্যাঁ লাভ অ্যানিভারসারি। ২৭ মে দিনটা ছিল ওদের লাভ অ্যানিভারসারি। আচ্ছা, একবার নতুন করে ফিরে যাওয়া যায় না প্রিয়াঙ্কার কাছে? সব ভুল বোঝাবুঝিকে ভুলে নতুন করে কি একবার সব শুরু করা যায় না? প্রিয়াঙ্কা কি ফিরিয়ে দেবে? এই ২৭ মে কি আবার একবার নতুন করে শুরু করা যায় না?

মনের মধ্যে চোরা একটা স্রোতের কুলকুল টের পাচ্ছিল বাবলা। শুকনো, জ্বলন্ত দিনটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। সূর্য ঢলে পড়ছে পশ্চিমে। একটা স্নিগ্ধ বিকেল উঁকি মারছে আকাশের ফাঁক থেকে।

৩

তারিখ: ২৬শে মে

গভীর রাতের কালো চাদরে মুড়ে থাকা একটা শুকনো রাত। বিছানায় মুখ গুজে হাপুস নয়নে কাঁদছে লিলি। শেষ পর্যন্ত বিয়েটা ভেঙেই গেল ওর। আসলে বাবলার সাথে সম্পর্কের সুতোটা ঢিলে হয়ে গেছিল বেশ অনেক দিন থেকেই এটা ঠিক, কিন্তু তা বলে সেটা যে পুরোপুরি ভাবে ছিঁড়ে যাবে চিরতরে এত তাড়াতাড়ি সেটা ভাবেনি মেয়েটা। সব কিছুর জন্য ওই বাবলার মা'টাই দায়ী। সব সময় লিলির বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়ে বাবলার মাথাটা খারাপ করেছে ওই মহিলাই সেটা বেশ জানে লিলি। অবশ্য বাবলা নিজেও কিছু কম যায় না। কোনোদিনই ও লিলিকে ভালোওবাসেনি আর বোঝার চেষ্টাও করেনি। সব সময় শুধু লিলিকে ভুল বুঝে গেছে, নিজের মায়ের পক্ষ সমর্থন করে ওর সাথে ঝগড়া করে গেছে আর লিলিকে দোষারোপ করেছে স্বার্থপর বলে। একবারও ভাবেনি প্রবীর দত্তের

www.banglabookspdf.com

মতো একজন অত্যাচারী বসের আন্ডারে কাজ করাটা কত কঠিন, একবারও কোনোদিন জানতে চায়নি নিধি, নিশা আর অরিজিতদের নিত্যদিনের অফিস পলিটিক্স বাঁচিয়ে কাজ করাটা কত খানি শক্ত। কোনোদিন বুঝতেই পারেনি যে দিনের পর দিন অফিস করে এসে, ঘরের সব কাজ সেরে, পড়ার বইতে মুখ গুঁজে থাকার পর ও সরকারি চাকরির পরীক্ষাগুলোয় একের পর এক অসফল হবার যন্ত্রনা ঠিক কতখানি। কোনোদিন বোঝেনি বাবলার মায়ের করা প্রতিটা অসম্মানজনক কথা কতটা কষ্ট দেয় লিলিকে।

রাতের অন্ধকার চিরে ছড়িয়ে পড়েছে লিলির কান্না। চোখের জল যেন বাঁধ মানছে না কিছুতেই। সব শেষ হয়ে গেল! কেন যে কাল এত খানি মাথা গরম হয়ে গেল লিলির। কাল রাত দশটার পরে বাড়ি ফিরেছিল বাবলা। মামা মামিরা ততক্ষণে চলে গেছেন নিমন্ত্রণ করে। বাবলাকে দেখেই লিলির মাথায় যেন দাবানলের আগুন জ্বলে উঠেছিল। তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল ও।

—'কি মনে করে ফিরে এলে বাড়িতে? যেখানে আশনাই করতে গেছিলে সেখানের পিরিত শেষ হয়ে গেল বুঝি?' বিকট চিৎকার করে উঠেছিল লিলি।

বাবলা মেজাজ ঠিক রেখেছিল তখনও। শান্ত অথচ কঠিন স্বরে বলেছিল— 'না জেনে ভুল ভাল কথা বলবে না লিলি। আগে শোন কী ঘটেছিল...'

—'কী শুনব? যে মিথ্যাগুলো শিখিয়ে পাঠিয়েছে তোমার প্রেমিকা সেগুলোই শোনাবে তো? শুনব না আমি। বেরিয়ে যাও তুমি আমার চোখের সামনে থেকে...। দেখতে চাই না আমি তোমার মুখ...।' হিস্টিরিয়া রোগীর মতো চিৎকার করে উঠেছিল লিলি। আর কথা বাড়ায়নি বাবলা। বেরিয়ে গেছিল বাড়ি ছেড়ে। আর ফিরে আসেনি। কাল সারা রাত, আজ সারা দিন কেটে গেছে। তবুও ফেরেনি বাবলা। ফোন বন্ধ ওর। পাগল পাগল লাগছে লিলির। এমন তো কোনোদিন হয়নি আগে। সারাদিন লক্ষ বার ঘর-বার করেছে ও। ফোন করেছে সম্ভাব্য সব জায়গায়। না কোথাও যায়নি সে। তাহলে কি হল মানুষটার? সত্যি কি তাহলে নতুন কেউ এসেছে বাবলার জীবনে?

নাঃ, আর ভাবতে পারছে না লিলি। উফফ! কেন যে গতকাল এত রাগারাগি করতে গেল। তবে শুধুই কি কাল? সম্পর্কের এই অবনতির পিছনে লিলি কি নিজের সব টুকু দায় সত্যি এড়াতে পারে? আজ নিজের কাছেই যেন প্রশ্নটা জেগে উঠেছে। নিজের কাজ, অফিস, কেরিয়ার, পড়াশুনো এগুলো নিয়ে ব্যস্ত হতে হতে বাবলার কথা ভাবতে, বাবলাকে সময় দিতে সত্যি কি একটুও অবহেলা করেনি লিলি?

নাঃ, এসব ভাবার, বিশ্লেষণ করার জন্য বোধ হয় সত্যি অনেক দেরি হয়ে গেছে। অনেক অনেক দূরে চলে গেছে মানুষটা। ফাঁকা, শূন্য ফ্ল্যাটের নীরবতাকে ছিন্ন করে আর্তনাদ করে উঠল লিলি।

—'বাবলা, ফিরে এসো... ফিরে এসো প্লিজ...।' কংক্রিটের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে শব্দগুলো পাক খেতে লাগল চার দেওয়ালের ফ্ল্যাটটার মধ্যে। দূরে কোথায় যেন কেঁউ করে ডেকে উঠল একটা কুকুর, ঝট পট করে ডানা ঝাপটাল কোনো একটা নিশাচর পাখি। রাত আরও গভীর হচ্ছে... আরও গভীর হচ্ছে...।

www.banglabookspdf.com

৪

তারিখ : ২৭ মে

আজ সকাল থেকেই গুমোট আর মেঘলা একটা ভাব আবহাওয়ার, ঠিক লিলির মনের মতোই। আজকের দিনটারও বিকেল গড়িয়ে গেল। তবুও ফিরে এল না সে। কেঁদে কেঁদে দুই চোখ সাংঘাতিক ফুলে গেছে লিলির। মাথা কাজ করছে না আর। এবার তো কিছু একটা করতেই হবে। পুলিশে যেতে হবে কি? সবাইকে তো জানাতে হবে। কিন্তু কাকে জানাবে? কিই বা জানাবে? বাবলার মা বাবা কি বলবে এবার? আর লিলির নিজের মা বাবা? উফফ! আর পারছে না যে ও।

টিং টং... বেলের শব্দে চমকে উঠল লিলি। দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলল ও। বাবলা কি? নাঃ। বাবলা নয়। একটা অচেনা লোক দরজার বাইরে।

—'ম্যাডাম, আপনার একটা পার্সেল আছে।'

—'আমার পার্সেল? ভীষণ অবাক হল লিলি। তা ছাড়া আজ তো রবিবার। আজ কি কুরিয়ার কাজ করে নাকি? লিলির অবাক চোখের দিকে তাকিয়ে লোকটাও একটু চমকে গেল বোধ হয়। কোনোমতে প্যাকেটটা নামিয়ে দিয়ে বিদায় নিল সে।

ভিতরে এসে প্যাকেটটায় প্রেরকের নাম দেখেই চমকে উঠল লিলি। অভীকের নাম লেখা যে। অভীক? এত বছর পর... হঠাৎ...

পাগলের মতো ব্যস্ত হাতে পার্সেলটা খুলল লিলি। ভিতরে রয়েছে একটা লাল গোলাপ দেওয়া মস্ত বড়ো কার্ড আর ওর খুব প্রিয় লাল সাদা ছোট্ট টেডি।

কার্ডটা খুলল লিলি। অনেক বড়ো চিঠি সেখানে।

আমার পাগলি,

জানি আজকের দিনটা তুই ভুলে গেছিস, ঠিক যে ভাবে আমিও ভুলে গেছিলাম আগের বেশ কয়েকটা বছর। আমি জানি তুই আমায় ছাড়া ভালো নেই, যেমন আমিও তোকে ছাড়া বড্ড কষ্ট পাচ্ছি।

আমাদের সবার জীবনেই অনেক সমস্যা থাকে, আর আমরা বড়ো হবার সাথে সাথে সেগুলোও বড়ো হতে থাকে। সেগুলোকে কাটিয়ে ওঠা সব সময় আমাদের হাতে থাকে না এটা ঠিক, কিন্তু তাই বলে শুধু সেগুলোকেই আঁকড়ে থেকে আর শুধু সেগুলোকে নিয়েই ভাবতে থেকে আমরা যদি আমাদের ছোট্ট ছোট্ট ভালো লাগা, জীবন, ভালোবাসা এগুলোকেই ভুলে যাই তাহলে বেঁচে থাকাটা যে বড়ো অর্থহীন হয়ে যায় রে। পুরোনো সোনালী দিন, পুরোনো সুন্দর সময় হয়তো আর ফেরে না, কিন্তু সেই পুরোনো মাধুর্যকে একটু কষ্ট করে যদি সম্পর্কে বাঁচিয়ে রাখা যায় তাহলে সম্পর্ক পুরোনো আর জীর্ণ হয় না। আমি জানি তুই কাঁদছিস, তাই বলছি কাঁদিস না। দেখা হবে শিগগির।

তোর অভীক।

www.banglabookspdf.com

সত্যি চোখের জলে সব কিছু ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে লিলির। সিনেমার ফ্ল্যাশব্যাকের মতো অনেক পুরোনো দৃশ্য ফুটে উঠছে লিলির চোখের সামনে। তিন বছর আগের একটা দিন। লিলির ফুলশয্যার দিন। সব রিচুয়াল শেষে একান্তে অভীক এসেছিল লিলির কাছে। আর ওমনি খড় খড় করে উঠেছিল লিলি।

—'এই তোর ডাক নাম বাবলা? এত দিন বলিসনি তো? কী ফানি নাম রে। হিহি...।'

—'এই বাজে বকিস না। বাজে বকলে কিন্তু তোকে আর এই আংটিটা দেবই না। আর তুই বলছিস কেন আমায়। এখন থেকে আমি তোর বর। সম্মান দে। তুমি করে বল।

—'আচ্ছা। আজ থেকে তুমি। আর অভীক নয়, বাবলা। কী সুইট নাম। তুমিও আমায় কিন্তু তুমি বলবে আজ থেকে। আর হ্যাঁ নট এনি মোর পাগলি।' আদুরী স্বর লিলির।

—'পাগলি নামটা বাতিল হয়ে গেল? বেশ। কি আর বলব! আমিও তাহলে না হয় এবার থেকে আর সবার মতো পোশাকি নাম প্রিয়াঙ্কাটাই ব্যবহার করব।'

—'না, না, না। লিলি। এটাই আমার ডাক নাম অ্যান্ড আই লাভ দিস নেম। এবার থেকে শুধু বাবলার লিলি।'

—'ওকে ডান। তুমি বলব। কিন্তু আমার দেওয়া পাগলি নামটা ছেড়ে দেওয়াটা আমার কিন্তু একদম ভালো লাগল না।' গোমড়া মুখে বলেছিল ছেলেটা।

—'হ্যাঁ ছাড়বই তো। ইশশ! পচা নাম। আর বেশি বদমাইশি করলে আমি তোমাকেও ছেড়ে দেব বুঝলে মশাই।' হাসতে হাসতে বলেছিল লিলি। না, সেদিন সেই মুহূর্তে ওরা কেউই বোঝেনি। বোঝেনি নাম বদলে নেবার এই মজার খেলাটা আস্তে আস্তে বদলে দেবে ওদের সম্পর্কের সমীকরণটাও। সময়ের সাথে সাথে নানা পারিপার্শ্বিক কারণে ওদের ভালোবাসা বদলে গিয়েছে। লিলির বারবার মনে হয়েছে প্রেমিক অভীক আর বর বাবলা যেন দুটো আলাদা মানুষ। হয়তো অভীকের ও এভাবেই অচেনা লেগেছে পাগলি থেকে বদলে যাওয়া লিলিকে।

দুমদম একটা শব্দে সম্বিৎ এল লিলির। খুব ঝড় উঠেছে বাইরে। খোলা জানালা দিয়ে ছুটে আসা পাগলা হাওয়ার দমকা ওলট পালট করে দিচ্ছে লিলির বেড রুম। ব্যস্ত হাতে জানলা বন্ধ করতে গিয়ে নীচের তলায় চোখ গেল লিলির। হ্যাঁ তাকে দেখতে পাচ্ছে লিলি। ফ্ল্যাটের মেন গেট খুলে ঢুকছে সে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কলিং বেলের শব্দ। হুড়মুড় করে দরজা খুলল লিলি। সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। বাবলা কি অভীক জানা নেই। শুধু এটুকু জানে লিলি যে এই মানুষটাকে ছাড়া একটুও চলবে না ওর।

সে ঘরে ঢুকতেই দু-হাতে তাকে আঁকড়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল লিলি। না, কোনো কথা বলতে পারছে না ও। সব কথাই আজ শুধু খুঁজে নিয়েছে অশ্রুর ভাষা। সেও হাত বুলিয়ে দিচ্ছে লিলির মাথায় ঠিক আগের মতোই।

না, সব শব্দ থেমে থাক। শুধু অনুভূতিটুকু থাক বেঁচে। বাইরের দুনিয়ার চাপ, প্রবীর দত্তের অফিস, নিধিদের পলিটিক্স, কেরিয়ারের ইঁদুর দৌড়, পারিবারিক জটিলতা এগুলো তো জীবনের একমাত্র

www.banglabookspdf.com

সত্যি নয়, তার থেকে আরও অনেক বেশি সত্যি যে এই মুহূর্তটা। লিলি বুঝতে পারছে ওর বুকের খাঁচায় আটকে থাকা ধূসর অনুভূতিগুলো আবার রঙের ছোঁয়া পাচ্ছে একটু একটু করে সেই আগের মতোই। বাইরে ঝম ঝম বৃষ্টি শুরু হয়েছে ধুয়ে যাক পৃথিবী, ধুয়ে যাক সব না পাওয়ার ব্যথা।

—

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com

Table of Contents

Half Title Page	1
Title Page	2
Copyright Page	3
Dedication Page	4
লেখক কথন	5
সূচি	6
অস্তিত্বের অন্ধকারে	8
নিভৃত যতনে	21
লৌকিকের মাঝে	29
আজ বৈশাখী আসুক...	36
চামড়ার মুখোশ	51
দমকা হাওয়া	55
হিয়ার প্রেম	61
মলিন মর্ম মুছায়ে	72
বন্ধ দরজার ওপারে	80
শিল্পী	91
বৃষ্টির রূপকথা	98
অর্ধাঙ্গিনী	108
মায়ার বাঁধন	122
রাজপুত্র আসার পরে...	131
সে এসেছিল	142
আমি শুধু চেয়েছি তোমায়	151
সেদিন দুপুরে...	163
তুমি আসবে বলে...	170
বাসন্তী স্পর্শ	183
ধূসর অনুভূতিরা	193

banglabookspdf.com

www.banglabookspdf.com